সাগর-নগর

কুমারেশ ঘোষ

৮এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

সাগর-নগর

ইংল্যাণ্ডে কাজ-সারা যাত্রী-বোঝাই ট্রেনখানা এঁকেবেঁকে দাঁড়ালো এসে ব্রিটেনের শেষপ্রান্তে সাদাম্পটন ডক ঘেঁষে। বেরিয়ে এলো যাত্রীদল, মালপত্র। মরা প্লাটফর্মটা হলো জীবন্ত, চঞ্চল। নানা জাতির পাদস্পর্শে হলো ধন্য। নানা ভাষার গুঞ্জনে হলো মুখর। কিন্তু অন্তরে তার একটি করুণ সুর : হে বন্ধু বিদায়!

এই যাত্রীরা এসেছিলো আশা নিয়ে। বেঁধেছিলো বাসা কিছুদিনের জন্যে। অনেকেই সফল হয়েচে, মুখে তাদের গর্বের হাসি। অনেকেই বিফল হয়েচে, কপালে তাদের পরাজয়ের কলঙ্ক। অনেকে সুনামটুকু সঙ্গোপনে বেঁধে নিয়েচে সঙ্গে। অনেকে সব কিছু দিয়ে নিয়েচে সাথে দুরারোগ্য রোগ। বিষয় খুইয়ে বিষ! তবু সবাই চলেচে বাসা ভেঙে দেশের টানে, দেশের পানে। জানে তারা, এদেশ তাদের নয়, তাই এখানে বাস করা যায় না, ক'দিনের জন্যে শুধু বাসা বাঁধাই যায়।

এদেশের বাসিন্দাও আছে এই যাত্রীদলে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাস আর বাসা ছেড়ে চলেচে তারা বিদেশে নতুনের সন্ধানে, অর্থের আশায়, ব্যবসার বাসনায়, কর্তব্যের তাড়নায়। তাদের প্রাণ পড়ে আছে দেশের মাটিতে। তবু প্রাণপণে বিদায়-পর্বের দুর্বল মুহূর্তটুকু গোপন করবার চেষ্টার অন্ত নেই। অন্তর তাদের কণ্ঠনালির কাছে কেবলই ধাক্কা দিয়ে বলচে : বলো, গুডবাই মাই ইংল্যাণ্ড!

পোর্টার বা কুলিরা সর্বদেশেই আবেগহীন। আসা-যাওয়ার মাঝখানে হাসি-অশ্রুর দোলায় দোলা যাত্রীকুলের মনের খবর রাখে না এরা একটুও, তাদের মাল রাখতেই ব্যস্ত শুধু! ট্রলিতে মাল বোঝাই ক'রে হাজির করে কাষ্টমসে। হাত পেতে নেয় মজুরী।

আর সেই সঙ্গে টিপস্। চুকিয়ে দেয় সম্পর্ক। আতুড়ে ধাই, শ্মশানে ডোম আর ষ্টেশনে কুলি মায়া-মমতার বাইরে।

কালো, হলদে, বাদামি, লাল, গোলাপী রংয়ের যাত্রীর ভিড়। পরনে কোট-প্যান্ট, সালোয়ার পায়জামা, আলখাল্লা আর শাড়ী, স্কার্ট, ফ্রক—নানান রকমের পোশাক। নানারকমের স্যুটকেশ, এ্যাটাচি-কেস, ট্রাঙ্ক—যাত্রীদের অস্থাবর সম্পত্তি, প্রায় সবগুলিই মেড-ইন-ইংল্যাণ্ডের, চলেচে দেশান্তরে।

যাত্রীদের সবাই দাঁড়িয়েচে কাষ্টমসের সামনে লাইনে। হাতে পাশপোর্ট। আত্মপরিচিতি। ভেতরে নিজের ছবি সাঁটা। নাম-ধাম, কোন দেশেতে বাড়ি বাপের নাম, গায়ের রং, চোখের তারার রং, চুলের রং, উচ্চতা, শরীরে উল্লেখযোগ্য কাটা-ছেঁড়ার দাগ এবং কোন কোন দেশে বেড়াবার অধিকার আছে—সব কিছু লেখা ঐ পকেট বইয়ে। নিজের সরকারের শীলমোহর-আঁকা ঐ ছোট্ট বইখানিই হলো বর্ণপরিচয়। বিদেশে বিপদ-আপদে নিজের দেশের প্রতিনিধির সাহায্যের হাতখানা ধরতে পারবে ঐ পরিচয়টুকুর জন্যেই। ওটি হারালে, সব হারালে। হারিয়ে গেলে এই বিরাট জনসমুদ্রে। ডুবে গেলে। কোনো বিদেশী সরকারের জেলেতেই হয়তো কাটাতে হলো বেশ কয়েকটা দিন, যতদিন না আবার তোমার পরিচয়টুকু খুঁজে পাওয়া যাচ্চে!

বেআইনী কিছু যদি সঙ্গে কারোর না থাকে, কাষ্টমসের বেড়া পেরোনো কষ্টের নয়। শুধু পাশপোর্টটা এগিয়ে ধরা, খটাং করে সীল মারলে সেটি মুড়ে পকেটে ভরা, আর বাক্স-প্যাকেজ দেখতে চাইলে বিনাদ্বিধায় খুলে দেওয়া। ব্যস্!

সাদাম্পটন ডকের গায়ে নোঙর-বাঁধা বিরাট সাদা জাহাজখানা। 'বাতরি'। পোলিশ লাক্সারি লাইনার। সাগর-নগর। জলে-ভাসা সাজানো-গোছানো ছোট একটি নগর। ক'দিনের জন্যে ভাসে

অকূল সাগরে, কিছুক্ষণের জন্যে আসে নানা দেশের কূলে কূলে।

নানা নগরের নাগরিক আসে এই সাগর-নগরে। মিলে মিশে এক হয়ে যায়, আত্মীয় হয়ে যায়; শেষে চলে যায়—যার যেথা দেশ। এই সাগর-নগরে শুধু দোলা, ঢেউয়ের দোলা, বৈচিত্র্যের দোলা। এখানে কোনো কাজ নেই। সবাই বেকার। তবু অন্ন-কষ্ট নেই, ভাবনা-চিন্তা নেই। শুধু আরাম, শুধু বিশ্রাম। শুধু গল্প, শুধু হাসি। শুধু আহার, শুধু নিদ্রা। ঘড়ির এখানে দাম নেই। লোকে এখানে ঘোড়ার মত ছোটে না। ব্যস্ত জীবনের খানিকটা ফাঁক এবং ফাঁকি।

এখানে কাজের তাড়া নেই। তাড়াতাড়ি নেই। ঘড়ির কাঁটায় দশটা পাঁচটা বাজে বটে, তবে অফিস যাতায়াতের জন্যে নয়, পেটের থলি ভরাবার জন্যে। দশটা পাঁচটা করে যা জমিয়েছো, তা থেকে কিছুটা যখন খরচ করেছো এই সাগর-নগরের নাগরিকত্ব পাবার জন্যে তখন তোমার খুশিমত খরচ করতে পারো তোমার সময়। যত পারো খাও, যত পারো ঘুমোও, যত পারো আড্ডা মারো। আর নয়তো ডেক চেয়ারটা রেলিং-এর ধারে টেনে নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে দেখতে থাকো নীল সমুদ্রে সাদা ঢেউয়ের ফণা আর ফেণা। আর উপরে নীল আকাশে সাদা মেঘের চলা; দুইয়ের মাঝে ফিকে গাঢ় নীলের খেলা, নীলের মেলা। মাঝে মাঝে সাদা-সাদা সী-গাল পাখীর ঝাঁক, হাল্কা পাখায় শুধু ওড়ে আর ঘোরে। কখনো বা ফ্ল্যাটরেস চালায় চলমান সাগর-নগর জাহাজখানার সঙ্গে। নগরের জানলা দিয়ে জলে যখন পড়ে যত ঝড়তি-পড়তি ফল-মূল, অমনি রেস থামিয়ে সবাই জলের 'পরেই বসে যায় হঠাৎ-পরমভোজে।

সাঁজ-সকালে নীল জলেতে সিঁদুর গোলে সূর্যিমামা; বাকি দিনটায় বসে তার চুনের ভাঁটি নিয়ে।—আকাশটাকে চুনকামের ইচ্ছে বুঝি মনে। আর রাত্রে ঠাণ্ডা চাঁদের ঢেউ খেলানো চাঁদির পাত ভাসতে থাকে থরথর কালচে কালো বিশাল জলে। এ খেলার

শেষ নেই, দেখারও শেষ নেই। কাজেই চোখ খুলে, মন খুলে দেখো। আর যদি দেখতে-দেখতে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুমিয়েই পড়ো, ক্ষতি নেই, ভাঙাবে না কেউ সে ঘুম এসে। এখানে তোমার খুশিতে দিন চলা, কথা বলা, ঢলে পড়া—ঘড়ির এখানে কোনো হাত নেই।

এই সাগর-নগরে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, খৃষ্টান নেই, ইহুদী নেই—শুধু আছে মানুষ। এখানে হিন্দুস্থানী নেই, পাকিস্থানী নেই, সিংহলী নেই, মিশরী নেই, ইংরেজ নেই, রুশ নেই, জার্মান নেই, মার্কিন নেই, চীনা নেই, জাপানী নেই,—আছে এক বিশ্ব জাতি। এখানে কমুনিস্ট নেই, ক্যাপিট্যালিস্ট নেই, সোসালিস্ট নেই - আছে ভাইয়েরা। সমস্ত নগরময় একজাতি একপ্রাণ একতা।

এরা প্রায় একসঙ্গে ওঠে, একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে গল্প করে, একসঙ্গে খেলে, একসঙ্গে ঘুমোয় আবার।

তবে দল আছে। নীল সাগরে একটি বোঁটায় শতদল। কোনো দল তর্ক করে, কোনো দল নিন্দা করে, কোন দল হাওয়া খায়, কোন দল মদ খায়, কোনো দল প্রেম করে, কোনো দল হিংসা করে, কোনো দল হাসে আর কোনো দল কাঁদে। তারপর একদিন শতদল ঝরে পড়ে। যাত্রা হয় শেষ।

মহানগরীর যাত্রীদল একে একে পাতা-তক্তার উপর দিয়ে ঢুকলো গিয়ে সাগর নগরে। ঝকঝকে তকতকে সরু সরু গলি, কার্পেট পাতা। গলির মোড়ে মোড়ে গাইড—স্টুয়ার্ড আর স্টুয়ার্ডেস। সাদা ধবধবে পোষাক পরা, মুখে মৃদু হাসি। সাদর আহ্বান। স্বাগতম্। কোন তলায় কোন ঘরে আস্তানা হবে, টিকিটেই তা লেখা। সেটি দেখিয়ে তাদের নির্দেশ মত এগলি সেগলি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। গলির দুধারে পাশাপাশি নম্বর দেওয়া ঘর আর ঘর। কেবিন। মাঝে মাঝে আলো। ফাঁকে ফাঁকে এম্‌প্লিফায়ার, ঝরে

পড়চে মৃদু মধুর সুর। কোথাও বা কার্পেট-পাতা চওড়া কাঠের সিঁড়ি—নিচের ডেক থেকে উপরের ডেক-এ যাবার।

অলি গলিতে ছড়িয়ে গেচে সবাই। কোথায় আমার ঘর? কোথায় আমার আস্তানা? কোন কোণে? কোনখানে? এই, এই যে পেয়েচি! এই তো নম্বর! বন্ধ সাদা দরজাটার হাতল ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকলেই চোখটা জুড়িয়ে যায়।

বার্থগুলিতে সরু নরম বিছানা পাতা। ধবধবে চাদর ঢাকা। মাথার কাছে বই পড়বার আলো, বই-পত্র রাখার ব্র্যাকেট। হাতের কাছে স্টুয়ার্ড বা স্টুয়ার্ডেসকে ডাকবার আলাদা আলাদা চাপা-বোতাম। একপাশে টেবিল-চেয়ার-প্যাড। আর এদিকে মুখ ধোবার বেসিন, আর্শি, ব্র্যাকেট, হ্যাঙ্গার। ঠাণ্ডা-গরম জলের কল। মেঝেয় রবার সীট পাতা, মাথার উপরে বিজলী পাখা আর বাতি। পাশে পোর্ট-হোল, জানলা—দূরে নীল সমুদ্রের এক ঝলক গোলাকার দৃশ্য। সমুদ্রের গাঢ় নীলে আর আকাশের ফিকে নীলে মিলে যাওয়ার ঋজু-রেখাটি উঠচে আর নামচে ঢেউয়ের তালে তালে।

সাগর-নগরে কী নেই? দোকান-পাট, ব্যাঙ্ক, সেলুন, ক্লাব, সিনেমা, রেষ্টুরেণ্ট, হোটেল, বার, ড্যান্সিং হল, নার্সারী, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, জিমনেসিয়াম, বাথরুম, সুইমিং হল, লাইব্রেরী, প্লে-প্লেস, বেড়াবার জায়গা, বসবার ডেক আর ডেক চেয়ার, কিছুরই অভাব নেই।

'এ' ডেক-এর খোলা জায়গাটা যাত্রীর জিনিসে ভর্তি। নানা সাইজের ব্যাগ, ব্যাগেজ আর স্যুটকেশ। এক বোঝা আভিজাত্য। ষ্টিলের কালো কেবিন-ট্রাঙ্ক আছে বেশ কয়েকটা, কিন্তু পোঁটলা-পুঁটলির নামগন্ধ নেই। ওসব ট্রেনের বাঙ্কে মানায় ভালো, জাহাজের ডেক-এ দৃষ্টিকটু। যেন সাহেবের মুখে বিড়ি।

সাদাম্পটন ডকের দুটো রাক্ষুসে ক্রেন সশব্দে কর্মব্যস্ত। একটা ক্রেন ডকে-রাখা জিনিসগুলো এককামড়ে যতটা পারে তুলে নিয়ে,

ঘাড় ঘুরিয়ে 'এ' ডেক-এর উপরে এনে আস্তে করে ঢেলে দিচ্চে সেগুলো।

ডকের আর একটি ক্রেন যেন রাক্ষসী মা। ডকের অন্য পাশে জড়ো-করা জিনিসগুলো খাবলা-খাবলা ক'রে তুলে জাহাজের ডেক-এর পর পর চৌকো গর্তের ভেতরে ঢুকে মাল নামাচ্চে একেবারে জাহাজের পেটের মধ্যে। বুঝি রাক্ষুসে ছেলে এসেচে মায়ের কাছে, একটু পরেই চলে যাবে ; তাই যত পারে গেলাচ্চে ঃ আয় বাবা, আয় খাইয়ে দিই।

জাহাজের তলপেটে যে সব মাল গেল, সেগুলো ফের বার হবে যাত্রীদের নামবার সময়। আর যেগুলো রইলো 'এ' ডেক-এ সেগুলির স্থান কেবিনে, যাত্রীদের হাতের কাছে। পনেরো কুড়িটা দিন কাটানো মানে অনেক কিছু। রোজ দাড়ি কামানো, তেড়ি বাগানো, মুখ হাত ধোয়া, জামা বদলে শোয়া, দু' তিনবার দাঁত মাজা, সুবিধামত সাজা-গোজা, লুকিয়ে নিজের জুতো পালিশ, মাথা ধরলে কপালে মালিশ—অনেক কাজ! অফিস নেই বটে, বাজার নেই বটে—তা বলে কি কাজ নেই? কাজেই হাতের কাছে দরকারি জিনিস-ভরা বাক্স একটা চাই-ই। যে ব্যাগেজের দরকার নেই, তা বরং যাক জাহাজের পেটে ; নামবার সময় সেসব টেনে বার করলেই হবে।

রাক্ষুসে জাহাজগুলোর ঐ এক গুণ। পেটের মধ্যে ভরে সব, কিন্তু হজম করে না কিছুই। দরকার মত আবার উগড়ে দেয়, ঠিক যেমনটি ছিল। মানুষের শরীরে হজম না হওয়া ভয়ের কারণ, এদের পক্ষে হজম করাটা দোষের। এই জলে-ভাসা যান্ত্রিক জীবগুলি বড় কাউকে ডোবায় না, বরং ডোবে যখন সবাইকে নিয়েই ডোবে। আর যাদের ডুবে মরা কপালে নেই—তাদের ভাসিয়ে দেয় বোটে করে, বেল্টে করে।

জাহাজের লোকগুলোর কাজের অন্ত নেই। ডেক-এর মালগুলোর গায়ে সাঁটা লেবেল দেখে দেখে যার-যার কেবিনে পৌঁছে দেওয়া, বার্থের তলায় সেগুলো সাবধানে গুছিয়ে রাখা—খুব সহজ কাজ নয়।

গায়ে শক্তির দরকার, মাথায় বুদ্ধির দরকার। তুমি তো তোমার জিনিসের গায়ে লেবেল মেরেই খালাস, কোনগুলো জাহাজের পেটে যাবে, কোনগুলো তোমার কেবিনে যাবে; কিন্তু সেসব কেবিন নম্বর বার্থ নম্বর মিলিয়ে যথাস্থানে পোঁছে দেওয়ার ভার তো তাদেরই উপর। তোমার মাল যদি অন্যের কেবিনে যায়, আর অন্যের মাল যদি তোমার কেবিনে আসে—তা হলেই তো তোমার চোখ উঠবে কপালে; তোমার টাটকা সাহেবি মেজাজ যাবে বিগড়ে। অথচ ওদের কর্মকুশলতার গুণে তুমি খোস মেজাজেই রইলে। শুধু সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে কেবিনে গিয়ে একবার দেখে নাও, সব ঠিক আছে কিনা!

অবশেষে যাত্রা হলো শুরু।

শক্ত মাটির মহানগরীর নাগরদল এসে ভিড় করে দাঁড়ালো জলে-ভাসা সাগর-নগরের রেলিং ধরে। সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলো—ধীরে ধীরে সরে যাওয়া মাটির ঐ নগরের দিকে!

দুই নগরের মাঝখানে দেখা দিয়েছে নীল জলের বিচ্ছেদ রেখা। আর মত বদলাবার পথ নেই। শুধু চেয়ে থাকা। মনের নোঙর ফেলে-রাখা ঐ মাটির মহানগরীর তীরে। মন তখনও মায়ায় বাঁধা পড়ে আছে ঐ মাটি আঁকড়ে। চ্যারিংক্রশ। অক্সফোর্ড সার্কাস। পিকাডিলি। ট্রাফালগার স্কোয়ার। লিচেস্টার স্কোয়ার। মার্বল আর্চ। হাইড পার্ক। হ্যামারস্মিথ। হ্যামস্টেড। ইণ্ডিয়া হাউস। শ্যালকট গার্ডেনসের সেই ছায়াঘেরা বাড়িখানা। হাসিমাখা ল্যাণ্ডলেডি মিসেস ল্যাফরকেড। মিস ফোর্ড। ন্যান্সী। বার। নাইট ক্লাব। ডান্সিং হল। সেলফ্রিজ। উলওয়ার্থ। বিগবেন। সেই—সেই—সেই যে!

ঐ, ঐ, ঐ যে ক্রমে সরে যাচ্চে সাদাম্পটনের চওড়া ডক, রাক্ষুসে ক্রেন দুটো, লম্বাটে কাস্টম হাউস। তীরে-বাঁধা ছোট ছোট লঞ্চ। ছোট ছোট জাহাজ। সরে যাচ্চে, ক্রমেই সরে যাচ্চে সব। নীল-জলের ঢেউয়ের নাচন হয়েচে শুরু।

সরে যাচ্চে সব, ছোট হয়ে যাচ্চে সব, আবছা হয়ে যাচ্চে সব। ঝাপসা হয়ে যাচ্চে সব। মনের নোঙরের রবারের দড়িটা শেষপর্যন্ত আর বাড়লো না, ছিঁড়ে গেলো। হে ইংল্যাণ্ড বিদায়!

বিদেশ, কিন্তু বিদ্বেষ নেই কারোর মনে। বিষ-নজরে দেখেনি তেমন কেউ। তাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যাত্রীরা সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। নিজের দিকে তাকালো প্রায় সকলেই।

তা হলে ডক্টর রয়, শেষপর্যন্ত দেশে ফিরচি আমরা।—গেমস ডেক-এ দাঁড়িয়ে মিঃ সানিয়াল মৃদু হেসে জিগ্যেস করলেন।

মিঃ রয় বললেন হেসে: তাই তো দেখচি। তিন বছর বাদে ফিরচি দেশে। কিন্তু মনটা এখনো যেন ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই গড়াগড়ি যাচ্চে।

কেন? দেশে টানের কিছু নেই বুঝি?

না।

যাক, এবার দর বাড়িয়ে চললেন। এখন আপনার কদর দেখে কে?

রিয়েলি!—বিরক্ত হলেন ডাঃ রয়: ব্যাট্, আই হেট্ দ্যাট ডাউরি সিসটেম্।

মিঃ সানিয়াল হাসলেন: এখনো আমরা ইংলিশ চ্যানেলেই আছি। কাজেই বলে যান, শুনে যাই।

শুনে ডাঃ রয় কাঁধ ঝাঁকালেন একবার।

ডাঃ রয় আর মিঃ সানিয়ালের পরিচয় খুব বেশিক্ষণের নয়। ঘণ্টা ছয়েকের হবে। ওয়াটারলু ষ্টেশনে বোট-ট্রেনের এক কামরায় উঠেছিলেন দু'জনে। বসেছিলেন পাশাপাশি। সেই থেকেই আলাপ।

ডাঃ রয়ের বয়স বেশি নয়। আটাশ-তিরিশ হবে। ফর্সা। ছিপছিপে। কালো একজোড়া সরু গোঁফ। কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো

ভেসিলিন হেয়ার টনিকে মাজা, পালিশ করা। পরনে নেভি ব্লু স্যুট. চকোলেট রংয়ের টাই, চকচকে কালো জুতো।

কলকাতায় ভবানীপুরে বাড়ি। মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পাশ করে আরো পসারের আশায়, বাপের পয়সায় বিলেত এসেছিলেন। অন্যান্য অনেক কম দামের ডাক্তারের মত লণ্ডনের বাইরে কোন হাসপাতালে চাকরি করে সেই পয়সায় পড়তে হয় নি। কাজেই পড়া নিয়মিতই করেচেন, ছুটিতে সারা ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ঘুরে বেড়িয়েচেন. এক ছুটিতে কন্টিনেণ্টেও এক চক্কর দিয়েচেন। দ্বিতীয়-তৃতীয় বছরে অর্থাৎ একটু পাকা-পোক্ত হলে একাধিক মেয়েকে বগলে নিয়ে ঘুরেচেন এবং সব চাইতে বড় কথা, তাদের জন্যে ঠিক যেটুকু খরচ করা দরকার. ঠিক সেইটুকুই করেচেন। তাছাড়া, ডাক্তারি শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা এবং লম্বা উপাধি পেতে হলে যে সময়টা হাসপাতালে কাটাতে হয় এবং বই মুখে রাখতে হয় - ডাঃ রয় সে সময়টার ষোলোআনাই কাজে লাগিয়েচেন। কাজেই, তাঁকে পস্তাতে হয়নি ; তিন বছর আগে যে আশা নিয়ে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছিলেন, সে আশা. শত-আশা হয়ে তাঁর অন্তরে স্বপ্নের জাল বিস্তার করচে।

মিঃ সানিয়ালের বাংলা মানে সান্যাল মশায়। বয়েস হয়েচে ; চল্লিশের চৌকাঠ হয়েচেন পার। লম্বা দোহারা চেহারার মানুষটি। মুখখানা হাসি-হাসি। সরকারী চাকুরে, মানে সরকারী ব্যাঙ্কে কাজ করেন। অফিসে বেশ সুনাম। কামাই বলতে নেই, আর 'বস্' কথা বলতে না বলতেই বুঝে নেন তাঁর মনোভাব! অতএব অফিসে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ।

সরকারী অফিসে ছুটি না নিলে জমা হয়, তবে বেশি জমানো যায় না। সময়ের মধ্যে না নিলে নষ্ট হয়ে যায়। গর্তে ময়লা জমলে 'সার' হয়, ব্যাঙ্কে টাকা জমলে সুদ বাড়ে, কিন্তু অফিসের ছুটি জমলে 'পচে' যায়। তাই মিঃ সানিয়াল পাওনা ছুটি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে

বাড়তি ছুটি মিশিয়ে মাস ছয়েকের একটা 'গ্যাপ' তৈরি করে ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন দেশটার হালচাল দেখতে। অবশ্য, অফিসের লোকেরা জানে, মিঃ সানিয়াল বিলেত গেছেন ব্যাঙ্কিংয়ের বিষয়ে হাইয়ার ট্রেনিং নিতে।

অনেক দিনের শখ। অথচ মিটছিলো না কিছুতেই। ছাত্রাবস্থায় ভাবতেন, বি-এ পাশ করে ব্যারেষ্টারি পড়তে যাবেন বিলেতে। যৌবনে ভাবতেন, বিয়ে করে শ্বশুরের পয়সায় একবার সাগর পাড়ি দিতে হবে। প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে এসে দেখলেন, যাঃ, কিছুই তো হলো না। বরং সংসারের সব-কটা বেড়ি এক এক করে কখন যেন অজ্ঞাতে পরে বসেচেন। কাজেই একদিন সংসারের ঝুট ঝামেলা গিন্নীর ঘাড়ে চাপিয়ে, ছেলেমেয়েদের গালে মুখে চুমু দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন 'দুগগা' বলে। স্রেফ দড়ি-ছেঁড়া গরুর মতো ছুটে এলেন প্রাক্তন রাজার দেশটা দেখতে।

মিঃ সানিয়াল বড় রসিক। কেবল মিটিমিটি হাসেন। আসবার সময় মিসেসের হাত ধরে 'আসি' বলতে গিয়ে অবশ্য চাপা-কান্নার ধাকায় আর কিছু বলতে পারেননি, চোখ দুটো ছলছল ক'রে উঠেছিলো তাঁর—কিন্তু একদিন ড্যান্সিং হলে মিঃ রেজা-র যেন কী কথার উত্তরে বললেন, জানো হে ছোকরা, আসবার সময় মিসেসকে বলেছিলাম, গিন্নী, অনেক দিন তো একসঙ্গে ঘর করলাম, এবার বাইরে একটু চরে আসি? যৌবন তো যায়-যায়, উপবনটা দেখা হবে না? অবশ্য তোমার কপালে আমার দেওয়া সিঁদুর রইলো বটে, তবে বাধা নিষেধ কিছুই রইলো না। যা ইচ্ছে ক'রো, তবে ফিরে এলে আবার তোমার মনটা যেন পাই।...কিন্তু বুঝলে রেজা, এসেছিলাম বটে হৈ-হৈ করে, তবে যাচ্ছি স্রেফ হায়-হায় করে। আসার দিন যেমন 'নাল' ঝরছিলো, আজও তেমনই ঝরচে রে ভাই। শ্বেতবরণী ললনাদের শুধু দূর থেকেই দেখলাম, কাছে ঘেঁষতে সাহসই ছাই হলো না।

বলেই এক ঢোঁক মদ গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন সানিয়াল। টেবিলের সবাই শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

হাসলেন তিনিও।

কানে কম শোনেন সানিয়াল; তাই 'হিয়ার-এড' কানে গোঁজা।

রামস্বামী চুপচাপ বসে শুনে যান। হঠাৎ এক একটা ফোড়ন কেটে বসেন। একদিন বললেন, মিষ্টার সানিয়াল, 'হিয়ার-এড'টা ইংল্যাণ্ড থেকে আনলেন নাকি?

সানিয়াল বললেন, হ্যাঁ।—গর্ব করে বললেন, ন্যাশন্যাল হেল্থ স্কীমে ফোকটে যোগাড় করেচি।

তা ওটি যোগাড় করবার আগে দেশে মিসেসের সঙ্গে প্রেমালাপ করতেন কেমন করে—জানতে পারি?

সানিয়াল দমবার পাত্র নন। বললেন, দেখুন রামস্বামী, প্রেমালাপটা চেঁচিয়ে করা অভদ্রতা। হৃদয়ের ভাষা দিয়ে করতে হয়, চোখের ভাষা থেকে বুঝতে হয়। বিয়ে করেচেন?

থতমত খেয়ে রামস্বামী বললেন, না।

সানিয়াল বললেন, তবে ওসব কিস্সু বুঝতে পারবেন না। কান ভাল থাকলে প্রিয়তমার মুখ থেকে কেবল একটি আলাপই শুনতে পাবেন, দেহি-দেহি। প্রেম স্রেফ চটকে যাবে। আমার মনে হয়, লর্ড কৃষ্ণের আর এক নাম 'কালা'—কারণ কানে তিনি কালা ছিলেন। কাজেই লাভার রাধিকার 'দেহি দেহি' তাঁকে শুনতে হয় নি বলেই তাঁদের প্রেম অমন ক্লাসিক হয়ে গেলো। বুঝলেন?

সানিয়ালের কথায় টেবিলে আবার হাসির ধুম পড়ে গেলো।

৭০৬নং কেবিনে রামস্বামী থাকেন 'এ' ডেক-এর ফোর-বার্থ কেবিনে। কেবিনটায় বেশ আলো-হাওয়া। ড্যান্সিং হল, ডাইনিং হল, লাউঞ্জ, লাইব্রেরি, বাথরুম, ব্যাঙ্ক, সেলুন—প্রায় সবই ঐ ডেকে; কাজেই সিঁড় ভাঙার দায় নেই। কেবিনের বাইরেই এ্যাম্প্লিফায়ার। মৃদু-মধুর

সুরে পোলিস কনসার্ট বাজে। কেবিনের পোর্ট হোল দিয়ে দেখা যায় গোল এক চাকতি নীল আকাশ আর নীল জলের কানাকানি। অলস দুপুরে উপরের বার্থে শুয়ে শুয়ে রামস্বামী তাদের কানাকানি দেখেন আর সিগ্রেট ফোঁকেন।

রামস্বামী মদ্রদেশীয়। মস্কো থেকে আসচেন। মস্কো থেকে পোলিস বন্দর Gdynia এসেছিলেন ট্রেনে, সেখান থেকে ধরেচেন এই পোলিস লাক্সারি লাইনার। Gdyniaরই যুদ্ধপূর্ব নাম ডানজিগ। যুদ্ধের জল প্রথমে ঘোলাটে হয়েছিলো এইখানেই।

রামস্বামী মস্কোতে ভারত সরকারের অফিসে কাজ করেন। ছুটিতে দেশে যাচ্চেন। বেশ শান্ত মানুষটি। আস্তে আস্তে কথা বলেন, আর কম কথা বলেন। নিজের পোশাক-আশাকের দিকে তত নজর নেই, পরের সাজগোছ নিয়ে মন্তব্য করতেও রাজী নন। বিয়ে করেননি, আপাতত করবার ইচ্ছেও নেই। যাচ্চেন দিল্লীতে। সেখানে মা-বোন-ভাই আছেন। আবার ফিরবেন মাস দুই বাদে।

রামস্বামীর ঠিক নীচের বার্থে থাকেন সালিম হক। আমেরিকায় পড়া সাঙ্গ করে লণ্ডনে ক'দিন থেকে এই জাহাজেই ফিরচেন দেশে, করাচীতে। বেশ নম্র, গম্ভীর—কিন্তু অসম্ভব 'বাবু'। মানে 'সাহেব'। কপিশ। স্যুটকেশ থেকে প্রায় পনেরো-ষোলটা নানারকম টাই বের করে হ্যাঙ্গারে সারি সারি সাজিয়ে রেখেচেন। যেন বেচতে বেরুবেন এখুনি। কেবিনের আর তিনজন আড়চোখে দেখেন আর 'হাঁ' হয়ে যান ; আরো 'হাঁ' হয়ে যান, রোজ তাঁর স্যুট বদলানোর বহর দেখে। অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বসে মদ গেলেন আর ফ্লাশ খেলেন—কখন যে কেবিনে ঢোকেন কেউ তা জানতেও পারেন না। আর তিনজনই তখন যার-যার বার্থে শুয়ে নাক ডাকান।

আর তিনজন মানে, রামস্বামী, ডাঃ সেন (সানিয়ালের বন্ধু) আর মিঃ ঘোষ। তাঁরা ভোরে যখন জাগেন, সালিম হকের তখন গভীর রাত্রি। তাঁর ভোর হয় বেলা বারোটায়। তখন এই সাগর-

আর সবাইয়ের লাঞ্চের সময়। সারা নগরের সব ডেকেই বেজে ওঠে লাঞ্চের ঘণ্টা—টুং টাং। সেই মৃদু ঘণ্টায় ইয়াংকি সালিমের ঘুম ভাঙে না, মস্কোর রামস্বামী মুচকে মুচকে হাসতে থাকেন।

সন্দেহ হয় কার আদর্শ ঠিক।

উপরের বার্থে মস্কো, নীচের বার্থে নিউইয়র্ক—দু'জনের চাল-চলনে আকাশ-পাতাল তফাত। মস্কো যখন বার্থে শুয়ে নাক ডাকায়, নিউইয়র্ক তখন ফ্লাশের আড্ডায় হাত ডাকে। মস্কো যখন গভীর নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে, নিউইয়র্ক তখন বার-এ বসে রঙীন নেশায় চুর-চুর! সকালে মস্কো যখন ব্রেকফাস্ট সারে, নিউইয়র্ক তখন পাশ ফিরে শোয়। দুপুরে লাঞ্চ শেষ করে যখন মস্কো, নিউইয়র্ক তখন দাঁতে ব্রাশ ঘষে। মস্কোর ঘড়ির সঙ্গে নিউইয়র্কের ঘড়ির অনেক তফাত - তাই দু'জনেই নিজের নিজের ঘরেই একঘরে।

সাগর-নগরের এই এক কেবিনেও তাই রামস্বামী আর সালিম প্রায় অপরিচিত। বরং এই দু'জনের সঙ্গেই ইণ্ডিয়ার সেন আর ঘোষের আলাপ. কিন্তু সালিম-রামস্বামীর সঙ্গে প্রায় বাক্যালাপই নেই।

ঐ কেবিনের আর দুটি বার্থের উপরটিতে ডাঃ মহাবিষ্ণু সেনের আস্তানা এবং নীচের বার্থটি কে. ঘোষের। ডাঃ সেনের বয়েস ত্রিশের মধ্যে। রং ফর্সা, দোহারা চেহারা, আর সব চাইতে আশ্চর্যের, বাংলায় কথা বলেন যখন তিনি, তখন সবটাই প্রায় বাংলা ভাষাই হয়। ইয়ার-নোজ-থ্রোট বিশারদ হয়ে সেন বর্তমানে দেশমুখো। ইয়ার-নোজ-থ্রোট যখন দেহের উপরাংশেরই ব্যাপার, তখন তার বিশারদের স্থান উপরের বার্থেই হবার কথা এবং হয়েচেও দেখে খুশিই শ্রীযুত ঘোষ। উপরন্তু শুধু বিষ্ণু হলেও বা কথা ছিল, মহাবিষ্ণু সর্বদাই শিরোধার্য। আসলে উপরের বার্থে বিষ্ণু মশায় বিরাজ করায় ঘোষ মশায়ের খুশি হবার মুখ্য এবং গোপনীয় কারণ: মই বেয়ে মাচায় শোবার দায় ঘোষ মশায়ের নেই!

মহাবিষ্ণু মশায় মহাবৈষ্ণব কিনা জানা নেই, তবে তিন বছর বিলেতে কাটিয়েও তিনি সম্পূর্ণ অহিংস—অর্থাৎ রীতিমত নিরামিষাশী। এমন কি, বিলিতী মতে 'ডিম'কেও নিরামিষের দলে টানেননি। শুধু তাই নয়, ঘোষ একদিন ভোরে উঠে দেখেন, মহাবিষ্ণু তাঁর মাচায় বসে আছেন। দূরে নীল সমুদ্রের শেষ সীমায় লাল সূর্য ঊর্ধ্বগামী।

অমন চুপচাপ বসে আছেন যে ?

ঘোষ জিগ্যেস করায় অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন মহাবিষ্ণু। বললেন, এই ইয়ে, এই আহ্নিকের মত করচি একটু।

এবার অপ্রস্তুতে পড়লেন ঘোষ। বুঝলেন, ভদ্রলোক অন্নের সুব্যবস্থা করতে বিলেত গেছলেন বটে, কিন্তু জাত বিলিয়ে আসেন নি, ছাড়েন নি অন্নের জন্যে আহ্নিক।

শ্রীযুক্ত ঘোষও একজন নিরামিষাশী। একই কেবিনের উপর-নীচে বার্থে সমাসীন, আরো আশ্চর্যের। পোলিশরা কি পুলিশ ? মানে গোয়েন্দা পুলিশ—মানুষের পেটের খবর জানতে পারে! নইলে কখনো দুই অহিংসবাদীকে এক ঘরেতেই পুরে দেয়!

তবে গোপনে বলি, ঘোষ মশায় কিন্তু একেবারে পুরো নিরামিশাষী নন। হবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মায়ের স্নেহের চাপে পড়ে হতে পারেননি। তাই চিংড়ি রুই ইলিশ পেলে তার খোসা বা তেল ছাড়িয়ে খসখসে অংশটুকু খান এবং আঁসটে গন্ধ তাড়াবার জন্যে ঝোলে মাখেন লেবু! ঘোষ পুত্রকে অন্তত মৎস্যাষী করবার জন্যে ঐ অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করতেন স্নেহময়ী ঘোষ-জননী—এবং সেই থেকেই ঐ পন্থাই চালু রেখেচেন তাঁর আধা-নিরামিশাষী পুত্রপ্রবর।

তবে এটা সত্যিই যে, ভদ্রলোক ডিম বা মাংস খান না। শুধু তাই নয়, বাড়িতে মিসেস কয়েকবার ডিমের ডালনার ডিম তুলে নিয়ে

আলুর দম বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গন্ধে সন্দেহ জাগায়, পেরে ওঠেননি।

অথচ ভদ্রলোক গোস্ত-রেটির দেশ বেরুট, দামাস্কাস, ইস্তাম্বুল সব চষে বেড়িয়েছেন, ঘুরেছেন ইয়োরোপের হ্যাম-বিফ-পর্কের দেশে—ইংল্যাণ্ডে দারুণ শীতেও বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন, তবু ঐ লেবু আর রুই-ইলিশ-চিংড়ি না জোটায় স্রেফ সেণ্ট-পারসেণ্ট নিরামিশাষী ব'নেই ছিলেন। ছ' সাতটা মাস ধ'রে চালিয়েছেন শুধু দই-ভাত, আলু-মটর সেদ্ধ, রুটি-মাখন, জ্যাম-জেলি, আর সেই সঙ্গে বীয়ার।

বেঁটে মোটা মানুষটি। গায়ের রং মেটে, মাথায় অল্প টাক, মুখে হাসি, চোখে লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা। বয়েস চল্লিশের সামান্য ওপরে। ভদ্রলোক তিন ছেলে মেয়ের বাবা, একটি পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামী, বাপের একমাত্র পুত্র, শ্বশুরের দু' নম্বর জামাই, বহু শালা-শালীর জামাইবাবু, দু'তিনটি কোম্পানীর ডাইরেক্টর, একটি পত্রিকার এডিটার এবং বাঙ্গালী মাত্রেই যা- রাইটার! অর্থাৎ, একটি হোয়াট-নট্!

ডার্লিং, ইজণ্ট্ ইট্ নাইস ?

ইয়েস, মাই ডিয়ার!

ডেক চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন গল্প করচেন। বয়স্ক দম্পতি। যাচ্চেন বম্বে। তবে যে ক'দিন এই সাগর-নগর নোঙর বেঁধে থাকবে বোম্বাই মহানগরীর গায়ে, সে ক'দিনই তাঁরা ভারতীয় মাটির নগরে নড়ে-চড়ে বেড়াবেন। তারপর আবার ঐ জাহাজেই ফিরবেন তাঁদের স্বদেশে।

মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন নীল রক্তের ইংরেজ। এসেক্সে র‍্যামফোর্ড সহরে নোয়া-হিল পাড়ায় বাড়ি। বাড়ির নাম 'দি মাউণ্ট'। কর্তা বিল্ডিং কণ্ট্রাক্টর, গিন্নী, সত্যিই গিন্নী। অর্থাৎ পেটের পাউরুটি আর নেশার সুরার জন্যে ন'টা-পাঁচটা অফিস করতে হয় না। আর

ছেলেপুলে নেই, দু'টি তো প্রাণী! আর লর্ড যীশাস নিয়মিতই তাঁদের খাবার টেবিলে খাদ্য পানীয় যুগিয়ে যাচ্ছেন।

এ বছরের হলিডে প্রোগ্রাম করবার সময় মিসেস জেন গ্র্যাটন বলেছিলেন, ডার্লিং অনেকদিন থেকেই ইণ্ডিয়া দেখার ইচ্ছে। আমার বাবা একবার সেখানে একটা ফ্যাক্টরীর মেসিনারী ইরেকশনের ব্যাপারে গেছলেন, কিন্তু তার কিছুদিন আগে আমি রোগ থেকে ওঠায় দুর্বল ছিলাম, কাজেই সেবার যাওয়া হলো না। এবার যাবে ?

মিঃ হ্যারি গ্র্যাটন বিশুদ্ধ ইংরেজ। বেশ জানেন, স্ত্রীর এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে মত জানতে চাওয়া মানেই নিজের মতটা জানানো। তাছাড়া পাশ্চাত্যের ধর্ম ঃ গিন্নীর ইচ্ছেয় কর্ম। কাজেই কর্তা এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন ঃ বেশ তো ডিয়ার, চলো!

জেন গ্র্যাটন খুশিতে উপচে পড়লেন, নিজের সোফা থেকে উঠে আচমকা কর্তার দুই গালে দুটো চুমু দিয়ে বললেন, ও, হ্যারি, আই লাভ ইউ সো মাচ! রিয়েলি, আ'ল বি সো হ্যাপি! ট্যাজমাহাল, ক্যাশমিয়ের, লর্ড বুড্‌ডার দেশ দেখবার আমার ভারি ইচ্ছে!

ইচ্ছে কিন্তু পূর্ণ হলো না, যদিও হ্যারি গ্র্যাটন টমাস কুককে তাঁদের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাঁরা ইণ্ডিয়া টুরের জন্যে একটা হাজার কয়েক টাকা-গলানো প্রোগ্রাম পেশ করেছিলেন ঃ বম্বে থেকে ক্যাশমিয়ের, ক্যাশমিয়ের থেকে ডেল্‌হি ; সেখান থেকে হিল-রিসর্ট সিমলা এবং ব্যাক টু ডেল্‌হি। পরে আগ্রায় ট্যাজমাহাল অ্যাণ্ড ফোর্ট, সেখান থেকে বেনারেসের হিন্দু টেম্পেলস্। তারপর বোড্-গায়ায় লর্ড বুড্‌ডার টেম্পল এবং কাজেই ক্যালকাটা, যা একদিন ব্রিটিশ এম্পায়ারের সেকেণ্ড সিটি ছিলো ; তা ছাড়া ওটা হিস্টরিক সিটি ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রফিটেবেল মার্কেট, লর্ড ক্লাইভের ব্রিটিশ রুলের রোলার চালাবার স্টার্টিং পয়েন্ট! তাছাড়া আছে ক্যালিঘ্যাট—টেম্পল অব্ গডেস ক্যালি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ফোর্ট উইলিয়াম ইত্যাদি, অলসো পোয়েট টেগোরস্ স্যান্টিনিকেট্যান।

দেন্ প্রসিড টুয়ার্ডস ম্যাড্রাস অ্যাণ্ড ভিজিট সাউথ ইণ্ডিয়ান টেম্পলস। অন দি ওয়ে ব্যাক টু বম্বে, ভিজিট মিঃ গ্যাণ্ডিজ সেওয়াগ্যাওঁ, অলসো ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার অ্যাট্ আজাণ্টা অ্যাণ্ড এলোরা।

প্রোগ্রাম শুনে জেন গ্র্যাটন আনন্দে নেচে উঠলেন। অবশ্য হ্যারি গ্র্যাটনকেও হাসতে হলো, কিন্তু মানস চক্ষে দেখলেন যখন তাঁর লয়েডেস্ ব্যাঙ্কের পাশ-বইখানার বেশ কতকগুলো পাউণ্ড ক্রেডিট ঘরে থেকে লাফিয়ে ডেবিট ঘরে এসে বসচে, বেচারি ভদ্রলোকের প্রাণ শুকিয়ে স্রেফ ড্রাইড পটেটো হয়ে গেছলো (ভদ্রলোক ইংরেজ, তাই ইণ্ডিয়ান আমচুরের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়)।

কিন্তু উপায় কি ? ইণ্ডিয়া তো ইংল্যাণ্ড নয়, যে, একটুখানি এদিক ওদিক পা বাড়াতে গেলেই সমুদ্রে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয় ! ভাস্ট ল্যাণ্ড ! সবটা ঘুরে দেখতে গেলে খরচা তো হবেই ! ও লর্ড, সেভ মি ! হ্যারি গ্র্যাটন হয়তো বাথরুমে সশব্দে ওয়াটার ট্যাপ খুলে দিয়ে (যাতে মিসেসের কানে না যায়) গোপনে সকরুণ প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তাই দেখা গেলো পরম কারুণিক লর্ড তাঁর প্রিয় সন্তানকে স্ত্রীরূপী অর্থ-ঘাতিকার হাত থেকে বাঁচালেন !

অর্থাৎ স্টর্ক ওয়াইভস ক্লাবে মিসেস স্থামসনের সঙ্গে দেখা হলো জেন গ্র্যাটনের। সর্ব দেশেই, মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। জেন গ্র্যাটন হাতের কাছে মিসেস স্থামসনকে পেয়ে কামিং হলিডে-তে তাঁদের ইণ্ডিয়া যাবার প্রোগ্রাম খুলে বললেন।

অবশ্য, বলবার মতই খবর ! কারণ বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত ইংরেজের হলিডে-প্রোগ্রাম হচ্ছে দু' পা এগিয়ে ব্রাইটন বা ক্যাম্ব্রিজে সী-সাইডে যাওয়া, না হয় বড়জোর চ্যানেল পেরিয়ে প্যারি ঘুরে আসা ! আর, করে টার্কি বা মাটন্ খেয়েচে তারই কাঁটা চামচে শোঁকা ! (ঘি খেয়ে হাত শোঁকার উপমাটাও এখানে অচল !)

কিন্তু মিসেস স্থামসন শুনেই কপালে চোখ তুললেন ঃ সর্বনাশ ! মাই ডিয়ার, প্লাজ তোমাদের ঐ প্রোগ্রাম ড্রপ করো !

কেন ?—কেন ?—ভয় পেলেন মিসেস গ্র্যাটন।

কেন, জানো না ? ইংল্যাণ্ডের 'মিস মেয়ো' চোখ ঘুরিয়ে হাত ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে আসতে হ'লো কেন জানো না ? ছাট ইণ্ডিয়ান হাফ-নেকেড ফকির গ্যাণ্ডি তার দেশের লোককে নাম্বার ওয়ান অ্যান্টি-ব্রিটিশ করে তুলেছিলো। ন্যাউ এভরিবডি হেটস ব্রিটিশ। তা ছাড়া পথে ইংলিশ গার্লস বা উইমেন দেখলেই সব ইনসাল্টিং রিমার্কস পাস্ করে। স্থবিধে পেলে এসল্ট করবারও চেষ্টা করে! এ ব্যাণ্ড অব ব্যাণ্ডিট্স্, ব্রুট্স, ট্রাবল্-মঙ্গারস্!

জেন গ্র্যাটন শুনে আঁতকে উঠলেন।

মিসেস স্যামসন দেখলেন ওষুধ ধরেচে। কাজেই জের টানলেন ঃ তা ছাড়া রিলিজিয়াস ফ্যানাটিজম এত বেশি যে কী বলবো মাই ডিয়ার। হিন্দুজ এ্যাণ্ড মুসলিমস্ অলওয়েজ কাটিং ইচ্ আদার্স থ্রোটস্! স্পেসালি, হিন্দুজ আর হরিব্‌ল্! আইডল্ ওয়ারশিপার! তাদের গডেস ক্যালি একটা ব্ল্যাক নেকেড উয়োম্যান, তার হাজব্যাণ্ডের বুকের উপর দাঁড়িয়ে! ওদের লর্ড কৃষ্ণা মেকস লাভ্ উইথ হিজ অ্যান্টি! ভাবতে পারো ? আমি এসব বইয়ে পড়েচি। চাও তো, দেবো তোমাকে বইখানা। ভেরি ইণ্টারেষ্টিং! তা ছাড়া জানো—

হঠাৎ নিজের মুখখানা জেন গ্র্যাটনের কানের কাছে এনে বললেন, তা ছাড়া জানো, দোজ্ ইণ্ডিয়ানস্—ও-ও-ও আ'ম ব্লাশিং—

থেমে গেলেন মিসেস স্যামসন। কিন্তু চিরন্তন কৌতূহলী নারী জেন গ্র্যাটন তাঁর কানটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, কি, কি ?

মিসেস স্যামসন এদিক ওদিক চেয়ে চুপিচুপি বললেন, দোজ পিপ্‌ল ওয়ারশিপ অর্গ্যান্স—আই মিন্—মেল অরগ্যান্স!...আই জাস্ ফরগেট্ ন্থ নেম......আ, ইয়েস, ইয়েস্, লিঙ্গম!

শুনেই জেন গ্র্যাটনের মিষ্টি মুখখানা পাকা আপেলের মতই লাল

হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আ, মিসেস স্যামসন, প্লীজ, স্টপ!

কিন্তু টপ. করে স্টপ করা বড় শক্ত! বিশেষ করে পরনিন্দা! প্রশংসা দু' কথায় শেষ হয়, নিন্দা দু'শো কথাতেও শেষ হয় না। অবশ্য মিসেস স্যামসন পাল্টে দিলেন কথার চাল। বললেন, অবশ্য তোমরা যাচ্চো যাও, তবে সাবধানে থেকো। নেটিভগুলো ভয়ানক ন্যাষ্টি, রাস্তাগুলো ডার্টি, গাড়িগুলো নয়েজি আর স্পিডি। তাছাড়া নেকেড ফকিরস্, বেগার্স, পিকপকেটস, কাউজ অ্যাণ্ড বুলস্ অ্যাণ্ড ডগস্-এ সব টাউনগুলো ভর্তি।

মিসেস গ্র্যাটনের মুখের চেহারা দেখে বোঝা গেলো, ভয় পেয়েচেন। তাঁর আর দোষ কি? অত ভয় দেখালে ভয় পাবারই কথা। কেউ ভয় পেলে আরো তাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছে করে। মিসেস স্যামসন বলতে লাগলেন, তবে মাই ডিয়ার, তোমরা শহর ছেড়ে এক পা-ও বাইরে যেয়ো না। চারদিকে ডেন্স ফরেস্ট! টাইগার্স, লাইয়ন্স, এলিফ্যাণ্টস, স্নেকস ইত্যাদি দেশটায় গিজগিজ করচে। তাছাড়া এখনো ইণ্ডিয়ায় বহু ম্যান-ইটার্স, মানে, ক্যানি-ব্যালস আছে! কাজেই—

আরো বলতে যাচ্ছিলেন মিসেস স্যামসন, কিন্তু ক্লাব-ঘরের ঘোরানো দরজা ঠেলে মিস হ্যামারস্মিথকে ঢুকতে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন তিনি: ইক্সকিউজ মি, মাই ডিয়ার! ঐ যে কিটি আসচে, ওর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে!

মিসেস জেন গ্রাটন বাড়িতে এসে ভেঙে পড়লেন। স্বামীকে বললেন, হ্যারি, আমাদের আর ইণ্ডিয়ায় গিয়ে দরকার নেই। বরং—

হ্যারি গ্রাটন অবাক হলেন, সে কি! আমি যে আজই প্যাসেজ বুক করে এলাম!

আ-আ ডার্লিং!—জেন গ্র্যাটন বিরক্ত হলেন: আমি দেখেচি যেটা আমি চাইনে, ঠিক সেটাই আগে ঘটে!—একটু ভেবে বললেন,

অ'রাইট, ঐ সঙ্গে প্লীজ, রিটার্ন প্যাসেজও বুক করে ফেলো। ঐ জাহাজেই ফিরবো। যে ক'দিন জাহাজ থাকবে বম্বেতে আমরা সিটিটা দেখে নেবো, কি বলো?

হ্যারি গ্র্যাটনের বুকের উপর থেকে কে যেন একখানা ভারি পাথর সরিয়ে নিলো। তবু মুখখানা যথাসম্ভব ভার করে বললেন, কিন্তু কিন্তু—মানে, সে আবার কেমন হবে?—

জেন বোঝাতে বসলেন: কেন? বেশ তো হবে। এ পারফেক্ট হলিডে। নো ওয়রি, নো হোটেল। তাছাড়া পথে জেব্রলটার, সুয়েজ, ইজিপ্ট, এডেন, করাচী দেখবো। দেখো, পারফেক্ট রেস্ট পাবে। তাছাড়া সী-ভয়েজ চমৎকার! এ নিউ লাইফ!

অতএব ব্যাগস অ্যাণ্ড ব্যাগেজেস গোছানো হলো। আসা-যাওয়ার টিকিট কেটে সাগর পাড়ি দিলেন গ্র্যাটন দম্পতি। বিল্ডিং কণ্ট্রাক্টারি কাজে শীতকালটা মন্দার সময়। কাজেই অযথা সময় নষ্ট না করে কিছু পাউণ্ড-শিলিং পেন্স (নষ্ট নয়), খরচ করে স্বাস্থ্যোন্নতি করা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা বুদ্ধিমানের কাজ। অন্তত ইংরেজ তাই মনে করে।

সাগর-নগর হেলচে, দুলচে, চলচে রাত্রের কালো সমুদ্রের বুক চিরে। গভীর রাত। ক্লান্ত যাত্রীদের বেশির ভাগই যার যার কেবিনে নিদ্রামগ্ন। অতি উৎসাহী যারা তারা তখনো লাউঞ্জে বসে গল্প করচে, কেউবা মদের শেষ গেলাসটা সামনে রেখে 'বার'-এ বসে ঢুলচে।

অনেকেই আর বাইরে থাকতে পারেনি। যা ঠাণ্ডা! হিমেল হাওয়ায় রক্ত জমাট বেঁধে যাবার যোগাড়! তাই ডেক-চেয়ারগুলো খালি-কোল নিয়েই পড়ে আছে ইতস্তত। যাত্রীদের প্রথম দিনের আলাপ পরস্পরের পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে পারেনি এখনো।

আপনার দেশ কোথায়?

ইংল্যাণ্ডে কোথায় ছিলেন আপনি ?

কত দিন ছিলেন ?

আপনি ?—অর্থাৎ আপনি কি করেন ?

ব্যস ! ঐ পর্যন্ত ! যতটুকু জিগ্যেস করা যায়, অথচ অভদ্রতা হয় না। মানুষ নাকি সামাজিক জীব। তা যদি হয়, তবে এই সাগর-নগরের নাগরিকদের পরস্পরের পরিচয় নেবার-দেবার অধিকারটুকু আছে বৈকি ? তাতে যদি কেউ ঠোঁট বাঁকায়, তবে আর সবাই তার কাছ থেকে ঠোঁট বেঁকিয়ে চলে যাবে। তুমি এসেচো, স্বাগতম্ ! এসো বসি, গল্প করি। বলো, তুমি কে, কোথাকার, কে তোমার আছে ? বললে না ? সরি, গুডবাই ! তবে মনে রেখো, এই সাগর-নগরে কারোর ইনট্রোডাকশনের দরকার নেই। এ ইংল্যাণ্ড নয়। ইংলিশ চ্যানেলও পার হয়ে এসেচো !

বে অব বিস্কে বড় চঞ্চল।

সাদা রংয়ের এক টুকরো শহরখানা ঢেউয়ের তালে তালে চঞ্চল হয়ে উঠলো। দুষ্টু ছেলের সঙ্গে মিশলে ভাল ছেলেও যেমন দুষ্টু হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই।

বিস্কের ঢেউয়ে সারা শহরটায় যেন ভূমিকম্প। ভূমি-কম্প নয়, জল-কম্প।

অল্প দোলায় মন দোলে—বেশ লাগে। বেশি দোলায় গা গুলোয়, গা বমি-বমি করতে থাকে। বমি হয়েও যায়।

এক ধরনের বমি নাকি বামাদেরই একচেটিয়া ব্যাপার। তাও বিবাহিতা স্বামী-সোহাগিনী বামা হওয়া চাই, নইলে বড় নিন্দের কথা ! বিবাহিতা মেয়েরা কোন এক বিশেষ সময়ে ঐ ধরনের শব্দ তুললে তাদের শ্বশুর-শাশুড়ীদের মনে সুরের দোলা লাগে, বাঁধানো দাঁতে হাসির ঝলক দেখা যায়, কর্তা-গিন্নী দু'জনে কানাকানি করেন ; কিন্তু এই দোলানি-সহরে এই আগমনী ধ্বনি সার্বজনীন। এ

'কোরাসে' মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়োর সমান অধিকার। চলমান দ্বীপটির 'যাত্রা হলো শুরু'র এক অদ্ভুত যাত্রা-সঙ্গীত।

সত্যিই অদ্ভুত। জাহাজখানার এখানে ওখানে মাইকে বিদেশী কনসার্ট বাজতে থাকে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে এক মহাজাতীয় ঐক্যতান: ওয়াক্-ওয়াক্! চীন দেশ বা অচীন কোন দেশের বাসিন্দার ঐ একই বমন-সুর! সাগর-নগরে কোন ভেদাভেদ নেই!

প্রথম দু-তিনটে দিন সাগর-নগরের এখানে-সেখানে বমি আর বমি। চলার পথে সিঁড়িতে, বেসিনে, বাথরুমে, লাউঞ্জের মেঝেয়, ডেকের কোণে -সর্বত্র বমি। টকো গন্ধ—দুর্গন্ধ!

তবে রক্ষে, শহরটি গৌড় দেশের পৌরসভার অধীনে নয়। তাই মেঝেয় ময়লা পড়তে না পড়তেই ক্লীনার আসে ছুটে, ঠেলা-বুরুশ হাতে। সেই দু'চার ঝলক বমি মুছে নেয় অদ্ভুত কৌশলে; মেঝেটা ফের ঝকঝক করতে থাকে।

লোকগুলোর মুখে যখন বিরক্তি ভাব নেই, তখন মনেও নেই হয়তো। এ কাজ তাদের গা সওয়া, এ তাদের কর্তব্য। যাত্রা শুরুর প্রথম ক'টা দিন তারা তাই বুরুশ বালতি নিয়ে প্রস্তুত হয়েই থাকে, অপ্রস্তুত যাত্রীদের লজ্জাটুকু মুছে ফেলে চটপট, তড়িৎ ঘড়িৎ!

সত্যিই লজ্জায় পড়তে হয়। প্রথমে তেমন কিছু বোঝা যায় না। মাথাটা ভার হয়ে থাকে, শরীরটা হয়তো খারাপ হয়েচে। কাজেই লাউঞ্জে সোফায় চুপচাপ বসে বই পড়তে থাকে, কেউবা টেবিলে গিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করে দেশের ঠিকানায়: শুরু হয়েচে যাত্রা, শেষ হবে শীঘ্রই, দেখা হবার দিন গুনচি; কেমন আ......

লিখতে লিখতে গা-টা কেমন গুলিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে যেতে চেষ্টা করে, কিংবা কাছেই কোন বাথরুমে। কিন্তু দু'পা যেতে না যেতেই পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, হড়হড় করে বেরিয়ে আসে বাম! ছাড়য়ে পড়ে মেঝেয়!

তখন সারা শরীর স্বস্তির স্নিগ্ধতায় ভরে যায়, কিন্তু মনটা ভরে অস্বস্তিতে। ছিঃ ছিঃ! লোকে কি ভাবলো!

কিন্তু তার কাছের লোকটি তখন ভাবচে, তার শরীরটাও গুলোচ্চে যেন!

এই ক'দিন ডাইনিং সেলুনের অনেকগুলো চেয়ার-টেবিলই খালি থাকে। সাগর-দোলায় সাগর-নগরের অনেক নাগরেরই এমন অবস্থা হয় যে, কেবিন ছেড়ে ডাইনিং হলে বসবার উপায় থাকে না। অথচ না খেলেও উপায় নেই। পেট খালি থাকলে গা আরো গুলোয়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই নিজের বার্থে শুয়ে শুয়েই বেল টিপে স্টুয়ার্ডকে ডাকতে হয়, বলতে হয়: যা ইচ্ছে দিয়ে যাও!

এই 'সী-সিকনেস'এ ওষুধের তেমন দরকার নেই। পথ্য, হাল্কা কিছু খাওয়া। সাগর-নগরের কর্মীদের সে সব জানা। ছুটে গিয়ে কিচেন থেকে এনে দেয় ফলের রস, বিস্কুট, জ্যাম-জেলি, চা বা কফি!

এমনি করে বড়জোর দু'তিনটে দিন কাটাতে হয়। তারপর ডাইনিং সেলুনে যার যার চেয়ারে সে-সে জাঁকিয়ে বসে, মেনু দেখে অর্ডার দেয় পছন্দমত খাদ্যের। লাউঞ্জে ভিড় জমতে শুরু হয়। ডেকে চেয়ারগুলো খালি পাওয়া হয় মুস্কিল।

সারা জাহাজটা চষে বেড়াচ্চে রেজা। কে. এম. রেজা। ছোট্ট খাট্টো মানুষটি। গায়ের রং চকোলেটের মতই। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। পরনে কর্ডের প্যান্টালুন আর ছিটের সার্ট। মুখে মৃদু হাসি।

রেজার সঙ্গে কে· ঘোষের আলাপ হয় প্যারিতে, এফেল টাওয়ারের মাথায়। কয়েক হাজার ফিট উপরে এই দুই বাদামী রংয়ের ভদ্রলোকের দেখা হওয়ায় স্বভাবতই আলাপটা জমে ওঠে। এবং কথায় কথায় জানা যায় দু'জনেরই এই 'বাতরি' জাহাজেই

ফিরতি টিকিট কাটা। ফেরবার পথের সঙ্গী। সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তা আপনা থেকেই গড়ে উঠলো যেন।

এফেল টাওয়ারের সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্মটার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে সেইন নদীর দিকে মুখে করে শুরু হলো গল্প :

আপনি বুঝি হাইয়ার স্টাডিতে এসেচেন?—প্রশ্ন করলেন কে, ঘোষ।

শুনে হেসে উঠলেন কে. এম. রেজা : তা বলতে পারেন, হাইয়ার স্টাডিই বটে! পশ্চিমের দেশগুলোকে আর লোকগুলোকে স্টাডি করতে এসেচি। বলেই আসল উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করলেন রেজা : মানে, ইচ্ছেটা এদেশের হালচাল দেখা!

ঘোষ বললেন, ও বুঝেচি। পুঁজিপতি। চাপ-চাপ পুঁজি থেকে কিছুটা গলাতে চান!

যা বলেন!—রেজা বললেন, তবে শুনুন। চাকরি করি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে। খাই বাপের হোটেলে। পায়ে বাঁধন নেই, মন মেঘমুক্ত। মাথার উপরে বেশ ক'টি চাকরে দাদা। কাজেই আমার খরচের ঘর শূন্য। চাকরির প্রায় সব টাকাটাই ব্যাঙ্কে জমতে জমতে ক্রমেই হয়ে পড়লাম পাতি বুর্জোয়া!

কেন, নেশা-টেশা?

নাথিং অব দ্য সর্ট! প্যান-সিগ্রেট কিচ্ছু না: মাসে কয়েকটা সিনেমা খরচ আর চার-পাঁচ গ্যালন শুধু পেট্রল খরচ—ছুটির দিনে মোটর সাইকেলটা নিয়ে কলকাতার আশে পাশে বেরিয়ে পড়া! আর ইচ্ছে ছিলো বেরিয়ে পড়া এই দেশে! হ্যাঁ, এই দেশে আসা আমার স্বপ্ন ছিলো, সাধ ছিলো, প্রতিজ্ঞা ছিলো। তাই অর্থ সঞ্চয়ের সাধনা শুরু করেছিলাম।

শুনে ঘোষ চমকিত হলেন : বলেন কি? আমার ধারণা ছিলো হয় সরকারী পয়সায়, না হয় বড়লোক শ্বশুর বা বাপের পয়সা ছাড়া এদেশের মাটিতে পা দেওয়া শক্ত। আপনি আমার ভুল ভাঙলেন দেখচি।

রেজা বললেন, তা ভাঙলাম হয়তো এবং সেজন্যে দুঃখিত। তবে জেনে রাখুন, ইচ্ছে থাকলে ইচ্ছাময় তার ব্যবস্থা করেন।

তা বটে। তা বটে।—ঘোষ সায় দিলেনঃ তারপর, কি রকম দেশ-টেশ দেখলেন বলুন ?

রেজা বললেন, পায়দলে যতটা দেখা যায়, সবটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেচি।

তার মানে ?

রেজা হাসলেন, তার মানে পয়সা কম, পিয়াস বেশি। এসেচি জাহাজের টুরিস্ট ক্লাসের নীচুতলার ডেক এ, প্রায় জাহাজের খোলের মধ্যে। খাচ্চি জ্যাম-রুটি আর কফি। রাত কাটাচ্চি ওয়াই-এম-সি-এ বা ইয়ুথ হোস্টেলে আর হাঁটচি পায়দলে। অর্থাৎ দেশগুলোর মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়েই চলেচি, দেখচি হাতড়ে হাতড়ে।...চলুন, এই পোস্ট অফিস থেকে চিঠি ফেলে নীচেয় নামা যাক!

এফেল টাওয়ারের চুড়োয় পোস্ট-অফিস। ওখানে বসে টাওয়ারের ছবি আঁকা পোস্টকার্ডে চিঠি লেখা আর টাওয়ারের সচিত্র ষ্ট্যাম্প মেরে দেশের ঠিকানায় সে চিঠি ছাড়ায় একটা উত্তেজনা আছে। এফেল টাওয়ারে উপস্থিতির স্বাক্ষর! এত খরচ করে গেলাম, অথচ লোককে তা জানানো যাবে না—এ দুবলতা মনুষ্য-জনোচিত। ফরাসী সরকার এই দুর্বলতার স্থযোগ নিতে ছাড়েননি।

চিঠি ফেলে দুজনে লিফটে করে নেমে এলেন নীচেয়। এসেই দেখেন, এফেল টাওয়ারের তলায় সাজানো বাগানটায় লোকে লোকারণ্য! কী ব্যাপার ? না, মেট্রো গোল্ডেন মায়ার ছবি তুলচে। সঙ্গে রয়েচেন নায়ক লুইস জর্ডন! জর্ডন, টাওয়ারের একটি পায়ার কাছে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর পালা তখনো আসেনি। কাজেই ভক্তবৃন্দ তাঁর চারধারে দাঁড়িয়ে তাঁকে সশ্রদ্ধ-নেত্রে গিলচে।

রেজা বললেন, ওঁর অটোগ্রাফ নেবো।

ঘোষ বললেন, সেকি ? ঐ ব্যূহ ভেদ করে ?

নিশ্চয়ই।

আর আশ্চর্য, রেজা লগবগ করতে করতে জর্ডনের সামনে গিয়ে কী যেন বলে মেলে ধরলেন তাঁর ডায়েরি বই আর কলমটা। ঘোষ দূর থেকে দেখলেন, জর্ডন হাসলেন, কী যেন বললেন, পরে কলমটা নিয়ে রেজার ডায়েরি বইতে লিখে দিলেন তাঁর নাম। রেজা 'থ্যাংকস' জানিয়ে হাসিমুখে বিজয়-গর্বে চলে এলেন। ফরাসী ভক্তবৃন্দের চোখ পড়লো রেজার উপর। হাঁ হয়ে দেখলো তারা বাদামী লোকটার সাহসটা।

ঘোষ জিগ্যেস করলেন, কী বললেন গিয়ে?

বললাম, ইউ আর ফ্রম আমেরিকা অ্যাণ্ড আই'ম ফ্রম ইণ্ডিয়া; অ্যাণ্ড উই মীট্ ইন্ প্যারী! ইজন্ট্ ইট নাইস! এবং জর্ডন দেখলাম নাইস ভদ্রলোক!

তারপর ছবি তোলা দেখে, দু'জনে বিদায় নিলেন। ঠিক রইলো আবার দেখা হবে 'বাতরি' জাহাজে, ফেরবার দিনে।

ফরাসী জনসমুদ্রে মিশে গেলেন রেজা আর ঘোষ।

কিন্তু আবার তাঁদের দেখা হলো লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে। রেজা তাঁর ডায়েরি বইখানা বার করে দেখালেন ঘোষকে, এই দেখুন!

ডায়েরিতে ইনগ্রীড বার্জম্যানের সই!

এ সই কেমন করে যোগাড় করলেন?

ইনগ্রীড বার্জম্যান তখন লণ্ডনের এক থিয়েটারে 'জোয়ান অব আর্ক' বইতে নিয়মিত জোয়ানের পার্ট করচেন।

রেজা বললেন, অভিনয়ের শেষ দু'তিন দিন চেষ্টা করেছিলাম, কাছে ঘেঁষতেই পারিনি। যা ভিড়! শেষে একদিন গাড়িতে ওঠবার সময় ভিড় ঠেলে কোনরকমে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে: অটোগ্রাফ দাও! আশ্চর্য, বার্জম্যান অনেকের খাতাই সরিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু আমার ডায়েরিখানা টেনে নিয়ে ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে সই করে দিলেন; জিগ্যেস করলেন, ইউ ইণ্ডিয়ান?

বললাম, ইয়েস!

ঘোষ বললেন, আশ্চর্য আপনার অধ্যবসায়। তা হ'লে শুধু সিনেমা নয়, সিনেমা-ষ্টার দেখারও নেশা আছে!

রেজা হাসলেন, তা আছে; অর্থাৎ যা দেখতে বাড়তি পয়সা খরচ হয় না। এক কথায় অনর্থক নেশা করে অর্থনাশ করার বিপক্ষে আমি।

ঘোষ খুশিই হলেন রেজার কথায়।

সেদিন বিকেলটা রেজা আর ঘোষ একসঙ্গে বেড়িয়ে বিদায় নিলেন এবং তারপর আবার দেখা এই সাগর-নগর 'বাতরি'তে!

সাগর নগরের নীচের ডেক-এ কম দামের কেবিনে রেজা থাকেন বলে নয়, বয়েসে রেজা ঘোষের চাইতে অনেক ছোট, উপরন্তু এই নগরের নাগরিকদের মধ্যে রেজাই হচ্চে তাঁর পূর্ব-পরিচিত, কাজেই ঘোষ তাঁকে একদিন 'তুমি' সম্বোধন করে বললেন, দেখো রেজা, তোমাকে দেখা অবধি কেমন যেন ছোট ভাইয়ের মত 'তুমি' বলতে ইচ্ছে করচে। মে আই?

নিশ্চয়ই!—রেজা এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। উপরন্তু রেজাও একটি প্রস্তাব করলেন: দেখুন, আপনাকে দেখার পর থেকেই আমার দাদাদের কথা মনে হচ্চে। কাজেই আপনাকে কে-জি প্লাস দা'—কেজি-দা' বলে ডাকলে কেমন হয়?

চমৎকার হয়!—কে-জি আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন রেজাকে!

জড়িয়ে ধরে নেই বটে, কিন্তু মিস এনাক্ষী রাওয়ের গা ঘেঁষে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সি. মিটার যে, সেদিকে চোখ পড়লে চোখ সরানো দায়। অবশ্য সাগর-নগরে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। এ সমাজে প্রকাশ্যে ছি-ছি করবারও অধিকার নেই কারোর। মনের মিল হলেই হলো, ভাব জমাতে ক্ষতি নেই।

প্রমেনেড ডেক-এর শেষ প্রান্তে যে নির্জন জায়গাটুকু বাড়তি

এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়েচে সমুদ্রের উপর, সেইখানেই তাঁরা জায়গা করে নিয়েচেন একটু নিভৃতে আলাপ করবার আশায়।

কাদের দৃষ্টি তাঁদের দিকে, সে খেয়াল নেই দু'জনেরই, দৃষ্টি তাঁদের সমুদ্রের সুদূর সীমায়। সেই শেষ সীমানায় যেখানে আকাশ-সমুদ্রের মেশামেশি!

ভারতের দক্ষিণী মেয়ে মিস এনাক্ষী রাও যেন আপন মনেই বললেন, ওয়াণ্ডারফু!

সি· মিটার মানে চিত্ত মিত্র তাঁর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, হোয়াট?

এনাক্ষী বললেন, কেন, ঐ আকাশ আর সমুদ্র! কেমন মিশে আছে এক হয়ে। আকাশের ফিকে নীল, আর সমুদ্রের গাঢ় নীলের মিলটুকু দেখবার মত।

সি· মিটার এবার তাঁর সূচলো গোঁফের ডগা দুটো মুচড়ে নিয়ে বললেন, আমাদের মিলটাও কিন্তু দেখবার মত মিস রাও।

তার মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন?

মিটার হাসলেন: কেন, আপনার এই ফিকে নীল শাড়ি আর আমার এই নেভি ব্লু স্যুট! এই দুই নীলও তো প্রায় মিশে আছে!

এনাক্ষী হাসলেন: ইউ নটি! একটু সরে দাঁড়ালেন এনাক্ষী: এবার?

বিচ্ছেদ। অবশ্য বাইরে থেকে তাইই মনে হচ্চে। ঐ সীমান্তও তেমনি মনে হয়, যখন ওখানে দেখা দেয় কালো মেঘ। তা বলে কি দুই নীল আলাদা হয়ে যায় মিস রাও? আসলে ব্যাপারটা কি জানেন—থাক সে সব কথা।

থেমে গেলেন সি· মিটার। অর্থাৎ কোথায় থামতে হয়, জানা আছে তাঁর।

কিন্তু এনাক্ষী থামবেন কেন? আসল ব্যাপারটা তো জানা

দরকার! থামা-কথা নিয়ে মাথা ঘামানো বড় কষ্টকর! বললেন, কী বলছিলেন বলুন!

থাক! বরং চলুন নীচেয় যাই। এখানে বড় ঠাণ্ডা হাওয়া! —মিটার ঘুরে দাঁড়ালেন।

নো, আই ওণ্ট্। —রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন এনাক্ষী।

আচ্ছা, চলি তবে মিস রাও! আবার দেখা হবে। —সি. মিটার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচেয় নেমে গেলেন।

এনাক্ষী চেয়ে রইলেন দূর-সীমান্তে। দুই নীল তেমনই মিশে আছে!

সত্যিই বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া। ডেক-এ বেশিক্ষণ দাঁড়ানো দায়। ইংল্যাণ্ডের মেঘলা আকাশে সূর্যের কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু এই মেঘমুক্ত আকাশে খর সূর্যেরও কোন তাপ নেই যেন। হিমেল হাওয়ায় মুছে গেচে সূর্যের রৌদ্র-প্রতাপ। নরম ঠাণ্ডা সূর্যের কাজ এখানে দিনের আলোটুকু জ্বালিয়ে রাখা। পূবের সূর্য-কাতর-লোকগুলোর কাছে পশ্চিমের সূর্য হাস্যাস্পদ।

ক্রমে বেলা গড়িয়ে এলো সন্ধ্যার দিকে। আকাশের ফ্যাকাসে সূর্য লাল হয়ে গেলো, বুঝি লজ্জায়। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের জলে ডুবে বাঁচলো। আকাশ-সমুদ্রের দুই নীল কখন যেন অনুরাগে লজ্জা-রাঙা হয়ে গেলো।

মিস এনাক্ষী রাও সেই মুহূর্তে প্রমেনেড ডেক থেকে নেমে এলেন। লাউঞ্জের টেবিলে ছড়ানো সচিত্র পোলিশ ম্যাগাজিন একখানা খুলে নিয়ে হেলে বসলেন সোফায়ঃ মিটার লোকটা অদ্ভুত! মিষ্টিরিয়াস্।

সি. মিটার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে প্রমেনেড ডেক থেকে নেমে গেলেন বটে এ-ডেক-এ, কিন্তু চিলড্রেন'স রুমের পাশ দিয়ে, লাউঞ্জের ভেতর ঢুকে সোফা-কৌচ বাঁচিয়ে ঢুকলেন বাঁ দিকের সরু প্যাসেজটায়। প্যাসেজের শেষপ্রান্তে দরকারী জিনিসপত্রের

দোকানখানার কাউন্টারে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে এক পোলিস তরুণী। মিটার সেই চিত্তাকর্ষক মেয়েটির দিকেও চেয়ে দেখলেন না। বরং অন্যমনস্ক হয়েই দোকান পার হয়ে বার্বার শপ্ ও বিউটি পার্লারের পাশ দিয়ে এসে পড়লেন এণ্ট্রেন্স হলে। সামনেই চওড়া সাজানো বড় সিঁড়ি : সাগর-নগরে উপর-নীচ করবার কার্পেট-বিছানো ধাপ।

আশ্চর্য, সি. মিটার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন আবার সেই প্রমেনেড ডেক-এ। অবশ্য সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে স্মোকিং রুম আর 'বার'। কাজেই এনাক্ষী রাওয়ের অলক্ষেই ঢুকে গেলেন বার-এ।

ঘরে সবাই প্রায় দল পাকিয়ে জটলা করচে। তাসের আড্ডাও চলেচে। সামনে রাখা সোডা হুইস্কির বোতল গেলাস। আর চারদিকে কুণ্ডলি-পাকানো সিগ্রেটের ধোঁয়া। এখানেও বাজচে অ্যামপ্লিফায়ারে মৃদু মধুর সুর এবং সেইসঙ্গে আড্ডার হঠাৎ বেসুরো আওয়াজ, আর সফেন সুরার বোতল খোলার আচমকা শব্দ!

বার-এর এক কোণে আড্ডা জমিয়েচেন সানিয়াল, রামস্বামী, রয়, আর কে-জি। সি· মিটারকে ঢুকতে দেখে সবাই যেন লুফে নিলেন তাঁকে।

আসুন, আসুন, মিটার!—দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন সানিয়াল।

এক গ্লাস হবে নাকি বীয়ার?—কে-জি প্রস্তাব করলেন।

সোফায় রয় আর রামস্বামীর ফাঁকটায় নিজের দেহটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে সি· মিটার বললেন, আপত্তি নেই। তবে পরস্মৈপদী হওয়া চাই।

অপরাধ?

সামনে আমার অনেক খরচ!

কারণ?

ঐ যে মেয়ে!—জানলার ফাঁক দিয়ে মিটার দূরে দেখালেন এনাক্ষীকে। সেই তেমনি দাঁড়িয়ে নিরালা বাড়তি কোণটায়!

কিন্তু দাড়ি-শাড়ির হঠাৎ এমন ছাড়াছাড়ি কেন জানতে পারি কি ?—সানিয়াল প্রশ্ন করলেন।

রয় বললেন, আমরা এখান থেকে লক্ষ্য করছিলাম, দিব্যি দুটি কপোত-কপোতী রেলিং ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—হঠাৎ কপোত পত্‌পত্‌ করে উড়ে গেলেন।

এবং জুড়ে বসলেন আমাদের মাঝখানে!—রামস্বামী কথাটা শেষ করলেন।

ব্যাপারটা আশংকাজনক।

তাইতো মনে হচ্ছে।

আজ্ঞে না!—মিটার যেন থাবা মেরে থামিয়ে দিলেন সবাইকে : জেনে রাখুন, প্রেমের পথ ঘোরালো। তাই ঐ মিস রাওয়ের কাছ থেকে সোজা এখেনে না এসে অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হলো।... কই, আমার গেলাস কই ?

রয় বললেন, আমি দিচ্ছি এনে। ইউ আর মাই গেষ্ট। কিন্তু অন্ দিস্ কণ্ডিসন, যে, শাড়ি-দাড়ির প্রেমোপাখ্যান শোনাতে হবে!

মিটার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি তো বলবার জন্যে মুখিয়ে আছি! আপনারা অনুগ্রহ করে শুনলেই হয়। মানে, প্রেম করায় যত না আনন্দ, সে কথা প্রকাশ করায় ততোধিক গর্ব। একটি মেয়ে আমাকে ভালবাসে, আমার জন্যে পাগল, আমার কথা শয়নে-স্বপনে ভাবচে—এত বড় একটা খবর চেপে রাখলে হার্ট ডিজিজ হবেই।

রয় ততক্ষণে সোফা ছেড়ে উঠে বার-এর কাউন্টারে গিয়ে এক-গেলাস বীয়ার এনে রাখলেন সামনের টেবিলে : এবার শুরু হোক উপাখ্যান!

মিটার এক চুমুক খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন : ঐ যে মেয়ে মিস এনাক্ষী রাও, উনি ফিরচেন ইংল্যাণ্ড থেকে মিডওয়াইফ্রি পাশ করে। বয়েস বেশি নয়, ভদ্রমহিলার মুখ চোখ চেহারা দেখেই

বুঝেচেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এই বয়েসেই তিনি নিজেই নিজের অভিভাবিকা। ইণ্ডিয়ায় বুড়ি মা আর ছোট ভাই। মিস রাও ওখানে হস্‌পিটালে চাকরি করেচেন, পড়েচেন, পাশ করেচেন এবং খরচ-খরচা করেও দেশে মা-ভাইকে খরচ পাঠিয়েচেন!

বলেন কি?—কে-জি বললেন, রীতিমত গুণবতী মহিলা!

শুধু গুণবতী নয়, রূপবতীও। ইজন্ট ইট?

অ'কোর্স!—প্রায় সবাই সায় দিলেন!

কাজেই—মিটার বললেন, জাহাজে উঠিয়া যেই ও-রূপ নেহারিনু, সেই হতে লেগে গেলো ভালো! আর ভালো লাগলেই আমার কেমন একটা রোগ, কেবল 'ভালো-ভালো' বলা। কাজেই এই দু'টো দিন সুযোগ মত কেবল 'ভালো-ভালো' বুলি কপচেচি। তোমায় দেখতে ভালো, তোমার চলন ভালো, বলন ভালো, শাড়ি পরার ধরন ভালো, হাতে পায়ের গড়ন ভালো ইত্যাদি সব সুমন্ত্র যদি কোন মেয়ের কানের কাছে ক্রমাগত জপ করা যায়—তবে সে মেয়েকে জপাতে বেশিদিন লাগে না। ভালো যে বলে, তাকে ভালো লাগে না, এমন পাষাণী কে আছে এই দুনিয়ায়?

তা ঠিক।—রামস্বামী বললেন।

সানিয়াল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, আমি ছাই তাও পারলাম না। গিন্নীকে 'ভালো' বলতো না পারায় তাঁর মুখ-ঝামটাই খেয়ে গেলাম। আবার ও দেশটায় ভালো-ভালো মেয়ে দেখলাম কত, কত কথাও বললাম, কিন্তু মুখ দিয়ে 'হাউ বিউটিফুল' এই কথাটুকু বলতে পারলাম না ভয়ে আর সঙ্কোচে।

ব্রাদার, ঐখানেই তো মজা!—মিটার হাসলেন: নিন্দে করা সোজা, ভালো বলা বড় শক্ত।...আমার তো এই চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস হলো—এবং নেভির দৌলতে এবার নিয়ে এই সমুদ্র পথে চতুর্থবার যাত্রা। এই সমুদ্রে পেয়েচি মলয় হাওয়া, দেখেচি ঝড়ো হাওয়া; স্তম্ভিত হয়েচি বোমার আলোড়নে, বিহ্বল হয়েচি জাহাজ-

ডুবিতে। দেখেচি ব্রাদার, এই সমুদ্রে অনেক কিছুই দেখেচি। দেখেচি এই সমুদ্রের তীরে তীরে নানা জাতের, নানা লোকের বসতি। মিশেচি তাদের সঙ্গে, একাত্মা হয়ে গেচি তাদের সঙ্গে। বসুধৈব কুটম্বকম্। আর এই কুটুম্বিতা পাতাতে পয়সা খরচ নেই, শুধু মুখে একটু মধু ঝরানো : ঐ হাউ-বিউটিফুল! কী সুন্দর! বিদেশে শুধু এইটুকুতেই বাজীমাৎ! তাদের একজন হয়ে যেতে আর কোন বাধা থাকে না! কূটনীতি বিশারদদের এই কথাটুকু প্রাণ খুলে বলতে বাধে বলেই তো আজ এত বোমা ফাটাফাটি, আর মাথা ফাটাফাটি।

হঠাৎ রয় থামিয়ে দিলেন মিটারকে : শুনতে চাইলাম প্রেমোপাখ্যান, আর শুরু করলেন রাজনীতি! বামা ছেড়ে বোমা-র কথা কেন ?

সরি! মিটার বললেন, হাউ বিউটিফুল কথাটুকুতে যেমন এই বসুন্ধরা বশ, তেমনি বসুন্ধরার সুন্দরী বাসিন্দারাও বশ। অতএব মিস এনাক্ষী রাও-ও বশ হলেন!

কে-জি তাল দিলেন, বেশ, বেশ! তা কতদূর এগিয়েচে ?

মিটার বললেন, শুকনো কথার পালা হয়েচে সাঙ্গ, এবার চলচে মন দেয়া-নেয়ার পালা!

সানিয়াল টিপ্পনি কাটলেন,—তা হঠাৎ পালিয়ে এলেন কেন!

মিটার বললেন, একটা সমস্যা দিয়ে এলাম, সময় দিলাম সমাধান করতে! মাষ্টারমশায় ছাত্রকে জিওমেট্রির প্রব্লেম দিয়ে বলেন যেমন, কষো, এও ঠিক তেমনি। প্রেমের ব্যাপারে প্রব্লেম এগিয়ে ধরতে হয়, যাতে অংক কষে উত্তর বার করতে পারে; হঠাৎ উত্তর যদি দেওয়া যায়, 'আমি তোমায় ভালবাসি'—তাতে গালে আচমকা চড় খাবার সম্ভাবনা, আর চাড় থাকে না মেয়েদের! ব্রাদার, প্রেমের ব্যাপারে প্রব্লেম বড় প্রয়োজন!

রয় সিগ্রেট টানছিলেন। বললেন, মশয় দেখচি প্রেমের গুরুঠাকুর!

মিটার আর এক চুমুক বীয়ার খেয়ে ঠোঁট দিয়ে গোঁফটা মুছে নিয়ে বললেন, তা যা বলেচেন! প্রেম-ভিখারিনীদের প্রেম বিতরণ করতে করতে কখন যে গুরু ব'নে গেচি, তা নিজেরই খেয়াল নেই। তা কম তো হলো না? আঙুলের দাগে যে ক'টা দাগ গোনা যায়, তার চাইতে বেশিই হবে! এই সব জাহাজের দৌলতে কত-ঘাটের জলই না খেলাম! দেখলাম কত জাঁহাবাজ মেয়ে, কত সরল শান্ত নম্র লতা! আর বুঝেচি স্কার্ট, শ্ল্যাক্স, শাড়ি, ঘাঘরা, কিমোনো, পায়জামা—আলাদা জাতের হলেও, তাদের প্রেমের সুতোর টানা-পোড়েন একই রকম।

রামস্বামী গম্ভীর হয়ে শুনছিলেন আর গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলেন। হেসে বললেন, আছেন বেশ!

তা আর কি করা যায়?—মিটার নিজের গোঁফ চুমরে নিলেন: নিজের বলতে কেউ নেই, সব খেয়ে বসে আছি। বাপের ভিটে এখন পাকিস্তানের কবলে। তাই ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াই এই জাহাজখানার মতোই। নিঃসঙ্গ জীবন! সঙ্গী চাই তো! কিন্তু কোন পুরুষের সঙ্গে সময় কাটানো অসহ্য। মনে হয়, সময়টা নষ্ট হলো—বলেই হাসলেন: অবশ্য এখন নয়! এ সময়টা ইণ্টারভ্যাল!

এমন সময় বার-এর জানালা দিয়ে দেখা গেলো মিস এনাক্ষী রাও প্রমেনেড ডেক-এর নিরালা কোণ থেকে নেমে গেলেন নীচেয়।

সানিয়াল হেসে বললেন, রাই নীচেয় নামলেন।

মিটার বললেন, যাই, আমিও যাই।

তবে কে-জি ছাড়া সবাইকে উঠতে হলো। সারা সাগর-নগরে বেজে উঠলো প্রথম ব্যাচের ডিনার বেল—টুং টাং-টুং টাং!

কে-জি সেকেণ্ড ব্যাচে ডিনারে বসেন।

সেকেণ্ড ব্যাচেও ডাইনিং হলটা প্রায় ভর্তি হয়ে যায়। পোর্ট-হোলের পাশেই একটা চার-চেয়ারের টেবিলে বসেন কে-জি আর দুই

শাশুড়ী-বৌ : মিসেস ফোর্ড সিনিয়ার এবং জুনিয়ার। শাশুড়ী ফোর্ডের কুঞ্চিত, রেখায়িত মুখে 'ব্রিটিশ-মেড' ছাপ, কিন্তু বৌ-ফোর্ডটির ঢলঢলে মুখে লাবণ্যের তুলি বোলানো। গোলাপী গালের ডান দিকে একটি তিল—বিউটি-স্পট্! ঢেউ-তোলা কালো চুল, কাজল-কালো চোখ দু'টি, দুল-দুল করে দোলায়মান কানে রূপোর দুল। স্কার্টের চাইতে সোয়েটার-পায়জামারই ভক্ত তিনি। অতএব তাঁর যৌবন-দেহতটে উঁচু-নীচু ঢেউয়ের খেলা। সে খেলা উপভোগ্য! তাই অনেকেরই দৃষ্টি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সর্বনাশা ফোর্ড-বধূ মজান এবং মজা দেখেন।

এ হেন জ্বলন্ত আগুন সামনে নিয়ে কে-জি রোজ চারটি বেলা ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেন। কী যে খান, আর কী যে গেলেন, তা তিনিই জানেন। তবু রক্ষে, পাশের চেয়ারে এক কলসী জল থাকে—শান্ত-শিষ্ট শাশুড়ী ঠাকরুণ। সত্যি, ভারি মিষ্টি বুড়ি! মুখখানি হাসি-হাসি। দেখলেই 'গ্র্যাণি' বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে! বৌমার সৌন্দর্য প্রদর্শন প্রচেষ্টায় শাশুড়ী-ঠাকরুণের যে কোনরকম আপত্তি আছে - অন্তত তাঁর মুখের আর্শিতে তা বোঝা যায় না। বরং শাশুড়ী-বৌয়ে বেশ ভাব! দু'টিতে হরদম সিগ্রেট ফোঁকেন আর কথার ফাঁকে ফাঁকে ফিক-ফিক হাসেন।

প্রথম দিনের দু'টি বেলা তিনজনেই বিনা বাক্যব্যয়ে খাদ্যের সদ্ব্যবহারেই ব্যস্ত ছিলেন। অবশ্য দেখা হতেই গুড-মর্নিং, গুড-ডে ইত্যাদি বলতে হয়েছিলো—নেহাৎ ভদ্রতা! কিন্তু এই সাগর-নগর যখন ইংল্যাণ্ড নয়, আর এর বাসিন্দারা যখন নিজের মর্জি মতই চলেন, তখন আলাপ জমাতেই বা বাধা কি? আর আশ্চর্য, ফোর্ড-বধূই প্রথম দিনের তৃতীয় বেলায় চায়ের টেবিলে কথা পাড়লেন : উইল ইউ য়্যাব সিগ্রেৎ?—এগিয়ে ধরলেন তাঁর চকচকে সিগ্রেটের কেস।

থ্যাংকস!—কে-জি বললেন, আই স্মোক পাইপ। ইফ ইউ পারমিট—

অ' কোর্স! শাশুড়ী-ফোর্ড অনুমতি দিলেন।

কে-জি টোবাকো পাউচ, আর পাইপ বার করে টোবাকো ভরতে লাগলেন পাইপে। পাউচে এখনো লণ্ডনে কেনা 'থ্রিনান' টোবাকো আছে: এক আউন্স সাড়ে চার শিলিং! কাজেই ইংল্যাণ্ডে একটু বেশি ইণ্টারভ্যালেই পাইপ টানতে হতো কে-জিকে। অথচ ইণ্ডিয়ায় থাকতে ঐ কোয়ালিটির টোবাকো মিক্সচার কিনেচেন সাড়ে পাঁচ টাকায় ছু' আউন্সের কৌটো। তবে এই সাগর-নগরে কোন পার্চেজ ট্যাক্স নেই, কোন কাষ্টম ডিউটি নেই, কাজেই টোবাকোর দাম জলবৎ সস্তা। কে-জির মেজাজটাও তাই খুশি।

মেজাজ খুশি অনেকেরই। ইংল্যাণ্ডের এক শিলিং চার পেন্সে দশটি সিগ্রেটের প্যাকেট কিনে হিসেব করে ধূমপান করতে হতো অনেককেই। আর এই সাগর-নগরে ঐ দামে টিনের চ্যাপ্টা কেসে কুড়িটা ক'রে গোল্ডফ্লেক কিনচে আর ফুকচে সবাই। লাউঞ্জের টেবিলে সিগ্রেটের খালি কৌটোর ছড়াছড়ি।

এই একই কারণে সুরাপায়ীরাও মদ-মত্ত। রকম রকম স্বাদের মদ আর বীয়াব তাই অহরহ গ্লাসে আর ডিকেণ্টারে। হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, রাম, শেরি, জিন্, ভড্কা—কি চাও? বসে যাও। দেশে এক বোতল লেমনেডের দামে একপাত্র সোমরস।

কে-জি পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে জিগ্যেস করলেন, আর ইউ বাউণ্ড ফর্ বম্বে?

নো।—লিপষ্টিক রাঙানো ঠোঁটে সিগ্রেট চেপে ফোর্ড-বধূ উত্তর দিলেন, তু জেব্রলতার্।

হায়রে! জেব্রল্টার! এই মধুর সঙ্গ সাঙ্গ হবে কয়েকদিনের পরেই! কিন্তু উপায় কি? পরের বঁধুয়ার এই তো রীতি। আসে, হাসে, বসেও পাশে; শেষে হঠাৎ হেসে পালিয়ে যায়।

যাকগে! বলেই হয়তো কে-জি সান্ত্বনা দেন মনকে। পাইপটাকে একটু জোরেই টানেন। শুরু করেন গল্প।

খাবার টেবিলের পোলিশ ওয়েটায় কোর্স বদলে-বদলে দেয় আর সেই সঙ্গে তিনজনের গল্পের কোর্সও বদলাতে থাকে।

কে-জি বললেন, আমি ইণ্ডিয়ান। ক্যালকাটায় বাড়ি।

আমি হচ্চি স্পেনের মেয়ে। জেব্রলতারে বাড়ি।—আরো বললেন ফোর্ড-বধূঃ তবে শ্বশুরবাড়ি ইংল্যাণ্ড, আর ইনি হচ্চেন শাশুড়ী।

শাশুড়ী বললেন, আমি কিন্তু ইংল্যাণ্ডের। ইংল্যাণ্ডেই জন্ম, কর্ম, বিয়ে!

কে-জি বললেন, তা ছেলের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া কেন?

রোদ পোহাতে!

বৌ গা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, উঃ, ওদেশটায় যা শীত! জমে যেতে হয়।

কে-জি হাসলেন, যা বলেচো! তা এখন আর উঃ-আঃ করলে চলবে কেন? বর পছন্দ করবার সময় ঘর কোথা তার জানতে না?

ঠিক বলেচো!—শাশুড়ী ফোর্ড ডিটো দিলেন। হেসে বললেন, তবে আমার একটা রোদ্দুর পোহাবার জায়গা হয়েচে। ছেলে গেছলো ওদের দেশে ভালো একটা চাকরি নিয়ে। ফিরলো যখন সঙ্গে আনলো টাকা আর আমার এই সুইট ডিয়ার 'টকি'-টিকে।

'টকি'ই বটে! এক নম্বরের গল্পে। ইংরেজের বৌ কিন্তু গোমড়ামুখো ইংরেজের আদব-কায়দার ধার ধারে না একটুও। হয়তো জেব্রলটারের রোদ্দুরের মতই ঝলমলে, ইংল্যাণ্ডেরমেঘলা আকাশের ছোঁয়াচ লাগেনি গায়ে।

কে-জি প্রশ্ন করলেন, ভাগ্যবানটি কোথায়?

হাসলেন ফোর্ড-বধূঃ জেব্রলতারে।

শাশুড়ী বললেন, উইলি আমার ভারি ভালো ছেলে। ম্যামি শীতে কষ্ট পাচ্চে, অথচ সে দিব্যি রোদ্দুরে দিন কাটাচ্চে, তাই বোধ হয়—

ইয়েস।—বধূ বললেন, উইলি বললে, আমি তো ছুটি পাচ্ছিনে। তুমি যাবে হোমে? ম্যামিকে নিয়ে আসবে কয়েক হপ্তার জন্যে?

পুত্রগর্বে মা বললেন, তাই এই শুভযাত্রা।

এতক্ষণ মেসিনের মত কাজ করে গেচে পোলিশ ওয়েটারটি! কখন যে কোর্স শেষ হয়ে গেচে, কারোর খেয়াল নেই, অথচ কিছুই বলেনি ওয়েটার। আফটার-ডিনার-কফির তিনটি ট্রে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর যদি কিছুর দরকার হয়: টর্ট কেক বা ফ্রুট মেলবা বা ড্রিংক!

ওয়েটারটির নাম দ্‌লা পাসাৎসা নাসত্‌কস্‌। পোলাণ্ডে কোতেনিয়া সহরে বাড়ি। চমৎকার সুশ্রী চেহারা। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ হবে। এক মাথা সোনালী চুল, রেশমের মত, সযত্নে আঁচড়ানো। নীল দুটি চোখ সরল, সুন্দর, স্নিগ্ধ! কালো ফুল-প্যাণ্টের উপর সাদা ধবধবে জ্যাকেট। কাঁধে নীল ষ্ট্রাইপ! চাল-চলনে ভদ্রতার ছাপ। কথা বোঝে না, তবে ইশারা বোঝে! যেই একটি কোর্স শেষ হয়ে যায়, নিমেষে সরিয়ে নেয় ডিশ, পেতে দেয় নতুন ডিশ ধবধবে ফুলকাটা টেবিল ক্লথের উপর।

পাশাপাশি তিনটি টেবিলের ভার পাসাৎসার উপর। তার কাজ প্রত্যেকদিন খাবার সময় পরিষ্কার টেবিলক্লথ পাতা, ফুলদানিতে ফুল সাজানো, এ্যাস-ট্রে টেবেলসল্ট-এর পট সাজিয়ে রাখা, প্রত্যেক চেয়ারের সামনে ডাইনিং প্লেট, কাঁটা-চামচ-ছুরি-ন্যাপকিন গুছিয়ে রাখা এবং সেই সঙ্গে প্রতিদিনের ছাপানো মেনু। তারপর চারটি বেলায় দু'ব্যাচ করে আটবার সার্ভ করা নির্ভুলভাবে, ঠিক তাল রেখে—খুব সহজ কাজ নয়।

কিন্তু অতি সহজেই যেন সব কিছু করে যায় পাসাৎসা। যন্ত্রের মত। মুখখানায় ঈষৎ বিষণ্ণতা। দেখলে মায়া হয়। জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়, কী তোমার মনের দুঃখ? হয়তো কোতেনিয়ার

ছোট্ট বাড়িটার কথা ভাবে। ভাবে তার বুড়ি মায়ের কথা, তার বোনের কথা, তার ছোট্ট ভাইটির কথা। তার বাবা ছোট বেলায় মারা গেচে। তার কথা মনেই পড়ে না পাসাৎসার। তবে মনে পড়ে কি ঐ সহরেই কোন 'ভিলা'র নীল-নয়না কুমারী মেয়ের মুখ। হয়তো এই এবারেই 'বাতরি' যখন নোঙর বেঁধে ঝিমুচ্ছিলো পোলাণ্ডের বন্দরে এক হপ্তার মেয়াদে তখন পাসাৎসা নিশ্চয়ই দেখা করেচে প্রতি সন্ধ্যায় তার মনের-মেয়ের সঙ্গে। হয়তো পার্কে কোন বেঞ্চে বসে প্রিয়ার সরু কোমর ধ'রে নরম গালে চুমু দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েচে তাকে ঃ আর ক'টা মাস ধৈর্য ধরো, জমিয়ে নিই হাতে কিছু, তখন পাতবো সংসার! তুমি আর আমি, আর ঐ আকাশের চাঁদ।

তোমার মা, বোন, ভাই ?

তাদেরও দেখতে হবে বৈকি? যতদিন মা আছেন, বোন বড় না হয়, ভাই চাকরি না পায়।

তবে? কী করে সব হবে?

হবে। হবে। সব হবে। পাসাৎসার গলার স্বর আবেগে হয়তো কেঁপেছিলো ঃ তুমি যদি পাশে থাকো, আমি কী না করতে পারি?

কে-জি-দের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পাসাৎসা তার প্রতিশ্রুতির কথাই ভাবছিলো কি? কে জানে।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ফোর্ড মহিলাদের কে-জি বললেন, রাত্রে ফিল্ম-শো দেখবে নাকি?

যেতে পারি। ম্যামি, তুমি?

নো, মাই ডিয়ার।

কী বই হবে?

ফরবিডন্ কারগো। শুনেচি ভালো বই।

তাই নাকি? ধন্যবাদ।

সবাই উঠে দাঁড়ালেন। পাসাংসা ট্রে গুছিয়ে নিয়ে গেলো কিচেনে।

রাত ন'টায় সিনেমা শো।

ডিনারের পর্ব শেষ হয়ে গেচে। অনেকেই আড্ডা জমিয়েচে লাউঞ্জে। কেউ বা যথারীতি বার-এ। চারধারে কাঁচের দরজা-জানলা সব বন্ধ। কনকনে শীতে বাইরের ডেকগুলো নীরব নির্জন।

গল্পের ফাঁকে ফাঁকে অনেকেই হাত-ঘড়ি দেখচে : আর কিছুক্ষণ বাদেই শো শুরু।

ডিনার-হলেই সিনেমা শো হবে। রূপোলী পর্দা টাঙানো হয়েচে, প্রজেকসন রুমে যন্ত্রপাতি ঠিক করচে কর্মচারি দু'জন।

এক এক করে জমেচে এসে লোক। সুবিধেমত খালি চেয়ারগুলো দখল করচে এক একটি দল। কেউ বা একলাই।

রয়, সানিয়াল, রামস্বামী একসঙ্গেই ঢুকলেন, বসলেন এক সঙ্গে। একটু পরে এলেন মহাবিষ্ণু সেন, যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে।

হ্যারি আর জেন গ্র্যাটন এসে বসলেন কোণের একটা টেবিলে।

ইয়াংকি সালিম হক একলাই এলেন।

একটু পরে এলেন মিস এনাক্ষী রাও, আর ঠিক তার পেছন পেছন সি· মিটার। ষ্টিমারের পেছনে যেন গাদাবোট। বসলেন দু'জনে কাছাকাছি। সানিয়াল-গ্রুপের নজর এড়ালো না। নিজেদের মধ্যে হেসে নিলেন তিনজনই। মহাবিষ্ণু জানতেন না এই হাসা-হাসির ব্যাপার। জিগ্যেস করে জানলেন যখন ব্যাপারটা, তখন তিনিই বা হাসতে ছাড়বেন কেন? হাসলেন।

খানিক পরে এলো কে-জি আর রেজা। দু'জনে গ্র্যাটনদের পাশের টেবিলটা দখল করলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকলেন মিসেস ফোর্ড, জুনিয়ার। সঙ্গে শাশুড়ী ফোর্ড আসেননি। পোশাক বদলে ফেলেচেন ফোর্ড-বধূ।

ঢুকেই দাঁড়ালেন একবার। চোখ বুলিয়ে নিলেন সারা হলটায়। কে-জির দিকে নজর পড়তেই এগিয়ে গেলেন সেই দিকে : হ্যালো।

হ্যালো, প্লীজ বি সীটেড।

থ্যাংকু।

দিস ইজ মাই টেবিল-পার্টনার মিসেস ফোর্ড, জুনিয়ার ; মাই ফ্রেণ্ড মিঃ রেজা।

কে-জি দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ক্রমেই লোক জমতে লাগলো।

এলেন মিঃ এবং মিসেস হারমান আর তাঁদের জার্মান মিউজিসিয়ান দল। করাচী যাচ্ছেন দলবল নিয়ে। মিঃ হারমানের মাঝারি গোছের চেহারা। বেশি লম্বাও নন। বয়েস চল্লিশের কাছে। সোনালী চুল পাট করে পেছনে ঠেলা। স্ত্রীটি যেন একটি রাজহংসী। মরাল গ্রীবা। প্রতি পদক্ষেপে আভিজাত্যের চিহ্ন। দীর্ঘাঙ্গিনী। একটি ডাঁটালো রজনীগন্ধা। প্রকাশ্যে এই পাঁচজনের সামনে হারমান-বধুর বক্ষশোভা বর্ণনায় নিরস্ত থাকাই ভদ্রতা। কোঁকড়ানো সোনালী এক গোছা চুল তরুণীর ঘাড় পর্যন্ত নেমে শেষে হঠাৎ যেন থমকে থামা। দু'কানে দু'টি মুক্তো-দুল। গালে ঘষা রুজ এবং পাউডার, ঠোঁটে রাঙা লিপষ্টিক, চোখের ভুরু কালো পেন্সিলে ঘষা। মিসেস হারমানের পাশে মিঃ হারমানকে দেখায় ছোট্ট ভায়ের মত। মানায়নি।

তারপর দেখা গেলো একটি ব্যাচ। আলি-পরিবার। সামসুদ্দীন আলি ; বিলিতী নাম স্যাম-আলি। আলি ও তাঁর বিলিতী স্ত্রীর ছেলে মেয়ে মিলিয়ে সাতটি অপগণ্ড। বড়টি মেয়ে, রোজি, বয়েস দশ এবং সর্বশেষ ফলটি, একটি ফুটফুটে খোকা, আট-ন' মাসের। মিসেস আলি সাক্ষাৎ জগজ্জননী, বাৎসরিক ফলপ্রসূ, সর্বংসহা

বসুন্ধরা। শীতের দেশে নাকি সন্তান-জন্ম কম হয়! এ যে কত বড় মিথ্যে, তার প্রমাণ এই আলি দম্পতি।

ইংরেজ আমলে স্যাম-আলি এসেছিলো জাহাজের খালাসী হয়ে ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে। সে প্রায় বারো বছর, এক যুগের কথা। ইংল্যাণ্ডকে তার ভালো লেগেছিলো, তাই ভুলেছিলো চট্টগ্রামকে। কিন্তু চট্ করে কি ভোলা যায়, যে মাটিতে নাড়ির টান? স্যাম-আলি লণ্ডনের ইষ্টএণ্ডে এক দুঃস্থ পল্লীতে বাসা বাঁধলো, মন বাঁধা দিলো ঐ পাড়ারই এক রুটিওয়ালার মেয়েকে। ক্রমে যা হয়ে থাকে, স্যাম-আলি বাঁধা পড়লো সংসারে, বাঁধা পড়লো পুত্র-কন্যার মায়ার বাঁধনে। এবং বাঁধা পড়লো দেনার দায়ে, ঋণের জালে।

স্যাম-আলি বহু চেষ্টা করেছিলো নিজের পায়ে দাঁড়াতে, পারেনি। বিলিতী শ্বশুররা জামাইয়ের দায় ঘাড়ে নিতে চায় না। সেখানে বাপের যখন মেয়ের বর খোঁজার দায়িত্ব নেই, তখন মেয়ের বরকে বরণ করবারই বা আগ্রহ থাকবে কেন? রুটিওলা তাই মেয়ের আগ্রহে কালা-আদমিকে মেয়ে দিলো বটে, কিন্তু হাত তুলে রুটি দিলো না। কিন্তু স্যাম-আলি পুরুষ, তার উপর তার চাঁটগেঁয়ে গোঁ। বললো, ডার্লিং, নো ফিয়ার। আই'ল আর্ন ব্রেড ফর য়ু আণ্ড মাই চিলড্রেন। স্যাম-আলি গড়ানে পাথরের মত এক কাজ থেকে আর এক কাজে ঠোক্কর খেতে খেতে দিন কাটাতে লাগলো। ধূপকাঠি তৈরি করে পেটিকোট লেনের সানডে-হাটে বিক্রী করলো কিছুদিন। কিছুদিন পোর্টারের কাজ করলো, পুরোন কাগজের ব্যবসাও করলো কয়েকমাস। বড়দিনের সময় বাড়তি পোষ্টম্যানের কাজও নিলো কয়েকবছর। কিন্তু ভাগ্যদোষে কোন কাজেই টিকে থাকতে পারলো না স্যাম-আলি। এদিকে উর্বরা ডরোথি আলির কোলে বছর বছর ফসল ফলচে: রোজি, জন, এলবার্ট, পামেলা, হেনরি,—আরো, আরো!

এমন দিনে পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রেও পূবের কোনটায় নতুন

ফসল ফললো। ভারত স্বাধীন হলো, পাকিস্তান জন্ম নিলো। সিংহল শৃঙ্খল ভাঙলো, ব্রহ্ম মুক্তি পেলো। স্যাম-আলির মনে পড়লো চট্টগ্রামের কথা। আর না, দেশকে ভুলে দুর্দশার আর শেষ নেই। এবার দেশ। দেশে যেতে হবে। চাঁটগাঁয়েতে জন্ম, যেন চাঁটগাঁয়েতেই মরি!

ডার্লিং, উইল য়ু গো টু চিটাগং?

সর্বংসহা নারী বললো, ইফ নাথিং ইজ রং দেয়ার, দেন হোয়াই নট্।

ডরোথি, রোজি-জনদের মুখ চেয়েই কথাটা বললো। পোড়া পেটে এদেশের পোড়া রুটিও যখন জুটলো না, তখন কি দরকার এই পোড়া দেশে থেকে! আর স্বামীর দেশও তো তারই দেশ। আর সেখানে স্বামীর আত্মীয়স্বজন আছে—যা হোক কিছু ব্যবস্থা একটা হবেই হবে। চলো ডার্লিং তাই চলো।

কিন্তু চলো বললেই তো চলা যায় না, বিশেষ করে অচল যাদের সংসার। দেনা মেটাতে সর্বস্বান্ত হতে হলো। পা বাড়াবার জন্যে হাত বাড়াতে হলো জানা শোনা প্রায় সবার কাছেই। শেষপর্যন্ত জোগাড় হলো প্যাসেজ।

গুডবাই ইংল্যাণ্ড!

আলি-পরিবার পাড়ি দিলো চিটাগং-এর উদ্দেশে! ডরোথির দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। রোজি জন হাঁ করে চেয়ে রইলো ম্যামির দিকে। ড্যাডি চেয়ে আছে সমুদ্রের শেষ সীমায়! সাগর-নগর 'বাতরি'তে উঠেই হাততালি দিয়ে উঠলো দুই অবুঝ, পামেলা আর হেনরি :

কী মজা! কী মজা!

ডিং—ডং—ডং।

গোয়িং গোয়িং গন!

হলের আলো নিভে গেলো। শুরু হলো সিনেমা শো : ফরবিডন কারগো, গোয়েন্দা কাহিনী।

সাগর-নগরের নাগরিক জীবন এলোমেলো, ঢিলে, ডেভিল-মে-কেয়ার গোছের। তাছাড়া এই সিনেমা-শোয়ের জন্যে যখন বাড়তি টিকিট কাটতে হয়নি, তখন ঘড়ির টিক-টিক আর টিটকিরির ভয়ে সময় মিলিয়ে হলে ঢুকতে হবে, তার কি মানে আছে। গেলেই হলো, বসলেই হলো, ভালো না লাগলে বেরিয়ে এলেই হলো। আর যেতেই হবে, তারও তো কোন মানে নেই!

তবে অন্ধকার হলের দরজা ঠেলে ঢুকলেন মিঃ কে, এম, শা—সাগর-নগরের সবচেয়ে ছোট্ট নাগরিক, আকৃতিতে। মাত্র চার ফুট উঁচু, অথচ বয়েস চল্লিশের কোঠায়! ভদ্রলোকের কাঠামোটা কেন যে প্রমাণ সাইজের নয়, বোঝা গেল না; হয়তো খেয়ালী ভগবান হাতের কাছে দরকার মত মাল মশলা না পেয়ে, যা পেলেন তাই দিয়ে শেষ করলেন মানুষটিকে; অথচ কাঠামোর মধ্যে ঠেসেঠুসে ভরে দিলেন দরাজ একটি মন। ফল দাঁড়িয়েচে, ভদ্রলোক নীচু দেহ আর উঁচু মন নিয়ে সাগর নগরের প্রায় সবার সঙ্গেই পাতিয়েচেন আত্মীয়তা। কাজেই হলে ঢুকতেই প্যাসেজের ডান দিক থেকে কে যেন তাঁর হাত ধরে টানলো: কাম হিয়ার, মাই টলম্যান! বাঁ দিক দিয়ে তাঁর হাত ধরে টানলো কেউ: হিয়ার মিঃ লিলিপুটিয়ান, দিস্ সাইড! পেছন থেকেও তাঁর কোট ধরে টান দিলো একজন: যান এগিয়ে মিঃ শা স্ক্রীনের সামনে, নইলে দেখতে পাবেন না। শা রসিক। উত্তর দিলেন: কেন? পেছনেই বসি না, আপনার কোলে?

তা পারেন বসতে মিঃ শা। এই সিনেমা হলের সীটগুলি আনরিজার্ভড্ বটে, কিন্তু শা-এর জন্যে সবার কোল্-ই রিজার্ভ করা।

আর কোলেও যে চড়েন নি, তা নয়। প্যারির নাইট-ক্লাবে একাধিক বিশালাঙ্গিনীর নরম কোলে তিনি সাদরে স্থান পেয়েচেন। মায়ের কোলে বসে শিশু যেমন দুধের বাটিতে চুমুক দেয়, ঠিক তেমনই সুঠাম-দেহী বহু ললনার নগ্ন হাঁটুতে বসে পরম আরামে চুমুক দিয়েচেন তাদের হাতের সুরাপাত্রে। মিঃ শা তাঁর ছোট্ট দেহটির জন্যে সবার

আদরের, বড় মনটির জন্যে সবার প্রিয়। গুণীও। তিনটি বছর প্যারীতে কাটিয়েচেন এমনি নয়। প্যারি ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট নিয়ে ফিরচেন এখন দেশে, বম্বে থেকে কয়েক মাইল দূরে। শহরের নাম ঠিকানাটা গোপনই থাকুক, সংসারে তো শত্রুর অভাব নেই! প্যারিতে শা-র গোপন প্রেমের গল্প পাঁচ কান হয়ে দেশে বিবি আর বাবালোকের কানে গেলে ব্যাপারটা দাঁড়াতে পারে ঘোরালো।

প্রেমের পথ নাকি ঘোরালো। বিশেষ করে সাদা-কালোয় প্রেম! তাই বোধ হয় মিঃ লতিফের পুরো একটি বছর ঘুরতে হলো এমা ব্রাউনের পেছনে। সিনেমা, থিয়েটার, রেস্তোরাঁ আর ট্যাক্সিতে সপ্তাহে চার পাউণ্ড থেকে পাঁচ পাউণ্ড গলাতে হয়েচে। তাছাড়া বার্থডে প্রেজেন্ট, ক্রীষ্টমাস প্রেজেন্ট, হলিডে ট্রিপস্, ড্রিংক, ড্যান্স, ডিনার—কম খরচের ব্যাপার! সাদা মেয়ে নয় তো, এক একটি শ্বেত হস্তিনী। শ্বেত প্রণয়িনীর নরম আঙুলে আংটি গলাবার আগেই দেশে একটি জমিদারী গলে যাওয়াও বিচিত্র নয়। নেহাৎ মিঃ লতিফের চাচা লড়াইয়ের বাজারে বিফ্ সাপ্লাই করে কিছু টাকা জমিয়েছিলেন এবং লতিফের সৌভাগ্যক্রমে চাচা-চাচীর ছেলেপুলে না হওয়ায় এবং তাঁদের হৃদয়ের বেশ খানিকটা অংশ লতিফের জন্যে রীতিমত ভিজে আর নরম থাকায়—লতিফ চাচার গোমাংস বিক্রীর টাকা এমার মাংসের জন্যে দু'হাতে খরচ করতে পারলো। তবে লাভের মধ্যে হলো, যে জন্যে বিলেত যাওয়া, সেই বিলিতী-বিদ্যা লাভ আর হলো না, হলো এক বিদ্যাধরী লাভঃ লণ্ডনের সস্তা পল্লীর এক শপগার্ল!

তা হোক। সাদা চামড়া, বাদামী চুল, নীল চোখ, বিলিতী বুলির অনেক মান—সোসাইটি-রূপী ম্যানসনের সিঁড়ি নয়, লিফ্‌ট! করাচীর এক ঘিঞ্জি পাড়ায় লতিফের ডেরা, এমার যোগ্য জায়গা নয়! বোরখা পরা বিবিদের অদৃশ্য অবাক দৃষ্টি, নোংরা ছেলে-মেয়েদের

বোবা চাউনি, দাড়িওলা বুড়োদের নাসিকা-কুঞ্চন, পাড়ার লক্কা ছোকরাদের অকালপক্ক কটাক্ষ—সব মিশিয়ে এক অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়ারই সম্ভাবনা। লতিফ তাই ঠিক করেচে এমাকে নিয়ে উঠবে প্রথমে ভালো একটা হোটেলে। তারপর জরুকো লিয়ে নসিবমে যো লিখা হ্যায়, উ তো জরুর হোগা। আভি সোচনেমে কেয়া নাফা হ্যায়?

এমা ব্রাউন কিন্তু পাকিস্তানের দিকে পা বাড়াবার আগে পাকা কথা বলে দিয়েচে: ল্যাটিফ, ইফ আই ফাইণ্ড ইয়োর কান্ট্রি ডার্টি এণ্ড ড্যামড্, আই মাষ্ট বি রিটার্নিং ব্যাক টু ইংল্যাণ্ড। রাইট?

অর্থাৎ লতিফ-বধূর বর পছন্দ হলেও, শ্বশুরঘর পছন্দ হলে তবেই সংসার পাতবেন। নইলে বলবেন, হে ডার্লিং, বিদায়। তবে লতিফের দেশের মেয়েলী পোশাক বোধকরি মেয়েটির অপছন্দ হয়নি। তাই সিল্কের সালোয়ার পায়জামা প'রে, ওড়না মাথায় দিয়ে বিলিতী-বিবি লতিফের বাহুলগ্না হয়ে ঢুকলেন সাগর-নগরের সিনেমা হলে।

কিন্তু সবাইয়ের মন কি ছবির দিকে? হয়তো।

তবে চিত্ত মিত্রের চিত্ত যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। টেবিলের উপর মিস এনাক্ষী রাও এর পেলব হাতখানি পড়েছিলো, সি. মিটার অন্ধকারে কচ্ছপ-গতিতে তাঁর হাতখানি সেই দিকে চালনা করলেন। অচিরেই ছোঁয়া লাগলো দু'জনের। মিস রাও সরিয়ে নিলেন হাত-খানা। কিন্তু সি. মিটারের নাছোড়বান্দা হাত হতাশ হলো না, হাতড়াতে লাগলো সেই নরম হাতখানা। পাওয়াও গেলো, আবার গেলো হারিয়ে। টেবিলের উপর দুই হাতের লুকোচুরি চললো। শুরু হলো দুই সাপের খেলা।

হঠাৎ নরম হাতখানা জোরে চিমটি কাটলো শক্ত হাতখানাকে। যন্ত্রণায় ছিটকে সরে গেলো শক্ত হাতটা। পরক্ষণেই আচমকা চেপে ধরলো নরম হাতকে: এবার?

ছাড়ো। ষ্টপ ইট! নারী-কণ্ঠের ফিসফিসিনি ও শাসানির শব্দ এলো সি. মিটারের কানে।

সি· মিটার গলা খাটো করে বললেন, কেন?

নইলে চলে যাবো হল থেকে।

ও, ভুলে গেচি, আমার পাশের মহিলাটিও একটি ফরবিডন ক্যারগো।

মিটারের রসিকতায় এনাক্ষী হয়তো খুশিই হলেন। তবু বললেন, ইয়েস।

হাত গুটিয়ে নিলেন সি· মিটার।

মেয়ে-খেলিয়ে চিত্ত মিত্রের জানা আছে, কখন হাত বাড়াতে হয়, কখন ফের গোটাতে হয়। কাজেই বাকি সময়টা চুপচাপ গ্যাঁট হয়ে বসে ছবি দেখলেন।

এবার এনাক্ষী রাওয়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। মিটার রাগ করলো না তো?

সাগর-নগরের সব নাগরিকই সিনেমা হলে ঢোকেনি। অনেকেই এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, কেউবা নিজের নিজের কেবিনে।

কয়েকজন পাঞ্জাবী ব্যারসাদার বার-এ বসে ব্রীজ খেলচেন, সামনে আছে মদের বোতল গেলাস।

আরো কয়েকজন নেশা করে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে সোফায়। তাদের পরিচয়ের দরকার নেই।

লাউঞ্জে বসে ম্যাগাজিন উল্টাচ্চেন ডাঃ এস. চ্যাটার্জী, পুরো নাম শৈলজা চ্যাটার্জী। সিনেমা দেখা তাঁর ধাতে সয় না। তাছাড়া মনের দ্বন্দ্ব তাঁর এখনো কাটেনি। বুঝতে পারচেন না, এখন দেশে ফেরা ঠিক হচ্চে কি না। ইণ্ডিয়ায় পোর্ট হেলথ-অফিসারের কাজের জন্য দরখাস্ত পেশ করে এবং ইণ্টারভিউ দিয়ে ছ'মাসের মধ্যেও যখন কোন খবর পেলেন না কিছু, তখন হাল ছেড়ে রওনা দিয়েছিলেন

ইংল্যাণ্ডে এফ. আর. সি. এস. পড়তে। সেখানে পড়বার খরচ চালাবার জন্যে বহু জায়গায় দরখাস্ত করে ক্যাম্ব্রিজের এক হাসপাতালে চাকরিও পেলেন। মাস দুই চাকরি করবার পর এবং এফ. আর. সি. এস. পড়বার তোড়জোড় করবার মুখেই খবর এলো কলকাতা থেকে : ফিরে এসো শীগ্রী, পোর্ট হেলথ অফিসারের কাজ পেয়েচো। কাজেই অনেক ভেবে ঠিক করলেন, পড়া যখন টাকার জন্যেই এবং চাকরিটা যখন মোটা টাকার, তখন পড়া ছেড়ে চাকরি ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই ফিরে চললেন দেশে, কিন্তু মনের দ্বিধা কাটলো না। মাঝ-সমুদ্রে দ্বিধার ঢেউয়ে দোলা খাচ্চেন, রেহাই পাবেন দেশের মাটিতে পা দিয়ে, পকেট ভারি হলেই।

ডাঃ এস. কে. প্রামাণিকও বসে আছেন লাউঞ্জে। সৌম্য সহাস বৃদ্ধ। খর্বকায়। থাকেন পুণায়। ভারত সরকারের মেটিওরজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি। ইংল্যাণ্ডে গেছলেন ছুটিতে তাঁর ছেলেকে দেখতে, দু'মাস থেকে ফিরচেন আবার পুণায়। ভদ্রলোকের সিনেমায় কোন আসক্তি নেই, তাই এই লাউঞ্জে।

তাছাড়া লাউঞ্জে বসে রেভারেণ্ড ডি, এফ, হেওয়ার্ড, মিসেস এস, হল্যাণ্ড, মিসেস এ, ডি, প্যারেলওয়ালা, মিঃ এস ইরানী এবং আরো কয়েকজন। কেউবা গল্প করচেন, কেউবা সোফায় বসে ঢুলচেন।

'বি' ডেক-এ ৮২৩নং দু'বার্থ কেবিনের দরজাটা ভেজানো। লোয়ার বার্থে শুয়ে মাথার কাছে রিডিং লাইট জ্বালিয়ে একখানা ইংরিজী উপন্যাসে মন দিয়েচেন শ্রীমতী কিরণ্ময়ী বড়াই। আপার বার্থের মিসেস প্যারেলওয়ালা লাউঞ্জে বসে গল্প করচেন মিসেস হল্যাণ্ডের সঙ্গে। মিসেস বড়াই অত লক্ষ্য করেননি, আজ রাত্রে সিনেমা শো, তা বইতে ব্যস্ত। নইলে গিয়ে বসতেন একবার হলে। ভদ্রমহিলার জন্মস্থান ঢাকা, কর্মস্থানও ঢাকা। পাকিস্তানের ভয়ে আর পাঁচজন হিন্দুর মত হিন্দুস্থানে আশ্রয় নেননি। স্বামী

পাকিস্তানের সরকারী চাকুরে, তিনিও। শিক্ষা বিভাগের কাজ করেন। পাকিস্তান সরকারের টাকায় শিশু শিক্ষার ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে ঢাকা ফিরচেন। নামবেন করাচীতে। সেখান থেকে হাওয়ায় উড়ে যাবেন ঢাকায়। শ্যামবর্ণা, বয়েস ত্রিশের কোঠায়, কালো চুলে টকটকে সিঁদুর, কপালে টিপ, বাঁ হাতে রিষ্টওয়াচ, পরনে সাদা শাড়ি। সর্বজাতির সাগর-নগরে এক ঝলক বাংলা শোভা।

আর একটি বাংলা শোভা কালো করাল মেঘে ঢাকা। মিসেস দত্ত। 'সি' ডেক-এ ৯৩৭ নং দু'বার্থ কেবিনের আপার বার্থে চুপ করে শুয়ে আছেন। চোখ বুজে আছেন, ঘুমোননি। তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে, ভিজে যাচ্চে মাথার বালিশ। সেই যে সাদাম্পটন ডকে কেবিনে ঢুকেচেন, ব্যস্! শুধু বাথরুমে যাওয়া ছাড়া একবারও উপরে বসেননি লাউঞ্জে বা ডেক-এ। ডাইনিং হলেও খেতে যান না, স্টুয়ার্ডেস এসেই খাবার দিয়ে যায় বার্থের সঙ্গে লাগানো ট্রে-তে। খাবার আধ-খাওয়া হয়ে পড়ে থাকে। পোলিশ স্টুয়ার্ডেস অবাক হয়ে ভাঙা ইংরিজীতে জিগ্যেস করে, নো ইটিং? মিসেস দত্ত শুধু বলেন, নো। কিন্তু কারণ জিগ্যেস করা স্টুয়ার্ডেসের অধিকার নেই, তাই আর কিছু না বলে ট্রে নিয়ে চলে যায়।

কিন্তু লোয়ার বার্থের মিস ইলিয়টের কাছে ব্যাপারটা কেমন বেখাপ্পা ঠেকে। অথচ জিগ্যেস করতেও বাধে। আবার বিশ্রীও লাগে। একজন প্রায় না খেয়ে সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে আছে, ব্যাপার কি? নিজের মনেই ভাবতে থাকে, অথচ কোন কুল-কিনারা করতে পারে না। হোয়াটস্ রং উইথ হার? 'কিন্তু জিগ্যেস করতেও সাহস হয় না, শি মে বি অফেণ্ডেড!

কিন্তু সে রাত্রে মিস ইলিয়ট হঠাৎ কেবিনে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে

গেলেন, মিসেস ডাট কাঁদচেন ! কেবিনের নরম আলোয় চিক-চিক করচে মিসেস ডাটের ভিজে গালের অশ্রু-রেখা।

মিসেস দত্তও বুঝি লজ্জা পেলেন। তাই তাড়াতাড়ি পার্টিসনের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন তিনি। আঁচলের কোণ দিয়ে মুছে ফেললেন অশ্রু-চিহ্ন।

মিসেস দত্তের লজ্জায় লজ্জা পেলেন মিস ইলিয়টও। আপনা থেকেই তাঁরা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো : আ'য়্যাম সরি মিসেস ডাট্—

উপর বার্থ থেকে কোন সাড়া এলো না।

আই ডিডিণ্ট মীন্—। আই ফাউণ্ড দ্য ডো' ওপেন, অ্যান' আই—

ডোণ্ট ওরি প্লীজ।—আপার বার্থ থেকে এবার ভিজে গলায় উত্তর দিলেন মিসেস।

মিস ইলিয়ট তবু যেন অপ্রস্তুত। বললেন, আই ফেল্ট সিক ইন দ্য সিনেমা হল, সো আই—

এবার ফিরে শুলেন মিসেস দত্ত। বৃষ্টি-ভেজা পদ্ম-পাপড়ির মতই অশ্রু-ভেজা কাজল আঁখি দুটি মিস ইলিয়টের নীল-নয়নে রেখে ম্লান হেসে বললেন, ইউ হ্যাভণ্ট ডান এনি রং মিস্ ইলিয়ট।

ইলিয়ট এবার যেন আশ্বস্ত হলেন। যদিও এই সাগর-নগরে ভদ্রতার অত কড়াকড়ি নেই, গায়ে পড়ে আলাপে কোন বাধা নেই—তাছাড়া একই কেবিনে দুজনেরই বাস-ব্যবস্থা, অর্থাৎ কেশচর্চা, বেশ-বদল সব কিছুই যখন পরস্পরের চোখের সামনেই করতে হয়, তখন ভদ্রতার নিয়ম-কানুন মানাও বড় যায় না, আর না মানলে মনেও কিছু করে না কেউ। কাজেই নিজের কেবিনের দরজা ঠেলে হঠাৎ ঢুকতে বা বেরুতে দ্বিধা করবার কারণ নেই। কিন্তু মিসেস দত্ত আর মিস ইলিয়টের মধ্যে সম্পর্কটা একটু স্বতন্ত্র ! মিসেস নিস্পৃহ থাকায় মিস নিঃশব্দপ্রায়। তবে দু' চারটে ভদ্রতার বুলি বাধ্য হয়েই বলতে হয়।

দুই বার্থে ভিন-দেশী দুই মহিলা পরস্পর বাক্য-জালে না জড়িয়ে আপন মনে কল্পনার জালই বুনেচেন এই দুটো দিন। এমনতর অবস্থাটা কিন্তু অস্বাভাবিক, অসহ্য। দু' ভাই প্রাচীর গেঁথে আলাদা হলেও, প্রাচীর ডিঙোনা-কথা চালনা বন্ধ থাকে না বড়। আর এক্ষেত্রে একই কেবিনে ঘনিষ্ঠ হয়ে থেকেও অ-বাক হয়ে থাকা—একদিন নয়, দু'দিন নয়, সতেরো-আঠারোটা দিন—বাস্তবিক অবাক হবার মতই ঘটনা।

আজ সুযোগ ছাড়লেন না মিস ইলিয়ট। কথার জের টানলেন : মে আই ক্লোজ দ্য ডো' ?

ইয়েস, ইফ ইউ লাইক!—মিসেস দত্তের নিস্পৃহ উত্তর।

মিস ইলিয়ট কেবিনের দরজা বন্ধ করে চেয়ারে বসে জুতো খুললেন, পা গলিয়ে দিলেন নরম স্লীপারে। টেবিলের উপরে ইলিয়টেরই একখানা আগাথা ক্রিষ্টির গোয়েন্দা উপন্যাস পড়েছিলো, তুলে ধরলেন সেখানা : ডু'উ লাইক টু রীড দিস্ বুক ? ভেরি ইন্টারেষ্টিং!

আর একবার ম্লান হাসলেন মিসেস দত্ত : নো, থ্যাংকু।

মিস ইলিয়ট বইখানা অগত্যা টেবিলে রেখে গায়ের ব্লাউসের বোতাম খুলতে শুরু করলেন। মিসেস দত্ত ওধারে মুখ ফিরিয়ে শুলেন আবার।

ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, উ' আর ফ্রম—?—মিস ইলিয়ট জিগ্যেস করলেন।

লণ্ডন।—মিসেস দত্তের ছোট্ট উত্তর।

কোমরের ইলাস্টিক ব্যাণ্ড খুলে ইলিয়ট পায়ের তলা দিয়ে গলিয়ে বার করলেন স্কার্টটা। পরনে রইলো সাদা সিল্কের আণ্ডার ড্রেস। উপরাংশ প্রায় অনাবৃত। শ্বেত যৌবন-পদ্ম দু'টি লজ্জায় বুঝি গোলাপী হয়ে তাদের নতমুখ ঢেকে রইলো ড্রেসের সল্লাবাসে।

হ্যাড বীন্ দেয়ার ফর্ হাইয়ার ষ্টাডি ?

নো।

নাঃ, এভাবে কথা চালানো দুষ্কর। আনউইলিং হর্সকে জল খাওয়ানো দুরূহ ব্যাপার। অপর পক্ষের যখন উৎসাহ নেই, এ পক্ষের তখন নিরুৎসাহ হওয়া ছাড়া উপায় কি ? মিস ইলিয়ট পাশ্চাত্য-অভ্যাসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে আলনা থেকে টেনে নিলেন স্লিপিং স্যুট। অভ্যস্ত কৌশলে পরলেন সেটি। সিগ্রেট কেসটি খুলে ধরালেন একটি সিগ্রেট। শেষ সিগ্রেট। হোম-এর সিগ্রেট শেষ হলো। কাল অবশ্য 'বার' থেকে কেনা যাবে নিশ-সিগ্রেটের একটা বাক্স নামমাত্র দামে।

বেসিনে লাগোয়া আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে মিস ইলিয়ট শিশি থেকে বার করলেন কোল্ডক্রীম। নরম গালে ঘষতে লাগলেন ধীরে ধীরে। ঠোঁটের সিগ্রেটটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গাল ঘষতেই লাগলেন ইলিয়ট।

পরে সিগ্রেটের টুকরোটা এ্যাসট্রের মধ্যে ফেলে, বার্থের সরু বিছানায় এসে বসলেন এবং একটু পরেই নিজের বরতনু ব্লাংকেটের তলায় চালিয়ে দিয়ে বেড সুইচটা দিলেন নিভিয়ে।

কেবিন কালো হয়ে গেলো।

উইলি রজার্স এখন ডেলহীতে কি করচে ? কে জানে! হয়তো ক্লাবে বসে ড্রিংক করচে কিংবা—

ড্যাম্ ইট্। বাজে ভেবে কোন লাভ নেই। মিস ইলিয়ট চোখ বুঁজলেন।

আপার বার্থে মিসেস দত্ত কালো অন্ধকারের চোখ মেলে শুয়ে আছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ কি ঐ অন্ধকারের মতই কালো ?

সকলের সব চিন্তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সাগর-নগর হেলে দুলে

এগিয়ে চলেচে কালো হাওয়া আর কালো জলের ঠাণ্ডা ঢেউয়ের বাধা ঠেলে। সার্চ লাইটের তীব্র আলোর দৃষ্টি তার বহু বহু বহুৎ দূরে!

আহা, এমনিতর বাড়তি দৃষ্টি থাকতো যদি মানুষের!

বোট ডেক। সামনের দিকটায় অফিসারদের কোয়ার্টার। সুপ্রশস্ত কেবিন। সুসজ্জিত। মেঝেয় মোটা কার্পেট! একটু আগেই ডাইনিং রুমে ডিনার শেষ হয়ে গেচে। অফিসার-লাউঞ্জে বসে গল্প জমিয়েচেন অফিসাররা। দেশের গল্প, পোলিশ রাজনীতির আলোচনা, জাহাজ কোম্পানীর কথা, কোম্পানীর মালিকদের আচরণের কাহিনী। এবার পোলাণ্ডে গিয়ে কে কোন অপেরা বা থিয়েটার দেখে এসেচেন, তার আলোচনাও বাদ যাবার কথা নয়।

শিপ-মাষ্টার মিরশল গ্লাওয়াকি সান-ডেক-এ ন্যাভিগেসন ব্রীজে একটা রাউণ্ড দিয়ে, র‍্যাডার রুম, চার্ট রুম ঘুরে এসে বসেচেন লাউঞ্জে। যোগ দিয়েচেন অফিসারদের গল্পে। চমৎকার অমায়িক ভদ্রলোক। বয়েস পঞ্চাশের কাছে। দোহারা চেহারা, মুখে হাসি। কাঁধের ব্যাজ আর হাতের স্ট্রাইপ থেকেই যেটুকু বোঝা যায় ভদ্রলোক এই পুরো জাহাজখানার হর্তাকর্তা. নইলে ক্যাপটেন গ্লাওয়াকির কথায়-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে বোঝা কঠিন, কী অসীম ক্ষমতায় আসীন এই মিষ্টি হাসির শিষ্ট ভদ্রলোকটি!

এই সাগর-নগর জলে-ভাসা এক টুকরো পোলিস-নগর। পোলিস আইন-কানুন চালু এই চলমান নগরটিতে। পোলিস রাজ্যের মান-সম্ভ্রম পতাকার রূপ ধরে পত্‌পত্‌ করে উড়চে সুউচ্চ মাস্তুলের মাথায়। তবে ভিন দেশের বন্দরে এসে নোঙর ফেলে যখন, তখন আর এক মাস্তুলে উড়িয়ে দেওয়া হয় সেই দেশেরই পতাকা। ভদ্রতা।

এই সাগর-নগরে কেউ অন্যায় করলে, পোলিস আইনেই তার বিচার হয়। দরকার হলে বন্দী করে রাখবার ক্ষমতাও আছে এই

মাঝারি গড়নের মিষ্টি মানুষটির। আর যদি কোন অশুভক্ষণে এই সাগর-নগর সাগরের তলায় তলিয়ে যাবার মত দুর্ঘটনায় পড়ে, তখন সেই চরমক্ষণে এই মানুষটিকেই ধীর-স্থির হয়ে ব্যবস্থা করতে হবে তাঁর নগরের নাগরিকদের বাঁচাবার। তাঁর হুকুমে রেডিওগ্রামে ছড়িয়ে পড়বে দিকে-দিকে দুর্ঘটনার বার্তা, তাঁর হুকুমে জলে নামবে বোটগুলো, তাঁর হুকুমে নগরের মেয়েরা শিশুরাই আগে উঠবে বোটে, তাঁর হুকুমে পুরুষরা পাবে লাইফ-বেল্ট, হয়তো বা অন্যান্য ক্রু-রাও। তারপর পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সাগর নগরের সবার যদি প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হয়—তবেই ঐ পরম ক্ষমতাবান অথচ পরম অসহায় মানুষটি পারবেন তার ভরাডুবি 'নগর' ছাড়তে। তার আগে নয়।

শিপ-মাষ্টার গ্লাওয়াকি একদিনেই এই চরম পদে উন্নীত হননি। ধাপে ধাপে উঠতে হয়েচে তাঁকে। গত পঁচিশ বছরের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বহু অপেক্ষা-উপেক্ষার পর তিনি পেয়েচেন এই ক্ষমতা। তাই পোলাণ্ডের সামান্য এক গ্রাম্য চাষীর ছেলে আজ বিরাট এক জল-চলমান নগর নিয়ে পৃথিবীর সপ্ত-সমুদ্র চষে বেড়াচ্চেন। গর্বের কথা, অথচ অহংকারের কোন কথাই লেখা নেই এই শান্ত সুন্দর মানুষটির মুখে-চোখে।

তাই জাহাজের নাবিক গোষ্ঠীর প্রিয় তিনি এবং সাগর-নগর প্রতিটি সাগর-নাগরিকের শ্রদ্ধার পাত্র তিনি।

সুরার পাত্র সামনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গল্প করচেন শিপ-মাষ্টার মিঃ গ্লাওয়াকি। কাছেই বসে আছেন ষ্টাফ ক্যাপটেন জস্‌লো ওস্‌সজেওস্কি—সাগর নগরের কর্মচারীদের মুরুব্বি। তাঁরা পাশে বসে চীফ অফিসার. জর্জ পেজেনী—ম্যানেজার। একটু দূরে বসে চীফ ইঞ্জিনিয়ার জন গ্র্যাটকোস্কি—ইঞ্জিন ঘরের দায়িত্ব এঁরই উপর। চীফ পার্সার এণ্ডরু মিরস্‌লো পাশেই বসে আছেন—সাগর নগরের কোষাধ্যক্ষ। একটি বড় সোফায় গা-মেলে বসেচেন সার্জেন

ডাঃ ফেলিকান মাইকোলস্কি—সারা সাগর-নগরের স্বাস্থ্যরক্ষক। চীফ-ষ্টুয়ার্ড চার্লস জিয়লস-ও রয়েচেন এই বৈঠকে।

সাগর-নগরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এঁরা। কাঁধে এঁদের গুরুভার। কাঁধের ফিতে, বুকের রিবন, হাতের স্ট্রাইপ সাক্ষ্য দেয় এঁদের গুরুদায়িত্বের। কিন্তু সবার কৈফেয়ৎ দাবি করবার অধিকার নিয়েও সবার সঙ্গে হাসি-গল্পে যোগ দিয়েচেন সর্বাধিকারী মিঃ গ্লাওয়াকি—ডেক আর ইঞ্জিনঘরের প্রায় দেড়শো ক্রু-র ভাগ্যবিধাতা, সাগর-নগরের হাজারখানেক নাগরিকের ভরসাস্থল।

নাবিক গোষ্ঠীদের মধ্যে কাজের পালা যাদের সাঙ্গ হয়েচে, তারা এক সঙ্গে খেতে বসেচে কিচেনে ডাইনিং টেবিলে। একটানা লম্বা টেবিল, তার দুধারে বেঞ্চ পাতা। পাশাপাশি বসে গেচে সবাই। বসেচে ইঞ্জিন-ঘরের সবাই, অন্য দল তাদের ভার নিয়েচে। বসেচে ষ্টুয়ার্ড, ষ্টুয়ার্ডেসরা। বাকি অল্প কয়েকজন, নাগরিকদের হুকুমের অপেক্ষায় আছে। বসেচে র‍্যাডার রুমের, চার্ট রুমের, ওয়েরলেস রুমের, ন্যাভিগেসন ব্রীজের কর্মচারীরা। রাত্রের ডিউটি যাদের, তারাই এখন কর্মব্যস্ত।

সর্বজাতীয় সাগর-নগরের এই অংশটুকু খাঁটি পোলিস পাড়া। এ পাড়ার গলিতে কাঠের দেওয়ালে পোলিস খবরের কাগজ সাঁটা, নানা রকমের পোলিস ছবি আঁটা, সাগর-নগরের বিজ্ঞপ্তি লটকানো। এ পাড়ার কথা বোঝা দায়, লেখা পড়া দুষ্কর। টকটকে লাল চেহারার লোকগুলি আর টুকটুকে গোলাপী রংয়ের মেয়েগুলি অবসর সময়ে নিজেদের নিয়েই মশগুল, নিজেদের হাসি-কান্নার বেড়া দিয়েই ঘেরা।

সাগর-নগরের নাগরিকদের সঙ্গে এদের প্রাণের যোগ নেই, আছে কর্তব্যের যোগ। প্রতিবারে যাত্রা-বদলে যাত্রী বদল; কাজেই আলাপের মাত্রা থাকে সীমাবদ্ধ। উপরন্তু অন্তরায়—ভাষা। মাটির

রাজ্যে মাটির লোকেরা বদলায় না, বদলায় সিংহাসনের রাজা, বদলায় তাঁর অনুচরেরা। সাগর-নগরের নিয়ম কিন্তু উল্টো! এ নগরের নাগরিকরা বদলায়, নগরের হর্তাকর্তা শিপ-মাষ্টার বদলায় না, বদলায় না তাঁর অনুচররা।

গভীর রাত্রে সাগর-নগরের ঘরে ঘরে নিভলো বাতি। শুধু রাত-জাগা যারা, তাদের ঘরেই জ্বলচে আলো। আর জ্বলচে আলো সাগর-নগরের অলিতে-গলিতে, সিঁড়িতে, বার-এ, ডেকএ, লাউঞ্জে— যেখানে না হলে নয়। সারারাত্রি ধরে সাদা রংয়ের 'বাতরি' জাহাজখানা ভেসে চলে হেলেদুলে কালো জলে। একটানা শব্দ হয় ঝপ্‌ঝপ্‌ঝপ্‌ঝপ্‌। যেন হীরে মুক্তোর গহনা পরে খিড়কির বড় পুকুরে সাঁঝের বেলায় সাঁতার কাটচে জমিদারের রূপসী মেয়ে! তার খোঁপায় রূপোর ফুল আর 'বাতরি'র সার্চ লাইটে কোনই তফাৎ নেই।

গা ধুয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে খিড়কির দরজা পার হয়ে যায় মেয়ে। দরদালানে ঢুকতে গিয়েই হঠাৎ দেখে—ও মা, ছিঃ, উনি যেন কখন এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন!—তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড় টেনেটুনে ঠিক করে নেয়, মাথায় টানে কাপড়। ঢাকা পড়ে পাটি-খোপার রূপোর ফুল। লজ্জা-রাঙা মেয়ে হঠাৎ সরে পড়ে সুড়ুৎ করে পাশের ঘরে। মুচকে হাসে নতুন জামাই।

মুচকে হাসে সুর্যি ঠাকুর সার্চ লাইটের লজ্জা দেখে। নীল সাগরের শেষ সীমানায় আলোর খেলা দেখতে পেয়েই চক্ষু মোদে কলের আলো। কলের আলো প্রণাম জানায় কালের আলোর পায়ে। হয়তো বলে মনে মনে: তোমার এবার পালা শুরু, আমার বিদায় বেলা গো।

দিনের কাজের শুরু তখন।

প্রতি কেবিনেই 'নক' করে যায় ষ্টুয়ার্ড এবং ষ্টুয়ার্ডেস। হাতে তাদের চায়ের ট্রে। বেড-টি-এর পর্ব তখন। যেসব কেবিন খোলা পায় না—বাধ্য হয়েই ফিরে যায়। যেসব কেবিন খোলা থাকে, ঢুকে এসে চা দিয়ে যায় বার্থে সাঁটা ট্রে-র উপরে। ঘাড় উঁচিয়ে খেলেই হলো!

এই চা-পানটুকুই হওয়া দায়। ঘুম ভেঙে ঘাড় উঁচু করার আলিস্যি কি সহজে যায়! ষ্টুয়ার্ডের আসা যাওয়ার শব্দ আসে কানে, তবু চা-পানের ছাই, তাগিদ থাকে না। তখন গায়ের কম্বল জড়িয়ে আবার পাশ ফিরে শোয় অনেকেই।

থাক না শুয়ে। না খায়, না খাক! ঘণ্টা খানেক পরেই আবার শুরু হয় কাপ সরানো। কেবিনে আসে ষ্টুয়ার্ডরা। দেখে, কাপ ভরা চা তেমনি আছে, জুড়িয়ে ঠাণ্ডা জল হয়েচে। তাই বেসিনে সে চা ঢেলে ফেলে নিয়ে যায় ফের চায়ের বাটি। মনে মনে হয়তো হাসে, যাবার মুখে হয়তো কাশে, তবু হায় ঘুম ভাঙে না সাহেবদের!

দিনের প্রথম চায়ের পর্ব এমনিতরই ব্যর্থ যায়। কিন্তু অর্থ যাদের পরমার্থ, ব্যর্থ তারা করবে কেন ন্যায্য পাওয়া চায়ের পর্ব? আর বেড-টি-এতে অভ্যাসীরা সত্যিই যেন চাঁদ হাতে পায়। কাজেই চায়ের কাপ বার্থে এলেই, ঘুমের ঘোর ঠেলে ফেলেই ঘাড় উঁচিয়ে চোঁ-চোঁ করে চুমুক মারে চায়ের কাপে। চায়ের লেভেল শেষ ধাপেতে নামিয়ে এনেই ধপাস করে ঘাড়টা আবার নামিয়ে রাখে বালিশের 'পর। কম্বলটা জড়িয়ে আবার জোরসে চলে নাকডাকা। ঘুম যখন ভাঙে ফের, ব্রেকফাষ্টের সময় তখন।

নিউইয়র্কের সালিম হকের বেলা বারোটা তক গভীর রাত। কাজেই বেড-টি খাওয়া কোনদিনই হয় না তাঁর। মস্কোর রামস্বামী

চায়ের কাপের শব্দ শুনে চোখের পাতা খোলেন বটে, কিন্তু চায়ের পাতার জলীয়-রস পানের জন্যে তাঁর পক্ষে চোখের ভারি পাতা দুটো খুলে রাখা সত্যিই বড় কষ্টকর। তাই প্রথম দিনের ভোরে নেহাৎ সখ করেই দিয়েছিলেন চায়ের কাপে চুমুক, এবং এর পর প্রতিদিনই ভরা-কাপ ভরাই থাকতে লাগলো।

ঐ কেবিনেই কে-জি—ভদ্রলোক যেমন ভারি, তেমনি ভারি ঘুমটা তাঁর—কাজেই চায়ের গরম গন্ধ তাঁর নরম নাকের মধ্যে ঢুকেও পরম আরাম-ঘুমের কোন ব্যাঘাতই ঘটাতে পারে না।

আর মহাবিষ্ণু সেন? তিনি ডাক্তার। ইয়ার-নোজ-থ্রোটের ডাক্তার; তবু পেটের ব্যারামে মহাসাবধানী। তাঁর মতে খালি পেটে চা খাওয়া আর বিষ খাওয়া একই কথা। কাজেই চা তাঁর মুখের কাছে প্রতি প্রত্যুষে এসেও বিমুখ হয়ে ফিরে যায়।

তবু ষ্টুয়ার্ড প্রতিদিন ভোর না হতেই চায়ের কাপ এগিয়ে রাখে মুখের সামনে। ঘুরে এসে ভরা কাপ বেসিনে ঢেলে খালি কাপ সব নিয়ে যায়। কর্তব্য! এখানে চা-চিনির হিসেব নেই। কাজেই, মুখ ঝামটার কারণ নেই। আমার প্রাপ্য নাই বা খেলাম! ঢেলে দিলাম, ফেলে দিলাম—তা বলে কি জবাবদিহি দিতে হবে? এ নগরে নগন্য নয় কেউই, গণ্যমান্য সবাই। ষ্টুয়ার্ডদের এ ইঙ্গিত দেওয়া আছে, তাই ভুলেও মন্তব্য করে না কেউ, শুধু কর্তব্যই করে।

মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন কিন্তু বেড-টি-এ অভ্যস্ত। কাজেই দরজায় 'নক' করলেই হ্যারি গ্র্যাটন দরজা খোলেন, চায়ের কাপ নিজেই নেন, টেবিলে রেখে ডেকে দেন জেন গ্র্যাটনকে: ডার্লিং, টি! ডার্লিংটি হাই তুলে আলিস্যি ভেঙে ওঠেন এবং বহুদিনের অভ্যাসমত পরস্পরকে চুমু খেয়ে তবেই তাঁরা চুমুক দেন চায়ের কাপে।

রেজার কোন নেশা নেই। কাজেই প্রথম দিনেই ষ্টুয়ার্ডকে বলে দিয়েচে, নো টি প্লীজ!

তবে মিঃ এস আলি আর তার বিলিতী মেম এবং দোআঁশলা ছেলে-মেয়েরা, কেউ প্রাপ্য ছাড়ে না তাদের। বিশেষ করে আলি-গিন্নীর মত হচ্ছে ঃ লর্ড যা দিচ্চেন, দু'হাত দিয়ে গ্রহণ করাই উচিত। তবে আসল কথা, একটু পরেই ছেলে-মেয়েরা ডেভল্-লাইক শুরু করবে চীৎকার। কাজেই পেটে কিছু পড়লে তবেই জের টানা যায় ব্রেকফাষ্ট তক।

ষ্টুয়ার্ডের আনা চা মিসেস প্যারেলওয়ালা ও বড়াই-গিন্নী দু'জনেই নির্বিবাদেই শেষ করেন! মেয়েরা বড় হিসেবী। সংসারে কোন জিনিসই ফেলা নষ্ট করা পছন্দ করেন না মোটেই। তাই, তাঁদের কাছে চা নষ্ট করার চাইতে ঘুম নষ্ট করাই শ্রেয়!

তবে মিঃ লতিফের কাছে বেড-টিটা উপলক্ষ্য মাত্র। গত রাত্রে একটা পর্যন্ত সে লোয়ার বার্থে শপগার্ল-প্রিয়া এমা ব্রাউনের কাছেই ছিল। সরু বার্থটা দু'জনের পক্ষে প্রশস্ত নয় একটুও। তবুও। এমাকে ঘুমুতে দেয়নি, জ্বালাতন করে খেয়েচে। শেষে, এমা যখন পা দিয়ে ঠেলে লতিফের দেহের অর্ধেকটা ঝুলিয়ে দিলো বার্থ থেকে, বেশ জোর গলায় বললো এমা, নো-মোর—তখন বাধ্য হয়েই তাকে মই বেয়ে উঠতে হলো নিজের আপার বার্থে। ভোরে দরজায় নকিং হতেই প্রায় লাফিয়ে নামলো লতিফ। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে চায়ের কাপ দু'টো নিয়ে দরজা দিলো বন্ধ করে। এমার ঘুম ভাঙাবার সুযোগ পেয়ে খুশিই হলো লতিফ। নিজের কাপটা শেষ করে আর একটা কাপ ধরলো এমার মুখে। খেটে-খাওয়া এমার কিন্তু ভালোই লাগলো এমনতর হাত-তোলানি খাওয়া। খুশিই হলো সে। অমনি খুশি করার সুযোগ নিতে ছাড়লো না ঐ রূপের পাগল লতিফ। ফট্ করে কম্বলটা তুলেই চট্ করে ঢুকে পড়লো আবার এমার বার্থে। গ্যাও ল্যাটিফ, ডোণ্ট বি সিলি! প্লীজ গেট আউট!—এমা আপত্তি করে। কিন্তু নাছোড়বান্দা লতিফ ততক্ষণে

এমা ব্রাউনের নরম বুকে মাথা ঘষতে থাকে। লতিফের কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে এমা ঃ ও, ইউ নটি।

পার্শারের অফিসের সামনে নোটিশ বোর্ডে নতুন বিজ্ঞপ্তি দেখা গেলো ঃ ব্রেকফাষ্টের পর প্রমেনেড ডেক-এ প্যারেড হবে, সকলেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়। অর্থাৎ সাগর-নগর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অতল সাগরে ডুবে যায়,—তবে নাগরিকরা যাতে রক্ষা পায় তারই ব্যবস্থা। সেজন্যে কী ভাবে লাইফ বেল্ট পরতে হবে এবং লাইফ বোট জলে নামালে প্রাণের ভয়ে ঠেলাঠেলি বা ধাক্কাধাক্কি না করে কীভাবে ধীর-স্থিরভাবে সেই বোটে উঠতে হবে—শুধু তাই নয়, আগে মেয়েরা, তারপর ছোটরা এবং সবার শেষে যদি জায়গা থাকে তো পুরুষরা উঠবে—তারই নির্দেশ এবং হাতে-কলমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা!

হাতে কারোর কাজ নেই। তাছাড়া আত্মরক্ষার মত কাজ অতি বড় অকেজোর কাছেও বিশেষ দরকারি এবং বিজ্ঞপ্তিতে যেন বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যাবে বলেই মনে হচ্ছে—অতএব বেশির ভাগ যাত্রীই উপস্থিত হলো প্রমেনেড ডেক-এ। ছেলে-বুড়ো সবাই প্রায় লাইন করে দাঁড়ালো। লাইফ বেল্ট বা ফ্লোটিং বেল্ট দেওয়া হলো সবাইকে। চিফ অফিসার জর্জ পেজেনী নিজে একটি বেল্ট বুকে এঁটে দেখালেন তার পরিধান পদ্ধতি। যারা ভুল করলো পরতে কিংবা কাঁধের বেল্ট কোমরে এঁটে বসলো, তাদের সাহায্য করলেন অফিসার! তাছাড়া, জাহাজ ডুবি হলে যাত্রীদের কর্তব্যের বিষয়েও ভাঙা-ভাঙা আধো-আধো ইংরিজীতে একটি সারগর্ভ ছোট্ট বক্তৃতাও দিয়ে দিলেন তিনি। তারপর জাহাজের ক্রুরা বোটগুলি খুলে দড়ি ঢিলে দিয়ে সেগুলিকে খানিকপথ নীচেয় নামিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিলো। বোটগুলি ঠিক আছে কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখলো তারা। দেখাই দরকার। জাহাজের ছিদ্র দেখে ভয় পেয়ে সছিদ্র বোটে উঠে প্রাণ

হারানোর কোন মানে হয় না। সত্যি, সাগর-নগরের এইসব নাগরিকদের নিজেদের কতই না ছিদ্র, তবু পরের ছিদ্র নিয়ে কতই না আলোচনা —কিন্তু সাগরের এই তরণীতে একটুখানি ছিদ্রেও কত মারাত্মক। রাষ্ট্র-তরণীতে বহু ছিদ্র থাকা সত্ত্বেও চালু রাখা হয়তো সম্ভবপর, কিন্তু এই সাগর-তরণী সামান্য ছিদ্রেই ভরাডুবি।

সাধু-সজ্জনের মতই নিখুঁত 'বাতরি' বুক ফুলিয়ে সব বাধা কাটিয়ে এগিয়ে চললো, তাই রক্ষে! তাই আত্মরক্ষার শেষ ব্যবস্থার জন্যে কাউকেই মাথা ঘামাতে হলো না। বরং 'বাতরি'র সচ্চরিত্রের উপর বিশ্বাস রেখে, নির্বিঘ্নে পাড়ি দেবার সব ভার তার মাথায় চাপিয়ে যাত্রীরা লাইফ-বেল্ট খুলে রেখে হাল্কা মনে, হাসি মুখে নেমে এলো ডেক থেকে। তাই তো সৎসঙ্গ এত কাম্য!

সানিয়াল আর কে-জি আত্মরক্ষার রিহার্শাল দিয়ে এক সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। দু' জনেরই ভরা সংসার, কাজেই ভরাডুবি হবার কথা ভাবতেও পারেন না। তাই গেছলেন প্রমেনেড ডেক-এর প্যারেডে।

ঝড়ো হাওয়া। কে-জি পাইপ ধরাবার চেষ্টায় পাঁচ সাতটা দেশলাই কাঠি নষ্ট করে শেষে বিরক্ত হয়ে সিঁড়ির আড়ালে গিয়ে পাইপ ধরাতে গিয়ে দেখেন সি. মিটার একলা একমনে সমুদ্রের দিকে চেয়ে সিগ্রেট টানচেন।

হ্যাল্লো!

হ্যাল্লো!

আপনি এখেনে? প্যারেডে যাননি?

নির্বিকার চিত্তে চিত্ত মিত্র উত্তর দিলেন, যাওয়া দরকার মনে করিনি।

সানিয়াল টিপ্পনী কাটলেন, ওঁর তো আর সংসার নেই, কাজেই বাঁচা-মরার ভাবনাও নেই।

কে-জি বললেন, আসলে মিটার আমাদের নেভির লোক, কাজেই এসব ব্যাপারে পাশ করা, পোক্ত!—পাইপটা এবার একটা কাঠিতেই ধরাতে পেরে খুশি হয়ে বললেন, তা এখেনে একলা?

মিটার বললেন, ঢেউ দেখচি। ভাবচি, প্রেম-সাগরের ঢেউয়ের কাছে এই নীল-সাগরের ঢেউ কিচ্ছু নয়, তুচ্ছ। গোঁফের ডগা দুটো চুমড়ে নিয়ে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে যেন নিজের মনেই বললেন, কত প্রেম সাগরেই না সাঁতার কাটলাম! ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়েচি বটে, তবে কোথাও নাকানি-চোবানি খাইনি। কাজেই সাগরের এই ঢেউকে আমার ভয় নেই।

সানিয়াল বললেন, খুব ভরসা তো?

ভরসা আমার, ঐ এনাক্ষী রাও! এ জাহাজে উনিই আমার লাইফ বেল্ট! দরকার হলে, ওকে বুকে বেঁধেই জলে ঝাঁপ দেবো।

কে জি হাসলেন : বাস্তবে না হোক, কাব্যের দিক দিয়ে অপূর্ব।

সানিয়াল জিগ্যেস করলেন, তা 'রাই'টি কোথায়?

আপনারা কোথায় ছিলেন বললেন?—মিটার পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

প্রমেনেড ডেক-এ প্যারেডে।—সানিয়াল বললেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডোববার ভয়ে বুকে লাইফ-বেল্ট বাঁধবার মহড়া দিচ্ছিলেন—এই তো?—মিটার গোঁফের ফাঁকে হাসলেন : আমিও প্রেম সাগরে ডোববার ভয়ে আমার লাইফ-বেল্টটিকে বুকে বাঁধবার তোড়জোড় করছিলাম। এই তো ছিলেন এতক্ষণ, হয়তো একটু ঘুরে আসতে গেলেন।

তা ছেড়ে দিলেন যে!—কে-জি বললেন।

সিগ্রেটের শেষ টান টেনে মিটার বললেন, জোড় বাঁধতে গেলে জোর করতে নেই। আপনারা এসব বুঝবেন না।

কেন?

আপনারা পুরুত ডেকে জোড় বেঁধে প্রেমের জোয়ারে গা ভাসান ; আর আমার এক্ষেত্রে জোরসে প্রেম করে তবেই জোড় বাঁধা। পদ্ধতি দু'টির পার্থক্য আছে।

সানিয়াল বললেন, আপনি তো কাল রাইকে একলা ফেলে রেখে দিব্যি বার-এ এসে আমাদের সঙ্গে গল্প জমালেন। রাই বোধহয় রাগই করেছিলেন। অথচ রাত্রে দেখলাম একসঙ্গে সিনেমা হলে ঢুকলেন! আবার এখন শুনচি, তাকে লাইফ বেল্ট করে বুকে বাঁধবার তোড়জোড় করছিলেন! ব্যাপার কি? রাইয়ের রাগ হঠাৎ বিরাগের পথে না গিয়ে অনুরাগের দিকে ঢলে পড়লো যে?

জেনে রাখুন, ছু-মন্তরে নয়, সু-মন্তরে। বলিনি, 'ভালো-ভালো' বলা-মন্তরের কথা। শুনুন তবে, একটা গল্প বলি—

বলুন।

কাছেই ডেক-রেলিংএ তিনজনে ঘন হয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। পিঠে মিঠে রোদ্দুর এসে পড়লো!

সি. মিটার সানিয়ালের কাছ থেকে একটা সিগ্রেট চেয়ে নিয়ে ধরালেন। কে-জি আরো খানিকটা টোবাকো ভরলেন পাইপে। আজকেই জাহাজে সস্তায় কেনা ভালো টোবাকো। যখন তখন পাইপ টানায় আর বিবেকের মানা নেই।

সি. মিটার শুরু করলেন : জানেন, মেয়েদের রূপসী বলা হয় কেন? রূপ-উপোসী, তাই! রূপের প্রশংসা কানে গেলেই, ব্যস্। শুনুন, জাতকের গল্প বলি একটা : অশাত-মন্ত্র জাতকের গল্প—

বারানসীতে এক ব্রাহ্মণ দম্পতির একটি ছেলে ছিল। বাপ মায়ের ইচ্ছে ছেলেটি অগ্নিদেবের পূজা করে সাধু সন্ন্যাসীর ব্রত নিক ; কিন্তু ছেলেটির ইচ্ছে সংসার-ব্রত পালন করা। ছেলের যখন ইচ্ছে, তখন বাধ্য হয়েই তাকে তক্ষশিলায় আচার্যদেব অর্থাৎ পূর্ব জন্মের বোধিসত্ত্বের কাছে পাঠানো হলো উপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্যে। বেশ

কয়েক বছর পর যুবক সর্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে আচার্যদেবের আশ্রম থেকে ফিরে এসে প্রণাম করলো বাপ-মায়ের শ্রীচরণে। মা শুধোলেন, হ্যাঁ বাবা, আচার্যদেবের কাছ থেকে সব শাস্ত্র শিখেচো তো ?

হ্যাঁ মা, শিখেচি।

আচার্যদেব তোমাকে অশাত মন্ত্র শিখিয়েচেন তো ?

অশাত মন্ত্র ?—যুবক বললো, না তো।

তবে তো বাবা তোমার সংসার-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। তুমি যাও, আচার্যদেবকে আমার নাম করে বলো, তিনি যেন —

আচ্ছা মা, তাই হবে।

যুবক ফিরে গেলো আচার্যদেবের আশ্রমে। গিয়ে শুনলো, আচার্যদেব কিছুক্ষণ আগে তাঁর একশ বিশ বছরের বৃদ্ধা মাকে নিয়ে বনের দিকে রওনা হয়েচেন। কারণ, অথর্ব বৃদ্ধা মাকে নিজে হাতে সেবা যত্ন করে অযথা শ্রম আর সময় নষ্ট করায় প্রতিবেশীদের অনেকেই আচার্যদেবকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন; তাই তিনি ঠিক করেচেন বনে কুটির তৈরি করে সেখানেই মাকে আমরণ সেবা করবেন একমনে।

ছেলেটি খবর পেয়ে ছুটলো সেই বনে। সেখানে আচার্যদেবের দেখা পেয়ে খুলে বললো সব কথা।

আচার্যদেব প্রথমে আশ্চর্য হলেন: অশাত মন্ত্র? মনে মনে ভাবলেন, অশাত মানে তো, অমঙ্গল। একটু ভাবতেই জ্ঞানী বৃদ্ধ বুঝতে পারলেন যুবকের মায়ের ইঙ্গিত! তখনি বললেন, হ্যাঁ বৎস! হাতে-কলমে এই শিক্ষাটি দেবার কথা আমার মনেই হয়নি। যাক্ ভালোই হলো। আজ থেকে তুমি আমার এই অতি বৃদ্ধা মাকে নিজহাতে সেবা-যত্ন করবে এবং মুখে বলতে থাকবে—দেবি, জরাগ্রস্থ হয়েও আপনার কী অপরূপ দেহ কান্তি! যৌবনে না জানি কী অসামান্যা রূপসী ছিলেন আপনি!

শুনে যুবক তো অবাক ঃ বলেন কি আপনি ?

হ্যাঁ বৎস!—আচার্যদেব বললেন, আমি কাছেই অন্য একটি কুটিরে থাকবো এবং তুমি প্রতিদিনের ঘটনা আমাকে জানাবে।

অতএব যুবক হাতে সেবা এবং মুখে লোলচর্মাবৃতা বৃদ্ধার রূপ কীর্তন শুরু করলো এবং প্রতিদিন আচার্যদেবকে সব ঘটনার কথা বলতে লাগলো। আচার্যদেবও তাকে সেইমত নির্দেশ দিতে লাগলেন।

অল্প কিছুদিন পরেই একদিন বৃদ্ধা বললেন, হে প্রিয়দশা যুবক, তুমি যে রোজই আমার রূপের প্রশংসা করো—তুমি সত্যিই কি আমাকে ভালোবাসো ? আমার প্রেমে পড়েচো ?

যুবক গুরুর পূর্বনির্দেশমত বললো, হ্যাঁ দেবি! তবে আচার্যদেবকে আমার বড় ভয়।

বৃদ্ধা বললেন, বেশ তো, তাকে তোমার পথ থেকে সরাও।

যুবক জিগ্যেস করলেন, কি করে ?

বৃদ্ধা বললেন, কেন, হত্যা করো তাকে।

হত্যা! ও কাজ আমার দ্বারা সম্ভবপর নয় দেবি।

বেশ। আমাদের প্রেমের মান রাখবার জন্যে এই সামান্য কাজটুকু আমিই না হয় করবো। সে যখন রাত্রে ঘুমোবে, তুমি আমার হাত ধরে সেখানে নিয়ে যেয়ো, আর আমার হাতে একটি ধারালো কুঠার দিয়ো তুলে।

যুবক নির্দেশমত আচার্যদেবক্রে খবরটা দিলে তিনি তাঁর মায়ের আয়ুষ্কাল গণনা করে বললেন, আগামী পরশু দেখচি মায়ের মৃত্যুদিন। তুমি ঐদিন রাত্রে তাঁকে আমার এই ঘরে আমার বিছানার কাছে এনে তাঁর হাতে কুঠার তুলে দিয়ো। তোমার কোন ভয় নেই।

যথা আজ্ঞা প্রভু!—যুবক বিদায় নিলো।

ছ'দিন পরে সেই ভীষণ রাত্রে বৃদ্ধা-প্রেমিকা যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে কোন রকমে ঘরের মধ্যে এসে পুত্রের বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে নিলেন কুঠার। ঘোলাটে চোখে দেখলেন, পুত্র চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্চে। প্রেম-পাগলিনী কুঠার হানলেন, শব্দ হলো ঠকাং। পুত্র নয়, একখণ্ড কাঠ চাদরে ঢাকা! বৃদ্ধা বুঝলেন চক্রান্ত। লজ্জায় আত্মহত্যা করে মরে বাঁচলেন তিনি!

সানিয়াল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলেন, বললেন, তারপর?

আচার্যদেব বললেন, তোমার শিক্ষা সমাপ্ত বৎস।

যুবক, গুরুর পদধুলি নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। মাকে বললো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বিষময় সংসারের বাসনা আর আমার নেই। নারী জাতির উপর আস্থা হারিয়েচি আমি।

কে-জির মুখে চোখে ততক্ষণে ফুটে উঠেচে অস্থিরতার ভাব। তাঁর কপাল কুঞ্চিত, নাক বিস্ফারিত, পাইপে ঘনঘন টান দিচ্চেন। মিটারের গল্প থামতেই বললেন, অসম্ভব! স্রেফ গাঁজা গল্প। জাতকের এ গল্প যা-তা। মরবিড!

মিটার হাসলেন: আপনি হয়তো পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামী হিসাবে প্রটেষ্ট করচেন। কিন্তু নারী, রূপের প্রশংসায় পাগল হয়ে কতদূর নেমে যেতে পারে, এ গল্পটি তারই একটি উদাহরণ। তা বলে জাতকের গল্প যা-তা নয়। আচ্ছা মিঃ ঘোষ, আপনাকে জাতকেরই আর একটা গল্প বলি, ঐ নারী চরিত্রেরই। গল্পটি আপনার ক্ষত হৃদয়ে মলমের কাজ করবে।

বলুন, বলুন।—সানিয়াল বললেন, আমিও বড় মর্মাহত।

শুনুন তবে—শুরু করছিলেন মিটার।

থাক, থাক। পরে।—কে-জি বললেন, ঐ আসচেন, সরে পড়ি! সানিয়াল, ফলো মি।

দেখা গেলো, করিডর দিয়ে এগিয়ে আসচেন ক্রীম রংয়ের শাড়ি-

পরা রূপ-উপোসী রূপবতী মিস এনাক্ষী রাও।

কে-জি আর সানিয়াল সরে পড়লেন।

এ-ডেক-এ ভীড় জমেচে।

ব্রেকফাষ্টের পালা শেষ। পেট সবারই ভর্তি। কাজেই খেলা বা পড়ার পাট নিয়ে সবাই ব্যস্ত।

লাউঞ্জে তাই বই-পত্রিকা খুলে বসেচেন প্রৌঢ়ের দল। তরুণ-তরুণীরা গল্পে মশগুল। তাসাড়েরা 'বার'-এ মদের গ্লাস সামনে রেখে ইতিমধ্যেই তাস পিটতে শুরু করেচে। সারা দিনরাত তাস পিটেও তাদের আশ মিটচে না যেন।

তরুণতর যারা, তাদের হট্টগোল ডেক-এ। শীতের মিঠে রোদে শুরু করেচে খেলা। আর সী-গালগুলো নীল আকাশে ডানা মেলে জাহাজখানার সঙ্গে শুরু করেচে ফ্ল্যাটরেস। সাগর-নগরে ব্রেকফাষ্ট সারা হওয়া মানে ওদের ব্রেকফাষ্টের শুরু। পাতে ফেলা ফল-মূল, রুটি-বিস্কুট-কেক ইত্যাদি ফেলে দেওয়া হয় সাগরের জলে। সী-গালগুলো তাই দেখে হ্যাংলার মতো ঝুপঝাপ নেমে পড়ে সাগরের ঢেউয়ের বুকে: মহানন্দে শুরু করে ভোজনপর্ব। ঢেউয়ের তালে-তালে তারা ওঠে আর নামে, নামে আর ওঠে। দূর থেকে দেখায় যেন নীল জলে রাশি রাশি শ্বেত-পদ্ম। খাওয়া শেষ করেই আবার ডানা মেলে উড়তে থাকে, যেন শ্বেত-পদ্মরা পাঁপড়ি মেলে উড়ে গেলো আকাশের পানে। হাওয়ায় ভর দিয়ে আবার তারা উড়ে আসে জাহাজের কাছাকাছি। চক্রাকারে ঘুরতে থাকে জাহাজের মাথায়। যেন বলতে থাকে: কই, কই, খাবার কই? আরো দাও, আরো দাও।

সাগর-নগরে ওরা যেন এক ঝাঁক পুষ্পবৃষ্টি। ধরা-ছোঁয়া দেয় না, ধরার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে। হাল্কা পাখায় আর হাল্কা মনে তারা ওড়ে আর ঘোরে। রাত্রে ওরা কোথায় থাকে, কোথায় ঘুমোয়—কে

জানে! কোথায় ওদের দেশ?

বাইরের ডেক-এ বড় হাওয়া। পিংপং খেলবার কোন উপায় নেই। পিংপংয়ের টেবিলটা তাই খালি। তাই সাফল্ বোর্ড, ডেক-টেনিস খেলচে অনেকেই!

আর অনেকেই কি করবে তাই ভাবচে। ডেক চেয়ারে শুয়ে কেউ ঘুমুচ্চে, কেউ বা বই পড়চে কি? এক লাইন হয়তো দশবার পড়চে, তবু মানে বুঝচে না ঠিক। পড়ার দিকে মন থাকলে তো!

কর্মব্যস্ত জীবন থেকে ফাঁক ফাঁকি—একদিন ভালো, হু'দিন ভালো, তিন দিনের দিন বিরক্তিকর! কাজপাগলা মানুষগুলো তাই হাতের কাছে কাজ না পেয়ে, এই হু' দিনেই যেন অকেজো হয়ে গেচে, মচে পড়ে গেচে। প্রথম পরিচয় পর্ব হয়েচে শেষ। চেনা হয়ে গেচে সাগর নগরের অলি-গলি। ঘণ্টা ধরে খাওয়া আর যেন ভালো লাগে না। লাউঞ্জে গা এলিয়ে বসে অসীম ভাবনার হাওয়ায় মনের ঘুড়িকে আর কতক্ষণ ওড়ানো যায়? নীল সমুদ্রও যেন পুরোন হয়ে গেচে, নীল আকাশে সে সৌন্দর্য কই? সাগর-নগরের নাগর নাগরীরা রেলিং ধরে চেয়ে থাকে বটে সমুদ্রের দিকে, আকাশের দিকে—কিন্তু সে সব বিষয়ে বেশি আর আলোচনা করে না। প্রশংসা করেচে তারা পঞ্চমুখে—প্রথম দিকে। আর কত করা যায়? সৌন্দর্য যেখানে সীমাহীন, সেইখানেই তার মৃত্যু। কনে-বৌ লজ্জায় ঘোমটা টানে মুখে—তাই সে সুন্দর। রোমাঞ্চকর। রোজ শাড়ি-বদলানো ফিটফাট মেয়ে গটমট করে অফিসে এসে আমার পাশে বসে কাজ করে বটে, তবু কত আর তাকে দেখা যায়? তাই ফাইলে মন দিতে মন খারাপ হয় না।

যে কারণে ইন্দ্রের কাছে নন্দন-কানন স্বাভাবিক, কোন নৃপতির কাছে ধনরত্ন নামকাওয়াস্তে, বাদশার কাছে হারেমের সেরা সুন্দরীও

নিষ্প্রভ, ঠিক সেই কারণেই সাগর নগরের পারিপাট্য, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রচুর খাদ্য, আর ত্রুটিহীন ব্যবস্থাও যেন ম্লান! তার চারিদিকের নীল শোভাও যেন অনর্থক।

ধরিত্রীর ধুলো-কাদা-মাখা গ্রামের সহরের নগরের সেই দুঃখ কোথায়, দৈন্য কোথায়, ভয় কোথায়, ভাবনা কোথায়? কোথায় সেই ব্যস্ততা, শঠতা, আশা, হতাশা? সেই যে সকালে উঠে এক কাপ চা খাওয়া, খবরের কাগজের হেড লাইনের খবরটুকু পড়ে তাই নিয়ে সারাদিনটা জাবর কাটা, বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে ছুটে যাওয়া বাজারে, বাজারে দর করা, ফাউ নেয়া, ওজনে একটু বেশি পাওয়া—সেই একটু লাভ করার বিরাট আনন্দ এই সাগর-নগরে নেই। এখানে নেই সেই অফিস যাবার পালা। ন'টা বাজতেই মগ-মগ জল মাথায় ঢেলে, হাম হাম করে ছড়িয়ে খেয়ে, গিন্নীর সাজা পানটা নিয়ে, মাথায় সার্টটা গলাতে গলাতে গলি দিয়ে ছুটে অফিস যাওয়া—সে কোথায় এই আরাম-নগরে? এখানে বড়বাবুর তাড়া কই? পাঁচটা বাজার মজা কই? হকি-ফুটবল খেলা কই? হেরে যাবার দুঃখ কই? জেতারই বা হৈ-হৈ কই? কোথায় সে সব এই নগরে?

এখানে উকিলের জেরা নেই, মিথ্যা কোন সাক্ষী নেই, মামলার রায় নেই কী নিয়ে বাঁচবে লোকে? এখানে ডাক্তারের খরচ নেই, মুদিখানার দেনা নেই, গয়লার বাকি নেই—কী নিয়ে ভাববে লোকে? এখানে ছেলে-মেয়ের দুষ্টুমি নেই, গিন্নীর মুখ ভার নেই, পাড়া-পড়শির গাল নেই কী নিয়ে থাকবে লোকে?

সাগর-নগরে লোকেরা তাই বোকার মত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, খেলে বেড়ায়, গল্প করে, আর ভাবে, আর কি করা যায়? এই সুখের নগরেও মনে তাদের সুখ নেই। সুখের সাগরে যেন নাকানি-চোবানি খাওয়া। নোংরা মাছির পা জড়ানো গুড়ের কিংবা রসের ভাঁড়ে।

ড্যাডি ক্যাম্! লেটস্ প্লে।

মিঃ মুঞ্জেশ্বরের কিশোরী মেয়ে ইভা তার বাবার হাত ধরে টানলো।

মুঞ্জেশ্বর হাসলেন, মী?

ইয়া!

ইভা ডোমিনো খেলবার কাঠের টুকরোগুলো ছড়িয়ে ফেললো সামনের টেবিলেঃ ন্যাও. ক্যাম্ অন্।

অগত্যা মুঞ্জেশ্বরকে শুরু করতে হলো খেলা। মিসেস মুঞ্জেশ্বর সামনেই একটা সোফায় বসে পুলওভার বুনছিলেন, স্বামীর দিকে এক ঝলক চেয়ে মুখ টিপে হাসলেন! ভাবটাঃ যাক্, একটা কাজ জুটলো তবু তোমার!

মিঃ মুঞ্জেশ্বর আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান এম্বাসিতে কাজ করেন। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই তিনি সপরিবারে আমেরিকায় আছেন। সেখানে ভারত প্রতিনিধির দপ্তরের অন্যতম প্রধান কর্মচারী। সেই যে গেছলেন, আর ফিরচেন এতদিন বাদে। ফিরচেন ছুটিতে। ফেরবার পথে ইংল্যাণ্ড ছুঁয়ে ফিরচেন, তাই তাঁরাও নিয়েচেন এই সাগর-নগরে আশ্রয়।

প্রথম যাবার দিন আজোও মনে পড়ে তাঁদের। মিঃ মুঞ্জেশ্বর অবশ্য দিল্লীতে লেখালেখি আর ধরাধরি করেছিলেন এবং পেছনে ব্যাকিংও ছিলো তাঁর—কাজেই এম্বাসিতে কাজটা হয়ে গেলো অতি সহজেই। তবে কি করে হলো, সে খবরে দরকার কি?

এম্বাসিতে চাকরির খবরটা পাওয়া গেলো বিকেলে। সে রাত্রে দারুণ উত্তেজনায় ঘুম হলো না মিঃ মুঞ্জেশ্বরের, মিসেসেরও: ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে করতে কখন যে পূবের আকাশ ফ্যাকাশে হয়ে গেছলো, দু'জনের কারোরই তা খেয়াল ছিলো না। এই বিরাট ওলোট-পালটে আনন্দে উত্তেজনায় উপচে পড়বার বয়েস ছিলো না

শুধু ইভার। ছ' বছরের ইভার কাছে ইণ্ডিয়া আমেরিকা তখন দু'টি নাম ছাড়া আর কিছু নয়।

অবশ্য যাবার সময় এয়ারপোর্টে প্যান-আমেরিকান-এয়ারওয়েজের বিরাট ঝকঝকে ডানা মেলা প্লেনখানা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছলো ইভা। মুঞ্জেশ্বরের কোট টেনে জিগ্যেস করেছিলো, উ কৌন চিড়িয়া হ্যায় পিতাজী?

আশ্চর্য হয়েছিলেন মিসেস মুঞ্জেশ্বরও: এতগুলো লোক আর মালপত্র নিয়ে হাওয়াই জাহাজ যে উড়বে, যদি মাঝ রাস্তায় পড়ে যায়, তবে? সবাই যদি মরি তো ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি ইভা, যদি ইভার বাবা—উঃ, কী ভীষণ, ভাবাও যায় না। সব গঙ্গাজী কী কৃপা!

মিঃ মুঞ্জেশ্বরও যে এবিষয়ে কিছু ভাবেননি, তা নয়। তিনি ভাবছিলেন, দ্য সাইন্টিফিক ডেভেলপমেণ্ট অফ্ দিস্ মডার্ন এজ ইজ রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল!

সেদিন ইভার মুখে ছিলো আধ-আধ হিন্দী বুলি, পরনে ফুল-আঁকা রঙিন ফ্রক, মাথায় দু'বিনুনি, পায়ে গোলাপী মোজা আর লাল জুতো।

মিসেস মুঞ্জেশ্বর পরেছিলেন সিল্কের ছাপা শাড়ি, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে রুলি-চুড়ি, হাতঘড়ি ইত্যাদি, আর ছিলো মাথায় একরাশ কালো চুলের এলো খোঁপা!

মিঃ মুঞ্জেশ্বরের সেদিনের পোষাকের সঙ্গে আজকের পোষাকের খুব বেশি পার্থক্য নেই। সার্টের কলার আর হাতের কাফের ষ্টাইলটা বটে অন্যরকম, কোট-প্যাণ্টের ছাঁট-কাট অবশ্য উন্নততর, নইলে তাঁকে এত ফিটফাট দেখাবে কেন? বুট-ক্রীমে জুতো ঝকঝকে, চুল চকচকে হেয়ার ক্রীমে। চুলগুলি কাঁচায় পাকায় বেশ মানিয়েচে। মুখখানি চাঁচাছোলা। আজকাল সকাল-সন্ধ্যা দু'বার করে শেভ করেন।

আমেরিকান সভ্যতার ছোঁয়াচ লেগেচে মিসেস মুঞ্জেশ্বরেরও। তাঁর পুলওভার বোনা আঙুলগুলির নখে লালচে নেল পলিশ। আঙুলগুলি সত্যই 'লেডিজ ফিংগারস'। (চাঁপার কলি-র সঙ্গে তুলনা করে ওঁর মার্কিনি নেশাটা নষ্ট করে মনে কষ্ট দিতে চাইনে)। হাতে সেই রুলি-চুড়ি নেই, শুধু বাঁ হাতে চমৎকার একটি রিষ্টওয়াচ। খোঁপা হয়তো বেখাপ্পা লেগেছিলো সেখানে, তাই ববড্ করে চুল ছাঁটা এবং ব্লীচ করা, ফ্যাকাশে! যথারীতি ঠোঁটে লিপস্টিক, গালে রুজ, বক্ষ যুগলও যেন উন্নততর। কারণ কি?

নতমুখী বিয়ের কনের পক্ষেও বয়েসকালে সংসারের চাপে পড়ে মুখরা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নারীর নতমুখী যৌবন-ঘট শত চেষ্টাতেও বয়েসের হাত এড়িয়ে আর সোজা-মুখ-হয়ে দাঁড়াতে পারে না, এ তো অতি স্বাভাবিক। তবু যে সব ছলে-বলে-কৌশলে নতমুখীকেও উর্ধ্বমুখী করা হয়, তা নিতান্তই মেয়েলী ব্যাপার, একান্তই গোপনীয়। অতএব অলমঅতি বিস্তারেণ। বরং মিসেস মুঞ্জেশ্বরের শ্রীচরণের বর্ণনা করা যাক। পায়ে তাঁর দামি হাইহিল জুতো, কিন্তু জুতোর অন্তরালে তাঁর দু' পায়ের গোড়ালিই ফুটি-ফাটা। কী লজ্জা!

ইভা। ভারত থেকে গেলো একটি গোলাপ কুঁড়ি, ফিরচে সেটি সদ্য-ফোটা ক্যালিফোর্নিয়ান পপি হয়ে। সবই শ্যাম খুড়োর মাহাত্ম্য। তাই ইভার আধো-আধো হিন্দী জিবেয় 'ম্যারিকান-ইংরিজী ভাষা ঠাসা। কথায় সেণ্ট পার্সেণ্ট ইয়াংকি একসেণ্ট! পরিবেশ আর গভর্ণেসের পাকে পড়ে এই পরিণতি!

কাজ আর খেলা তো এক নয়। কাজেই, কাজের মানুষ মিঃ মুঞ্জেশ্বর ডোমিনো খেলায় পদে পদে ভুল করতে লাগলেন, ভুল জায়গায় কাঠের ঘুঁটি লাগলেন বসাতে।

আ ড্যাডি, ডোন্ বি সিলী!—ইভা বিরক্ত হলো।

তাড়াতাড়ি শুধরে নিলেন মিঃ মুঞ্জেশ্বর ঃ রিয়েলি সরি।

মিসেস মুঞ্জেশ্বর মিষ্টারের দিকে কটাক্ষ হেনে হেসে বললেন, এ গুড ফ' নাথিং ফেলা!

কাল বেলা বারোটা থেকে আজ বেলা বারোটা পর্যন্ত—চব্বিশ ঘণ্টায় 'বাতরি' কত মাইল নীল সমুদ্রে সাঁতার কেটেচে, তা নিয়ে বাজি ফেলেচে অনেকেই। অনেকেই লটারির টিকিট কিনেচে এক শিলিং দামের। অবশ্য ক্যাপটেন বোর্ডে একটা মোটামুটি অংক জানিয়ে দিয়েচেন, ৪৪০ মাইল থেকে ৪৮০ মাইলের মধ্যেই হবে সঠিক উত্তরটা।

লাঞ্চের পরে বোর্ডেই পাওয়া গেলো গত চব্বিশ ঘণ্টায় 'বাতরি'র দৌড় কতখানি। ৪৫৯ মাইল। মানে, ঘণ্টায় ১৯ মাইলের কিছু বেশি! ছি, ছি! মোটর গাড়িরা শুনলে ভাববে কি? স্কুটারগুলো শুনলে হাসবে। ট্রেনগুলো শুনলে হিস-হিস করবে। প্লেনগুলো জানলে তাদের ডানার ঝাপটায় তোমাকে ডুবিয়ে দেবে। হে জলযান, এই চলমান জগতে তোমার ডুবে মরাই ভালো।

৪৫৯ মাইলে যাঁরা বাজি ধরেছিলেন, সব টাকাটা তাঁদের মধ্যেই ভাগ হয়ে গেলো। আনন্দের ফোয়ারা ছুটলো তাঁদের মাঝে। তাঁদের অনেকেই এসে ঢুকলেন বার-এ। মদের গ্লাসে উঠলো বুদবুদ।

কিন্তু বাজি-জেতা রেজা তাঁর আনন্দকে ধোঁয়া করে দিলেন। ছড়িয়ে দিলেন তাঁর আনন্দ বন্ধু-বান্ধবের মাঝে। হাওয়ায় ভরে উঠলো সে আনন্দ। স্পীড-লটারিতে রেজা তাঁর প্রাপ্য প্রাইজ চার শিলিং ন' পেন্স পার্শারের কাছ থেকে এনে সোজা গেলেন বার-এ। কিনলেন তিন বাক্স সিগ্রেট। পকেটে ছিল সুইজারল্যাণ্ডে কেনা একটা সিগ্রেট-লাইটার, দেশে তাঁর সিগ্রেট-ফোঁকা বড়দার জন্যে। বার করলেন সেটা। তারপর একহাতে সিগ্রেটের বাক্স

আর অন্য হাতে সেই সিগ্রেট-লাইটার নিয়ে প্রমেনেড ডেক আর এ-ডেক চষে বেড়াতে লাগলেন ঃ

এই যে মিঃ সানিয়াল, একটা সিগ্রেট হবে ?

হতে পারে।

এই নিন।

ভচ্ করে সিগ্রেট লাইটার তাঁর নাকের সামনে জ্বালিয়ে সিগ্রেটটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেই বললেন, থ্যাংকু !

রেজা এবার সামনে পেলেন ডাঃ সেনকে ঃ সিগ্রেট ?

হঠাৎ ? কি ব্যাপার ?

নো কোশ্চেন প্লীজ।

অ' রাইট।

ভচ্। থ্যাংকু।

মিঃ গ্র্যাটন আসছিলেন, রেজা সিগ্রেটের বাক্স খুললেন ঃ

উইল' উ ?

আ। অ'কোর্স ! থ্যাংকু !

ইংরেজ সন্তান। আগে-ভাগেই 'থ্যাংকস্' জানিয়ে দিলেন।

ভচ্। থ্যাংকু।

এই যে কে-জিদা।

কে-জি আর তাঁর দুই টেবিল-সঙ্গিনী সিনিয়ার ও জুনিয়ার ফোর্ড মিঠে রোদ্দুরে ডেক-চেয়ারে বসে গল্প করছিলেন।

মে আই ?—রেজা শ্বাশুড়ী ফোর্ডকে সিগ্রেট অফার করলেন।

থ্যাংকু, মাই সান।

থ্যাংকু। ভচ্।

উইল উ ম্যা'ম ?—ফোর্ড বধুকে।

আ। থ্যাংকু !—সেই সঙ্গে মিষ্টি হাসি।

ভচ্ ! থ্যাংকু !

কে-জিদা, আপনারও একটা চলুক ?

দেখছো তো ভাই, কাঠের কল্কে হাতেই আছে।

তবু একটা ?

ব্যাপার কি ? হঠাৎ সিগ্রেট দানের পুণ্যলাভের ইচ্ছে কেন ?

রেজা হাসলেন, কিছু নয়। স্পীড-লটারিতে বরাত ফিরলো, তাই সরাৎ করে কিনে ফেললাম সিগ্রেট। আসলে সিগ্রেট-লাইটারটা পরখ করে দেখার ইচ্ছে!

বটে! বটে!

আর আনন্দটাকেও ধোঁয়া করে দিচ্ছি কেমন! ঠিক যেন কালি-পূজোয় বাজি পুড়িয়ে আনন্দ করা! প্লীজ হ্যাব ওয়ান্!

বেশ, দাও।

থ্যাংকু! ভচ্! কী রকম, ভালো লাইটার, না ?

নট্ লাইক ইয়োর ওয়ার্ম হার্ট!

আ, কে-জিদা, প্লীজ ডোন ফ্লার্ট।...এই যে মিঃ রামস্বামী, উইল উ...

রেজা এগিয়ে গেলেন রামস্বামীর দিকে।

অর্থাৎ সাগর-নগরে হৃদয় জয়ের অভিযানে ঘুরতে লাগলেন রেজা।

কিন্তু ধাক্কা খেলেন মিঃ হকের কাছে।

উইল ইউ ?...

নিউ-ইয়র্কি সালিম হক তখন বেশ সোমরসস্থ! ফস্ করে নিজের দামি সিগ্রেটকেস বার করে বোতাম টিপে খড়াং করে খুলে মেলে ধরলেন সিগ্রেট। বেশ দামি সিগ্রেট।

হোয়াই, আই অ্যাব মাই ওন সিগ্রেট। আর্নট্ দে গুড ? ক্যাম অন্, টেষ্ট ওয়ান!

নো, আই ডোন স্মোক।—রেজা জবাব দিলেন।

দেন, হোয়াই ইউ অফার ?

এবার বিগড়ে গেলেন রেজা: ছ্যাট্‌স মাই স্যুইট উইল। এবং রেগে গেলে রেজা দেশী-ইংরিজী বলতে শুরু করেন: ইফ ইউ ডোন লাইক, ডোন টেক। হু কেয়ারস্‌! আই অফার, মাই উইশ।—বলেই শিস দিতে দিতে একটু সরে গিয়ে নিজের মনেই বললেন, এ ডলার ডেভিল!

গত সন্ধ্যায় সিনেমা হয়ে গেচে, আজ তাই নাচের ব্যবস্থা। ডিনারের পর রাত্রি ন'টায় শুরু হলো বলডান্স।

ডাইনিং হলের মাঝখানের আটখানা টেবিল আর বত্রিশখানা চেয়ারের বল্টু খুলে সরিয়ে জায়গা করা হয়েচে। প্রজেকটার রুমের গা ঘেঁষে বসেচে বাজনার দল। এক কোণে কিচেনের উইণ্ডো খুলে ড্রিংক-সার্ভের ব্যবস্থা। সারা হলটায় আলো ঝলমল।

কালকের মত আজকে হল-এ অত ভিড় নেই। যাঁরা নাচ জানেন, তাঁরাই এসেচেন আর এসেচেন কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ। তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ইয়োরোপে যাবার পথে জাহাজে বলডান্সের হলে ভিড় হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, ছায়াছবিতে বল-ডান্স দেখা আর দু'হাত দূরে রক্ত-মাংসের শরীরের বলডান্স দেখার মধ্যে রীতিমত পার্থক্য আছে, অন্তত প্রাচ্য-চোখে। কিন্তু ইয়োরোপ ঘুরে, সেখানকার বাসিন্দাদের বেলেল্লাপনা দেখার পর প্রাচ্যযাত্রীদের কাছেও বিশুদ্ধ বলডান্সে আর কোন মজা বা মাদকতা নেই। ব্র্যাণ্ডির কাছে যেন টেমসের জল।

তবু এসেচেন অনেকেই একটু সময় কাটাতে, একটু বৈচিত্র্যের আশায়, খানিকটা আড্ডার লোভে; আর সেই সঙ্গে দু'এক পেগ।...

বাজনার মিষ্টি নরম সুর সারা হলটায়। শুরু হয়েচে সুরাপাত্রের টুংটাং। 'বেল-বয়'রা অর্ডার মত বোতল-গেলাস নিয়ে টেবিলে টেবিলে ঘুরচে। কিন্তু তখনও শুরু হয়নি নাচ।

প্রথম দিনের নাচ। কাজেই নাচিয়েদের মন নাচতে চাইলেও পা বাড়াতে লজ্জা, হয়তো বা দ্বিধা। তাছাড়া অস্থির সাগর-নগর হেলচে আর দুলচে। অনভ্যস্থ পায়ে এক-এক সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোও শক্ত। এ অবস্থায় নাচ!

যাত্রীদের এই প্রথম দিনের দ্বিধা-লজ্জার কথা বাদকদলের কাছে অজানা নয়। তাই তারা খালি ফ্লোর থাকা সত্ত্বেও আপনমনে বাজিয়ে যাচ্চে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাধার জন্যে বাঁশি বাজাতেন, সাপুড়ে যেমন সাপের জন্যে বাঁশি বাজায়, এরাও তেমনি বাজায় বুঝি যাত্রীদের নাচাবার জন্যে। বেশ জানে, তালমান জানা পা কোন দ্বিধা-লজ্জার বাধা মানে না। পরামর্শ করে শেষপর্যন্ত এক জোড়া সাহস করে নাচতে থাকে ফ্লোরে।

মিঃ আর মিসেস গ্র্যাটনই প্রথমে নামলেন ফ্লোরে। জাহাজের টাল সামলাতে সামলাতে তালে তালে নাচতে লাগলেন তাঁরা। তাঁদের নাচতে দেখে, সাহস পেয়ে অনেকেরই পা উঠলো নেচে।

সালিম হক আমেরিকার সাতঘাটের জল খাওয়া ছেলে। জার্মান মিউজিসিয়ান দলের মিঃ এবং মিসেস হারমান এক টেবিলে বসে ড্রিংক করছিলেন। সালিম হক মিসেস হারমানের কাছে গিয়ে সবিনয়ে নিজের হাতখানা এগিয়ে দিলেন। এক্ষেত্রে নৃত্যাভিলাষীকে প্রত্যাখ্যান করা অভদ্রতা। মিষ্টারের দিকে একবার চেয়ে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালেন মরালগ্রীবা রাজহংসী। সালিম তাঁকে নিয়ে ফ্লোরে এসে শুরু করলেন নাচ।

এনাক্ষী রাওকে এক গেলাস বীয়ার দিয়ে, সি. মিটার এতক্ষণ হুইস্কি আর সোডা নিয়ে বসেছিলেন। শেষ চুমুক দিয়ে চিত্ত মিত্র মিস রাওকে বললেন, নাচবেন?

আমি নাচতে জানি নাকি?

মিটার জানতেন, এই ধরনেরই একটা উত্তর দেবেন এনাক্ষী।

কাজেই বললেন, বসুন দেবি,আমি একটু নেচে আর নাচিয়ে আসি। পা-টা কেমন তাল ঠুকচে।—বলেই এগিয়ে গেলেন কাছেই মিস ইলিয়টের টেবিলে। উঠতে হলো ইলিয়টকে। এনাক্ষী বেশ গম্ভীর হয়ে দেখতে লাগলেন দু'জনের নাচ। মিটার পাকা নাচিয়ে।

পার্টনারকে নাচাতেও জানে। মিটারের বাঁ হাত দিয়ে ইলিয়টের ডান হাতখানি ধরা। ইলিয়টের বাঁ হাতখানি মিটারের কাঁধে অলস হয়ে পড়ে আছে এবং তাঁর সরু কোমরটি জড়িয়ে ধরে আছে মিটারের ডান হাতখানা। একটু বেশি কাছাকাছি বলে মনে হচ্চে যেন? অন্তত, এনাক্ষী রাওয়ের তাই মনে হচ্চে।

আহা, এমন নাচ না নাচলেই নয়। মিটারের যত বাড়াবাড়ি!

মিটার কিন্তু দিব্যি নাচতে লাগলেন। এক একবার আড়চোখে দেখে নিলেন এনাক্ষীকে। এনাক্ষী একদৃষ্টে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। এই ধরনের একটা দৃষ্টিই মিটার আশা করছিলেন। মেয়েদের অনুরাগ বাড়াতে হলে একটু রাগাতে হয়। আর মেয়েদের রাগাবার একমাত্র উপায়, অন্য মেয়ের দিকে একটু অনুরাগ দেখানো। মনের মানুষ অন্য মেয়েমানুষের দিকে নজর দেয়, সেটা কোন মেয়েই সুনজরে দেখে না। চিত্ত মিত্র এসব বেশ জানেন! আর জানেন বলেই নিশ্চিন্ত হয়ে নাচ্চেন ইলিয়টের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে।

বেশ নাচ্চে, না?—স্প্যানিশ মেয়ে ও ইংরেজ-বধূ জুনিয়ার ফোর্ড বললেন কে-জিকে।

কে-জি একমনে নাচ দেখছিলেন, বললেন, হুঁ!

শাশুড়ী ফোর্ড হয়তো বুঝলেন, বৌমার মনের বাসনা।

তাই হাতের সিগ্রেটের ছাইটা ঝেড়ে মিষ্টি হেসে বললেন, তা যাওনা, তোমরাও একটু নাচোগে।

উইল'উ মিষ্টার গস্?

কে-জি হেসে ফেললেন, থ্যাংকু ভেরি মাচ্।—বীয়ারের গেলাসটা

টেবিলের উপর ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, তোমার সঙ্গে নাচতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম মিসেস ফোর্ড। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, এ নাচ আমি জানিনে। কাজেই নাচতে গেলে তোমার পা মাড়িয়ে দেবার সম্ভাবনাই বেশি।

বলো কি? ইণ্ডিয়ায় কেউ নাচে না?

নাচে বৈ কি? কে-জি হাসলেন, যীশাস্ ক্রাইষ্ট জন্মাবার আগে থাকতে ইণ্ডিয়ানরা নাচ্চে, আজো তারা নাচে, হয়তো ভবিষ্যতেও নাচবে। তবে এমন ধরনের নাচ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে চলিত নেই।

ও, আই'ম সরি!

উইল'উ ম্যাডাম!—হাতখানা বাড়িয়ে জুনিয়স মিসেস ফোর্ডের দিকে এগিয়ে এলেন মিঃ হারমান।

থ্যাংকু।

হারমান আর ফোর্ড এগিয়ে গেলেন ফ্লোরের দিকে।

কে-জি তাঁদের দিকে চেয়ে বীয়ারে গেলাসটা মুখে তুললেন। হয়তো ভাবলেন, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! কথাটা সত্যিই।

প্রথম দিনের ফ্লোর, তাই নাচিয়ের সংখ্যা কম, তবে জমেচে বেশ। মাঝে মাঝে জাহাজের দোলানি সামলাতে না পেরে ঢলে পড়চে এ-ওর গায়ে, হেসে উঠচে দু'পক্ষই।

সবাই হেসে উঠলো, যখন নাচের ফ্লোরে দেখা গেলো সাগর-নগরের সবচেয়ে ছোট্ট মানুষটি কে. এম. শা আর বিরাট মোটা ঢেঙা প্রায়-বৃদ্ধা মহিলা মিসেস এস. হল্যাণ্ডকে। সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো, কেউবা মদের গ্লাস তুলে তাঁদের শুভেচ্ছা জানালো। তা দেখবার মত। না, নাচটা নয়, দেখবার মত তাদের রাজযোটক মিলনটা। শা-র নাকটা মিসেসের পেট পর্যন্ত আর মাথাটা তাঁর বুক পর্যন্ত। মিসেসের মোটা কোমর জড়াতে হলে অন্তত একখানি দেড়-গজি হাত চাই। কাজেই শা তাঁর ছোট্ট হাতখানি উঁচু করে

রেখেচেন মিসেসের কোমরের খাঁজে।

দু'জনে মতলব করেই নেমেচেন ফ্লোরে। ইচ্ছেটা, মজা করা, লোক হাসানো! তাই নিজেরা খুব গম্ভীর হয়েই নাচ্চেন। যাঁরা লোক হাসান, তাঁরা নিজেরা হাসেন না।

দূরে একটা টেবিলে মিঃ এবং মিসেস ধীলন। লীলা ধীলনের বয়েস বেশি নয়, তিরিশের এপারে। নৃত্যশিল্পী তিনি। স্বামী বলবন্ত ধীলন ইংল্যাণ্ডে ইঞ্জিনীয়ারিং বই-পত্র নিয়ে ডুবে থাকতেন, আর ওঁর স্ত্রী লীলা ধীলন নানা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে নৃত্য করে বেড়াতেন। ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টসদের মধ্যে তবলচি, হারমনিয়ম বাদক, বাঁশি বাজিয়ে আর এস্রাজি চারজনও জুটে গেছলো। কিন্তু আশ্চর্য, নৃত্যপরায়ণা স্ত্রী স্বামীর বিদ্যা-সাধনায় কোনরূপ বিঘ্ন ঘটালেন না। কারণ, বলবন্ত ধীলন শুধু ধীর. শান্তই নন, হৃদয়খানি তাঁর উদার মহৎ এবং আর একটি কারণ হচ্চে, লীলা ধীলনের পায়ের ঘুঙুরের রুমুঝুমু বোল্ বাইরের কোন হল-এ শোনা যেতো, বলবন্তের পড়বার ঘরে নয়। সে নাচ দেখে ইংরেজরা যখন হাততালি দিতো, বলবন্ত তখন তাঁর ঘরে গালে হাত রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং ফরমূলা করতেন মুখস্থ।

শোনা যায় বিশ্বামিত্র একদা মেনকার ঐ ঘুঙুরের বোল্-এই তাঁর যোগ সাধনায় সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন। তার কারণ দু'টি: ঘুঙুর তাঁর কানের কাছে এসে বাজিয়েছিলেন মেনকা এবং তাঁর ঘরণী ছিলেন না স্বর্গ-মহিলাটি। এক্ষেত্রে ঘুঙুর বাইরে বাজাতে থাকায় এবং নর্তকীটি ঘরের ঘরণী হওয়ায় বলবন্ত ধীলন নিশ্চিন্ত হয়েই নিজের তপস্যায় মন দিতে পারতেন।

তা লীলা ধীলনের কাঠামোটি সত্যিই নাচের উপযোগী। তাঁর প্রতি পদক্ষেপটি যেন ছন্দ-বন্ধ। সুগঠিত দীর্ঘ পদ-যুগল, ক্ষীণ-কটি, যথোচিত মাংসল নিতম্ব, উন্নত বক্ষ, লীলায়িত বাহুযুগল—কিন্তু হে

ঈশ্বর, এ কী করেচো তুমি! কোন মুখের ছাঁচ তুমি এমন দেহখানির জন্যে ব্যবহার করলে? ভুলেছিলে নাকি লাবণ্যের ঘামতেলের তুলি বুলিয়ে দিতে? তাই, লীলা ধীলনের মুখে লাবণ্য নেই। আছে শুধু সাদা, কালো, লাল রংয়ের পুরু প্রলেপ—স্বরূপ ঢাকবার উপকরণ। উপরন্তু খোঁপাটাকে বর্মী কায়দায় মাথার চাঁদির উপর তুলে দেওয়ায় সব মিলিয়ে তাঁর স্বরূপ এক অপরূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েচে। তবু লীলা ধীলনকে দেখলে কিছুক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করে।

লীলা ধীলন কিন্তু একদৃষ্টে বলডান্স দেখছিলেন। এই নাচের সঙ্গে তাঁর নাচের কোন মিল নেই। হর-পার্বতী বা রাধা-কৃষ্ণের নাচের সময় পুরুষের সঙ্গে নাচতে হয় বটে, তবে এমনতর পুরুষের কাছে ধরা দিয়ে, তার হাত ধরে নাচা—বিলেত-ফেরত লীলা ধীলনের কাছেও যেন মনে হলো,—ধ্যেৎ!

তাঁর পাশে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন বলবন্ত ধীলন। একটি পুরুষসিংহ। দৈর্ঘে, প্রস্থে, দৃঢ়তায়, গাম্ভীর্যে—মনোহর। তিনি ভাবচেন, ইণ্ডিয়ায় তাঁর ডিপার্টমেণ্টের সব মেসিনগুলো আর লাইন-শাফটে না চালিয়ে ইংল্যাণ্ডের মতো সেলফ্-ইউনিট মোটরে চালাবেন। তাতে কোন মোটর ব্রেকডাউন হলে সব মেসিনই এক-সঙ্গে থেমে থাকবে না, তাছাড়া জায়গাও অনেক কম লাগবে! মিঃ আর মিসেস ধীলন বুঝি স্বাধীন ভারতের শিল্প আর কৃষ্টির প্রতিনিধি।

রামস্বামী, সানিয়াল, ডাঃ রয় আর রেজা একটা টেবিল দখল করে জমাট হয়ে বসে চোখ দিয়ে নাচ গিলচেন আর গলা দিয়ে ঢোক গিলচেন। নিজেদের ইচ্ছে মত পানীয় বেছে নিয়েচেন তাঁরা। রামস্বামী জান, সানিয়াল বীয়ার, রয় হুইস্কি আর আর রেজা শুধু সোডা! মাংসের ভোজে রেজা যেন আলোচাল আর কাঁচাকলা সেদ্ধ নিয়ে বসেচেন।

পার্টনার বদলে-বদলে নাচ চললো বারোটা পর্যন্ত। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই শুতে গেলো ঘরে। সুরাপায়ীদের কয়েকজন টেবিলে মাথা গুঁজে পড়ে রইলো, আর সবাই টলতে-টলতে, হাতড়াতে-হাতড়াতে ঢুকলো যে-যার কেবিনে। নাচিয়েরা হ্যাণ্ডশেক করে, শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন একে-একে।

৭০৬ নং কেবিনটা তখনো খোলা। ডাঃ সেন আপার বার্থের মাচায় উঠ্চেন। কে-জি তাঁর স্লিপিং স্যুটটা গায়ে গলাচ্চেন, রামস্বামী নেশায় গুম্ হয়ে বসে আছেন চেয়ারে। সালিম হকের দেখা নেই। হয়তো ডান্সিং হলের টেবিলে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন, কিংবা – কিংবা নয়, সত্যিই সালিম হক ফাঁকা লাউঞ্জে বসে মিস ই. রীডের সঙ্গে গভীর আলাপে মগ্ন। মিস্ রীড ইচ্ছে করেই নাচেননি প্রথম রাত্রে। প্রথম রাত্রের হালচালটা দেখে নিলেন, এর পরের রাত্রে ইচ্ছে আছে নাচবার। সালিমের সঙ্গে এই জাহাজেই আলাপ। নিয়মিত ড্রিংক ঘুষ দিয়ে তবে আলাপ জমাতে পেরেচেন সালিম। আজও খাইয়েচেন প্রায় চার পেগ হুইস্কি।

মিস রীড বম্বের এক ইংলিশ স্কুলের ফ্রেঞ্চ-টিচার। জাতে ইংরেজ, কিন্তু অনেক ফরাসীদের চাইতেও ভাল ফ্রেঞ্চ জানেন এবং ফরাসীদের মত মদ গিলতেও ওস্তাদ। তাঁর শিক্ষাকালে ও বিদ্যেটা প্যারি থেকেই শেখা। বয়েস ত্রিশের উপরে, কিন্তু সাজ-সজ্জার কৌশলে যেন পঁচিশের মধ্যেই বয়েসটা বন্দী। অনেক দেখা অনেক শেখা মেয়ে—তাই প্রেম নেহাতই খেলা, তা প্রমাণ করেচেন বহুবার। পুরুষের ছোঁয়া তাঁর শুভ্র নরম চামড়ায় ঠেকে থমকে থাকে, অন্তরে গিয়ে রং ধরাতে পারে না।

চার পেগের জন্যে আর বেশিক্ষণ বসা যায় না। তাই মিস রীড বললেন, এবার উঠি, ঘুম পেয়েচে বড়ো।

এর মধ্যেই ?—হকের সুরে করুণ মিনতি।

কাল আবার দেখা হবে। গু'বাই।

নিতান্তই উঠবে ?—তার হাতখানা চেপে ধরলেন হক।

হ্যাঁ, আর না।—হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস।

বেশ, তবে তাই হোক। উইশ ইউ হ্যাপি ড্রিম !

মিস রীড গট্-গট্ করে চলে গেলেন নীচেয় নিজের কেবিনে। সালিম হক বিষন্নবদনে সিগ্রেট ধরালেন একটা। দু'টান টেনেই অ্যাশট্রেতে সিগ্রেটটা মুচড়ে ভেঙে রেখে এলিয়ে পড়লেন সোফার গায়ে।

আবার সমুদ্রে সকাল হলো। লাল সূর্য নীল সমুদ্রের তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠচে। সাগর-নগরের নীচের তলার মানুষ-গুলোও এক-এক করে উপরের ডেক-এ এসে জমচে। বেড-টি-র পালা হয়েচে শেষ। একটু পরেই ব্রেকফাষ্টের শুরু।

সূর্য উঠলো লাল সমুদ্রের কোলে।

ডাঃ চ্যাটার্জি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন, গর্ভবতী সমুদ্র বুঝি এইমাত্র জন্ম দিলে সূর্যকে। রক্তস্রাবে তাই সমুদ্র লাল।

দূর-দিগন্তে পাতলা কুয়াশা। ধোঁয়াটে আশা-আকাংখা নিয়ে মায়ের কোল ছেড়ে বাড়তে লাগলো, এগোতে লাগলো গোলাপী সূর্য।

স্যাম-আলির উর্বরা স্ত্রী ডরোথি আলি ডেক চেয়ারে বসে একমনে চেয়ে ছিলেন সূর্যের দিকে। হেনরি এতক্ষণ মায়ের কোলেই ছিল, এইমাত্র নেমে খেলা শুরু করেচে বল নিয়ে। রোজি, জন, এলবার্ট, পামেলা—বাপের কাছে লাউঞ্জে।

এনাক্ষী রাও এসে দাঁড়ালেন ডেক-এর নির্জন কোণটিতে। একটু পরেই সেখানে দেখা গেলো সি. মিটারকে।

এই যে এখানে ?

হুঁ।

আমি সারা জাহাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি!

কেন ?

কেন ? গোঁফটা মুচড়ে মিটার বললেন হেসে, জানো না কেন ? মিস রাও, ঐ ছাখো সূর্য। একটু আগে ছিলো সমুদ্রের গর্ভে, পরে সমুদ্রের কোলে, এখন ঐ আকাশের বুকে। ঐ আকাশ ছাড়া ওর আর যেমন গতি নেই, আমিও তেমনি দিশেহারা তোমার ঐ হৃদয়-আকাশ ছাড়া!

একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি ?—এনাক্ষী কটাক্ষ হানলেন।

মিটার এনাক্ষীর সুগঠিত বক্ষ লক্ষ্য করেই বোধহয় বললেন, মোটেই না।

দূরের কুয়াশা সরে গেচে।

তবু আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে, দুই নীলে যেখানে মেশামেশি, দেখা গেলো সেখানে কালো খানিকটা দাগ।

দুই মিসেস ফোর্ড ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন ঐ কালো দাগের দিকে :

ঐ-ঐ জেব্রল্‌তার!—ফোর্ড-বৌ শাশুড়ীকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

ইজ ইট!—বৃদ্ধার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সিগ্রেটে একটা টান দিয়ে বললেন, মাই উইলি ইজ দিয়ার!

ইয়েস ম্যামী!—তবে বৌটি মুখে বললেন না, মাই উইলি ইজ দেয়ার!

হাজার হোক শাশুড়ী তো!

কে-জি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন পাইপ দাঁতে চেপে, ওঁদের দেখে থামলেন : কী দেখচো গো তোমরা অমন হাঁ করে ?

জেব্রল্‌তার! ঐ যে! মাই ল্যান্দ্‌!—ফোর্ড-বধূর মুখে এক গাল হাসি।

কে-জি ঠাট্টা করে বললেন, তোমার ল্যান্দ্‌ এখন ইংল্যান্দ্‌!

ঠিক বলেচো সানি!—বৃদ্ধার মুখে মৃদু হাসি।

আরো স্পষ্ট হতে লাগলো কালো দাগটা। ক্রমে বড় হতে লাগলো, কালো হতে লাগলো, দেখা গেলো কালো উঁচু পাহাড় একটা। চোখে পড়লো সাগর-নগরের যাত্রীদের। অনেকেই রেলিংয়ের ধারে এসে ভিড় করলো।

জেব্রলটার। জেব্রলটার।

আজ তিন দিন বাদে মাটির মুখ দেখলো মানুষরা। মাটির মানুষরা। মাটির মতো উর্বর, মাটির রসে রসিক, আবার মাটির মধ্যেই মিশে-যাওয়া মানুষরা আবার মাটি দেখতে পেলো। আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠলো সবাই। করবে না? তিনদিন মাটি দেখতে পায়নি, শুধু জল দেখেচে। শুধু জল, জল, জল—দেখে দেখে চিত্ত বুঝি হয়েচে বিকল!

জলে-ভাসা সাগর-নগরে মাটি নেই।

আরো স্পষ্ট হলো জিব্রলটার। বেলা তখন বারোটা।

ঐ তো দেখা যাচ্চে বিরাট পাহাড়, খাড়া হয়ে আছে। ইংরেজের প্রহরী। বন্দুক কামান সাজিয়ে বসে আছে স্পেনের ঘাটের ধারে। স্পেনের খানিকটা জমি ঘিরে নিয়েচে পাহারার জন্যে। স্পেনের ঘেরা ঘাটে ইংরেজ এক হাতে ছিপ, অন্য হাতে লাঠি নিয়ে বসে। শত্রু দেখলে লাঠি দেখায়, আর কুমারী দেখলে টোপ্‌ ফেলে। উইলিই তার প্রমাণ।

দেখা যাচ্চে সবুজ গাছ। সবুজ ঘাস। নীল চোখে, বাদামী চোখে, কালো চোখে আকুল হয়ে চেয়ে আছে সবুজ কুলের দিকে।

খেলনার মত দেখা যাচ্চে বাড়িগুলো। আর তাদের পায়ের কাছে রেখে খাড়া হয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট পাহাড়ী প্রহরী।

ডাইনিং হলে আজ সবাই যেন চঞ্চল। খাওয়ার দিকে মন নেই। আর ঘণ্টা খানেক বাদেই সাগর-নগর মাটির-নগরের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াবে। সাগর-নগরের যাত্রীরা মাটিতে পা ফেলে বাঁচবে।

সবাই প্রায় দল পাকাচ্চে।

চিঠি লেখা শেষ হয়েচে, খাম আঁটচে অনেকে।

পার্শারের অফিসের সামনে ভিড়। জেব্রলটারের ডাক টিকিট চাই। খামে সেঁটে ডাকে দেবে। তটে যাবার ব্যবস্থাও হবে ওখান থেকেই। ছাড়পত্র ওখানেই পাবে।

জিব্রলটার জঙ্গী বন্দর।

কাজেই তার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো যার-তার কর্ম নয়। হয়তো তাই সাগর-নগর 'বাতরি' শত হস্তেন দূরে মাঝ দরিয়ায় নোঙর ফেলে দাঁড়ালো। যাত্রীদের বুঝি মনে মনে বললো, যাও তোমরা যাও, দেখে এসো, আমি এখানে দাঁড়াই।

বড় একখানা ষ্টীমলঞ্চ এসে দাঁড়িয়েচে সাগর-নগরের গায়ে। হয়তো বুঝিয়ে বলতে এসেচে: হে বিরাট, স্বাগতম্। আমাদের বন্দরের হয়ে তোমাকে বন্দনা জানাতে এসেচি; বলতে এসেচি, আমাদের বন্দর তোমার বন্ধুত্ব চায়, কিন্তু বন্ধুত্বের আলিঙ্গনের কোন উপায় নেই। কারণ মাঝখানের এই জলটুকু তোমার কাছে হাঁটুজলের সমান—তোমার অগম্য। তাই আমার এই দূতিয়ালি।

'বাতরি' হয়তো তাই 'সিটি' মেরে হেসে বললো, ঠিক আছি। আমি এখানেই বেশ থাকবো। তুমি বরং আমার এই নাগরিকদের, মাটির মানুষদের তোমার মাটির নগর দেখিয়ে আনো। লোকগুলো ক'দিন জল দেখে-দেখে হাঁফিয়ে গেচে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! গ্ল্যাডলি! ষ্টীমলঞ্চও সিটি মারলো, কই, এসো গো তোমরা!

সাগর-নগরের নাগরিকরা বাইরের সিঁড়ি বেয়ে নীচেয় নামতে লাগলো ষ্টীমলঞ্চে। তাদের পাশপোর্ট জমা রইলো পার্শার অফিসে।

তবে বেশ কয়েকজন তাঁদের পাশপোর্ট কোটের পকেটে বা ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যেই ভরে নামলেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় নেই, (সহরে ক'জনের সঙ্গেই বা পরিচয় থাকে!) তবে সাদাম্পটন থেকে জিব্রলটার যাবার যাত্রীদের নামের তালিকার কৃপায় নামগুলো জানা শক্ত নয়ঃ মিঃ এল্‌সওয়ার্থ, মিঃ গ্রোভ, মিঃ হেক্সটল, সপরিবারে মিঃ জে, টি, উইলস, মিঃ ও মিসেস গোমেজ, মিঃ গোল্ডউইন, মিসেস ওয়েব আর তাঁর দুই ছেলে এবং আরো প্রায় জন পনেরো এবং আমাদের পরিচিত শাশুড়ী-বৌ ফোর্ড।

এঁরা নামলেন 'বাতরি'কে বিদায় দিয়ে।

আর বেড়াতে নামলেন 'বাতরি'র প্রায় অর্ধেক লোকঃ সানিয়াল, রয়, চ্যাটার্জি, চিত্ত মিত্র, এনাক্ষী রাও, কে-জি, কে, এম, শা, হারমান দম্পতি, ধীলন দম্পতি—কত নাম করবো!

আবার নামলেনও না অনেকে। তাঁদের অনেকেই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা—উপর নীচ করার সামর্থ্য বা উৎসাহ আর নেই; কিংবা যাঁরা আগেই দেখেচেন জিব্রলটার এবং তাঁদের মতে দু'বার দেখবার কিছু নেই সেখানে। আর নামলেন না কাচ্চা-বাচ্চার মা-বাপেরাঃ যেমন আলি-দম্পতি। যাঁরা অসুস্থ, তাঁরাও নামলেন না। আর মন যাঁদের ভারাক্রান্ত, দেহও তাঁদের ভারিই থাকে—তাঁরাও 'বাতরি'তে থাকাই ঠিক করলেন।

মাঝারি আকারের লঞ্চটায় জেব্রলটার দর্শনার্থীরা ঠাসাঠেসি করে বসেচেন; কে-জিও বসেছিলেন সানিয়াল, রামস্বামী, ডাঃ সেন, রয়, ও রেজার সঙ্গে। গল্পে মজগুল ছিলেন সবাই। এমন সময় কে-জি

দেখলেন, ফোর্ড-বৌ ডাকচেন তাঁকে।

কে-জি বললেন হেসে, ওহে বসো তোমরা, ফোর্ড-বধূ ডাকচেন কেন, শুনে আসি।

সঙ্গে সঙ্গে সবাইয়ের চোখ পড়লো ফোর্ড-বধূর দিকে। ঠোঁটকাটা সানিয়াল বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সুর করে বললেন, যাও হে কালাচাঁদ, চাঁদবদনীর বড় সাধ, বলবেন তাঁর অপরাধ—

কি অপরাধ?—কে-জি জিগ্যেস করলেন।

বারে, তিনি তোমায় ছেড়ে চললেন আজ আয়ান ঘোষের ঘরে! অপরাধ নয়?

শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কে-জি উঠলেন। কারোর হাত, কারোর পা বাঁচিয়ে, একে টপকে, ওকে সরিয়ে কোন মতে গিয়ে দাঁড়ালেন ফোর্ড বধূ আর শাশুড়ীর সামনে। ফোর্ড-বধূ একটু সরে জায়গা দিলেন বসতে।

উই আর সরি টু লীভ ইউ সানি।—কে-জির হাতখানার উপর নিজের হাত রেখে ফোর্ড-শাশুড়ী বললেন কথাটা। আহা মাতৃত্বের স্নেহ যেন গলে পড়ছিলো বৃদ্ধার কথাগুলির মাধ্যমে। সামান্য তো দু-তিন দিনের আলাপ। একসঙ্গে খাওয়া, মাঝে-মাঝে একসঙ্গে জাহাজের মধ্যে ঘোরাঘুরি। অথচ কখন যেন মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসার অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেচেন বৃদ্ধা। এমনিতরো বাঁধা পড়ে যায় অনেকেই। যেন বসুধৈব কুটম্বকম্।

তাই তো প্রায় দেখা যায়, যে দুই দেশের কাগজ আর নেতারা গলাবাজি করে গালাগালি করচে, সেই দুই দেশেরই প্রেমিক-প্রেমিকা হয়তো কোন পার্কে আড়ালে কোন বেঞ্চে আলিঙ্গন অবস্থায় গভীর ভাবে বিভোর কিংবা সে দু'দেশের দুই বন্ধু সামনে কফি বা মদের পেয়ালা নিয়ে সরস গল্পে মজগুল। এঁদের প্রাণের নীতির কাছে রাজনৈতিক পররাষ্ট্রনীতি অচল, আর পঞ্চশরের দ্বৈত আসরে বোমা

একদম বেমানান।

ডু' ইউ লাইক তু গিভ্ ইয়োর আড্রেস ?—ফোর্ড-বধূ ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে তাঁর ছোট্ট নোট-বই আর পেন্সিল এগিয়ে ধরলেন কে-জির দিকে।

উইথ প্লেজার।—কে-জি নোটবইতে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে নিজের ডায়েরি বইখানা বার করলেন : তোমাদের ঠিকানাও দাও!

জিব্রলটার আর ইংল্যাণ্ডের দুটো ঠিকানাই লেখা হয়ে গেলে, ফোর্ড-বধূ বললেন, চিঠি দিয়ো কিন্তু।

ফোর্ড-শাশুড়ী মুচকে হেসে বললেন, এ বুড়িকেও যেন ভুলো না।

ষ্টীমলঞ্চ ততক্ষণে জিব্রলটারে তীরে এসে ঠেকেচে।

যাত্রীরা সবাই উঠে দাঁড়ালো। মাত্র দু' ঘণ্টার চেঞ্জ।

সাগর-নগর থেকে মাটির নাগর গিয়ে মাটির মানুষের সঙ্গে মোলাকাত করবার এই এক সুবর্ণ সুযোগ। সবাই চঞ্চল।

সিঁড়ি লাগানো হলো। ভেসে আসা সবাই একে একে মাটিতে পা দিলো। কে-জি বিদায় নিলেন ফোর্ড মহিলাদের কাছে। তাঁরা এখন কিছুক্ষণ আটকে থাকবেন কাষ্টম্সের বেড়ার মধ্যে। তাদের সঙ্গে থাকতে গেলে বেড়ানো হবে না তাঁর।

গু'বাই সানি !—বৃদ্ধা কে-জির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। ফোর্ড-বধূও।

এমন সময় বৃদ্ধা তীরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আ, দেয়ার্স উইলি।

ফোর্ড-বধূও তাকে দেখে রুমাল নেড়ে বললেন, ইয়েস, দেয়ার হি ইজ।

কে-জির হাত ধরে টানলেন ভদ্রমহিলা, এসো আমাদের সঙ্গে, আলাপ করিয়ে দেবো ওঁর সঙ্গে!

কে-জি দেখলেন, তীরে দাঁড়িয়ে এক ইংরেজ তরুণ। পরণে জঙ্গী-পোষাক, কোমরবন্ধে পিস্তল। হয়তো, ডিউটির ফাঁকে ছুটি নিয়ে এসেচে মা-বৌকে রিসিভ করতে। পাশ্চাত্যে স্ত্রী মুখ্য, মা গৌণ। কাজেই সিঁড়ি বেয়ে তীরে নেমে ফোর্ড-স্ত্রী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামীর বুকে। বোঝা গেলো, নিবিড় আলিঙ্গন আর চুম্বনের ঘনিষ্ঠতার মাঝে জঙ্গী পোষাকের উঁচু পেতলের বোতাম আর চামড়ার বেল্ট হয়তো ততটা অসহনীয় নয়, যতটা অসহ্য বিরহবেদনা। কাজেই নির্বিঘ্নেই প্রথম সাক্ষাতের পালা শেষ হলে, পুত্র বৃদ্ধা মায়ের কাছে এসে তাঁর মুখ চুম্বন করলো।

কে-জি কাছেই দাঁড়িয়ে ধরার প্রেম ও ভক্তির ধারা দেখছিলেন, এমন সময় ফোর্ড-বধূ তাঁর স্বামীকে কে-জির কাছে নিয়ে এলেন: আমাদের বন্ধু মিঃ গস্!

বৃদ্ধা হেসে ছেলেকে বললেন, মাই ইণ্ডিয়ান সান্!

কে-জি উইলির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, সো নাইস টু মিট ইউ।

আর দেরি করা চলে না। সানিয়ালরা অনেকটা এগিয়ে গেচেন। ওঁদের সঙ্গ নেওয়া দরকার। বিশেষ করে চিত্ত মিত্রও ঐ দলে আছেন; বলেচেন, এর আগে নাকি সহরটা তাঁর দেখা আছে বার দুই। কাজেই তাঁর সঙ্গ নিলে অল্প সময়ে বেশি দ্রষ্টব্য দেখা যেতে পারে।

ফোর্ড পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে কে-জি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সানিয়ালদের দল ধরলেন।

সানিয়াল হেসে বললেন, কি হলো ওখানে?

কিছু না,—কে জিও হাসলেন: দুধে আমে এক হয়ে গেলো, আঁটি নিজের ঘাঁটিতে ছিটকে এসে পড়লো।

চিত্ত মিত্র শুনে বললেন, ঐ আঁটি আবার আঠার মতো লেগে

থাকে অনেক সময়। তবে কি জানেন, ওসব ট্যাকটিকস্ জানা চাই।...চলুন, বাঁ দিকের পথটা ধরি।

সামনেই ব্লক টাওয়ার। একটু এগোলেই দু'টো পথ গেচে ডাইনে-বাঁয়ে দু'ধারে। ডাইনের পথটা সহরের অলিগলিতে গিয়ে মিশেচে, বাঁ দিকের পথটা গেচে স্পেন-জিব্রলটরের সীমানায়।

জাহাজের যাত্রীদের বড় দলটা সহরে যাবার ডান দিকের পথ ধরলেনঃ আর সি. মিটারের নির্দেশে সানিয়ালরা বেঁকলেন বাঁ দিকে। বিরাট পাহাড়টার নীচে দিয়ে খানিকটা যেতে দেখা গেলো পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অনেকগুলো ফাঁক জানলার মতো।

সি. মিটার বললেন, ঐ যে দেখচেন ফোকরগুলো, ওগুলোর ভেতরে কামান বসানো, তাক করে আছে সমুদ্রের দিকে। চব্বিশ ঘণ্টা দূরবীন হাতে পাহারা দিচ্চে প্রহরী। শত্রু জাহাজের নিশানা পেলেই কমাণ্ডারের নির্দেশে কামানগুলো গর্জে ওঠে। এই জিব্রলটারে ইংরেজ সদা-সর্বদা তটস্থ। হবে না? ইংল্যাণ্ড যদি পেট হয়, তবে জিব্রলটার ইংল্যাণ্ডের কণ্ঠনালি। বাইরে থেকে মাল আনিয়ে গেলবার জন্যে এইটাই তো গলা কিংবা গলি।

একথা অনেকেরই জানা। আজ চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন সবাই।

আর একটু এগোলেই এয়ারপোর্ট। ফাঁকা জায়গাটুকুতে মিনিটে-মিনিটে ডানা-মেলা উড়ো জাহাজের আসা-যাওয়া, ধানের ক্ষেতে যেন পাখির মেলা।

সি. মিটার হেসে বললেন, দেখচেন তো নীল আকাশ আর নীল জলের উপর নীলচক্ষু ইংরেজের কী প্রখর দৃষ্টি।

আর একটু হাঁটতেই পাওয়া গেলো স্পেন-জিব্রলটার বর্ডার। একটি লোহার গেট, তার এপারে দু'জন ছ' ফুট লম্বা ইংরেজ পুলিশ আর ওপারে দু'জন সাধারণ মাপের স্পেন-প্রহরী। মাঝখানে বেড়া

রেখে চারজনই গল্প করচে আর কোন লরী এলে তার 'পাশ' দেখে খুলে দিচ্চে গেট।

সানিয়ালদের দল যেতেই ইংরেজ ছ'ফুটি এগিয়ে এলো, দিতে লাগলো কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তর। অবশ্য, সি, মিটার জানাতে ভুললেন না, তাঁর কাছে কিছুই অজানা নয়।

ইংরেজ পুলিশ আলাপ করিয়ে দিলো স্পেন-পুলিশদের সঙ্গে এবং করমর্দনের পরে দলের দু'তিনজন গ্রুপ ফটো তুলতে চাইলে, আশ্চর্য, আপত্তি করলো না প্রহরী চারজন। এমন কি, গলার কলার আর মাথার টুপি ঠিক করে নিয়ে তারাও দাঁড়ালো ক্যামেরার সামনে।

অর্থাৎ বোঝা গেলো, জায়গাটা আপাতত মারাত্মক নয়, তাই হরিহর আত্মা হওয়ায় বাধা নেই। পুলিশদের পলিশড্ আচরণে সবাই তাই মুগ্ধ হলেন।

সি, মিটার বললেন, এবার যাওয়া যাক সহরের দিকে।

তথাস্তু।

সবাই আবার ক্লক টাওয়ারের ধার দিয়ে সহরের যাবার পথ ধরলেন। জিব্রলটারের কড়া এবং চড়া রোদ্দুরে প্রায় সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবার সহরের গলির মধ্যে ছায়ায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মেন ষ্ট্রীট ধরে এগিয়ে তাঁরা প্রিন্স এডওয়ার্ড রোডে এসে পড়লেন; সেখান থেকে ইয়োরোপা রোডে। পাহাড়ের গা কেটে কেটে রাস্তা। সরু। লোকের ভিড়। সারি সারি দোকান, জিনিসে ঠাসাঠাসি। ঘন ঘন রেষ্টুরেণ্ট আর কফিখানা। এখানে নতুন লোক দেখলে পথ-চলতি মেয়ে-পুরুষরা হাঁ করে দেখে না, কারণ রোজই প্রায় তারা সাগর থেকে ফেরা লোক দেখতে পায় এই সহরে। বরং চঞ্চল হয়ে ওঠে দোকানীরা, দোকানের দরজায় এসে দাঁড়ায়, বিদেশীকে ডাকে, বলে, এসো, কিছু কিনে নিয়ে যাও,

জিব্রলটারের সুভেন্যির।

জিব্রলটারের জীবনযাত্রা টন্‌কো নয়, ঢিলেঢালা। পুরুষদের পোষাকে তেমন পারিপাট্য নেই, মেয়েগুলি পটের বিবি সাজে না। তবু তারা অপূর্ব লাবণ্যময়ী। কালো দুটি নয়নমণি, কালো কোঁকড়া চুল, মোমের মত দেহের গড়ন, অলিভ গায়ের রং।

সাগর-নগরের নাগরিকদের ঢেউ এসে ঢুকেচে জিব্রলটারের মাটির নগরে পথে-ঘাটে। তাই রাস্তা চলা দায়। যেন জোয়ারের জল। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ভাঁটা পড়বে। ঢেউ ফিরে যাবে সাগর-নগরের তীরে।

জিব্রলটারের মেন স্ট্রীটে তাই যত না অচেনা মুখ, তার চাইতে চেনা মুখের ছড়াছড়ি বেশি। ঐ তো মিঃ আর মিসেস হ্যারি গ্র্যাটন, ঐ যে কিরন্ময়ী বড়াই। লতিফ আর তার শপগার্ল বৌ এমা ব্রাউন ঢুকলো একটা দোকানে। রেভারেণ্ড হেওয়ার্ড একলাই ঘুরচেন। মিঃ মুঞ্জেশ্বর সপরিবারে দোকানের শো-উইণ্ডো দেখতে দেখতে চলচেন। আর, আর, ঐ যে এনাক্ষী রাও, সঙ্গে তাঁর কেবিন-মেট মিসেস হল্যাণ্ড।

গুডবাই। চললাম।--হঠাৎ সি. মিটার দল থেকে ছিটকে ছুটে গেলেন এনাক্ষী রাওয়ের কাছে।

তাঁর কাণ্ড দেখে হেসে উঠলেন দলের সবাইঃ চিয়ারো।

মিটার এনাক্ষী রাওয়ের পেছনে গিয়ে আস্তে করে টেনে ধরলেন তাঁর কাঁধে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগের ষ্ট্র্যাপটা। চমকে থমকে দাঁড়ালেন এনাক্ষী।

মিটার বললেন ইশারায়, এসো আমার সঙ্গে।

আর অনুমতির অপেক্ষা না করেই তাঁকে প্রায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিলেন পাশের রেষ্টুরেণ্টায়। নিজেও ঢুকলেন।

মিসেস হল্যাণ্ড জানতেও পারলেন না, তাঁর পেছনে কী ঘটে

গেলো। ভদ্রমহিলা আপন খেয়ালে কিছুটা এগিয়ে, হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো সঙ্গে মিস রাও নেই। এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন তিনি : মাই গ্যাড্, হোয়ার ইজ শি?

শি আর হি তখন দু'কাপ কফি আর দু'টো স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিয়ে পাশাপাশি বসে হি-হি করে হাসচেন।

আর মিসেস হল্যাণ্ডের অবস্থা দেখে সানিয়ালরাও দূরে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

ডাঃ সেন বললেন, দাড়ি আর সাড়ি একটু বাড়াবাড়ি করলে না?

সানিয়াল হাসলেন, আরে মশয়, একেই বলে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

কে-জি পাইপে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এ যেন, স্পেন থেকে জিব্রলটারকে আলাদা করে নিলো ইংরেজ।

রাইট, রাইট কে-জিদা।—রেজার খুব পছন্দ হলো কথাটা।

জঙ্গী-সহর জিব্রলটার তার হেড অফিস ইংল্যাণ্ডকে শিল্প-বিজ্ঞানের দিক থেকে এগিয়ে যেতে পারেনি। আর যাওয়ার কথাও নয়; তবে সময়ের দিক থেকে গ্রীনউইচ টাইমকে টেক্কা মেরে পুরো একটি ঘণ্টা এগিয়ে আছে।

জিব্রলটারে নামবার সময় যাত্রীদল তাদের ঘড়ি এক ঘণ্টা এগিয়ে রেখেছিলেন এবং সেই ঘড়িমত তাঁরা ষ্টিমলঞ্চে উঠে বসলেন।

নাও গো সাগর-নগর, তোমাদের লোকদের পৌঁছে দিয়ে গেলাম। ষ্টীমলঞ্চ 'বাতরি'র গা ঘেঁষে এসে বললো যেন।

সাগর-নগর তার নাগরিকদের গুণে গেঁথে নিয়ে হয়তো বললো, ধন্যবাদ। খানিকবাদে নড়ে উঠলো সাগর-নগর।

আবার যাত্রা শুরু। আকাশের সূর্য তখন পশ্চিমে হেলানো।

মিসেস দত্ত 'বাতরি' থেকে নামেন নি। যাননি জিব্রলটারে।

যিনি এখন সাত হাত জলে পড়েচেন, যাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেচে, তাঁর পক্ষে সাগর-নগরই যোগ্য স্থান, মাটির নগরে কার ভরসায় যাবেন?

তবু যেতে হবে মাটির সহরে। আর কয়েকটা দিন পরেই পা দিতে হবে ভারতের মাটিতে, ফিরে যেতে হবে বাংলা দেশে, হাওড়ায় নেমে ট্যাক্সি ভাড়া করে উঠতে হবে দর্জিপাড়ার গলির মধ্যে হলদে দোতলা বাড়িটায়। হাওড়ার ষ্টেশনে কতজন আসবে ফুলের তোড়া নিয়ে তাদের বিদেশ-প্রত্যাগত আত্মীয়-বন্ধুদের সাদরে বরণ করে নিতে। আর মিসেস দত্তের জন্যে? হয়তো আসবে কেউ, শুকনো মুখে, ব্যথিত হৃদয়ে—হাত ধরে তাকে কামরা থেকে নামাবার জন্যেই বুঝি। তাঁর বুকে তো মালা ঝুলবে না. বুকখানা জ্বালা করবে, জ্বলবে! ওঃ, ভাবাও যায় না।

মিসেস দত্ত সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানা ডেক চেয়ারে বসে আপন মনেই ভাবছিলেন। এই সাগর-নগর তো একদিন ছাড়তেই হবে! সেই ছেড়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই আজ প্রথম এই বাইরে আসা।

প্রায় সবাই জিব্রলটারে বেড়াতে গেচে, সাগর-নগর প্রায় জনশূন্য। সেই জন্যেই তিনি কেবিনের বাইরে এসে বসেছিলেন, চেয়েছিলেন নীল সমুদ্রের দিকে। কিন্তু কখন যে আবার সাগর- নগর ভরে গেচে, তার অলিতে-গলিতে, বার-এ, লাউঞ্জে দেখা দিয়েচে চাঞ্চল্য—তা তিনি বুঝতেই পারেন নি। এমন কি, তাঁর রুমমেট মিস ইলিয়টও যে কখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তাও খেয়াল করেন নি।

মিস ইলিয়ট পাশের ডেক-চেয়ারখানা টেনে বসবার উপক্রম করতেই ফিরে তাকালেন মিসেস দত্ত। ভদ্রতা হিসাবে ম্লান হাসলেন একবার।

মিস ইলিয়ট খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন, আ'ম সো গ্ল্যাড, ত্যাট য়ু আ' হিয়া!

মিসেস দত্ত বললেন, থ্যাংকু।

মিস ইলিয়ট কথাবার্তার সূত্র ছাড়লেন না :

চমৎকার সন্ধ্যা। না ?

হুঁ।

জিব্রলটার টাউনটি ভারি চমৎকার। নীট এণ্ড ক্লীন!

আই সি।

আপনি গেলে পারতেন।

ইচ্ছা হলো না।

এবার মিস ইলিয়ট আসল কথায় এলেন : আপনার শরীর কি অসুস্থ ?

না।

তবে ?—আচ্ছা থাক।

এবার ভেঙে পড়লেন মিসেস দত্ত। ভাঙা হৃদয়টুকু গুমরে গুম্ হয়েছিলো, এক দরদী সঙ্গিনীর সহানুভূতির ছোঁয়াচ লেগে খান্-খান্ হয়ে ভেঙে গেলো যেন। বাজ-পড়া মানুষ নাকি এমনিই আড়ষ্ট হয়ে থাকে, আর মানুষের ছোঁয়া পেলেই নেতিয়ে পড়ে।

মিসেস দত্তর দু'গাল বেয়ে চোখের জল গাড়িয়ে পড়ছিলো। রুমাল দিয়ে তা মুছে নিয়ে বললেন, মিস ইলিয়ট, য়ু আর সো কাইণ্ড টু মি—আমি বলবো আমার ট্র্যাজেডি। হয় তো তাতে বুকখানা আমার হাল্কা হতে পারে!

মিস ইলিয়ট বললেন, যদি মনে ব্যথা পান তো থাক্।

এবারও ম্লান হাসলেন মিসেস দত্ত : ব্যথা ? চরম ব্যথা যা পাবার তা পাওয়া হয়ে গেচে মিস ইলিয়ট্, আর ব্যাথার ভয় করিনে। আমি বলবো—

মিসেস দত্ত গালে হাত রেখে বলতে লাগলেন, মাত্তর সাতদিন আগে আমি এই পথে গেছলাম তোমাদের দেশে বহু আশা-ভরসা

বুকে নিয়ে। কিন্তু ভয়ে-ভাবনায় দুলছিলাম সেই জাহাজখানার মতই। সে ভয়-ভাবনার সমাপ্তি দিয়ে এসেচি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে।

তার মানে ?

স্বামীকে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে রেখে ফিরে যাচ্চি নিজের দেশে। ওখানেই তাঁর মাটি কেনা ছিলো, ওখানের মাটির কোলেই তিনি শান্তি পেলেন। তাঁর অশান্ত মন তোমাদের দেশে একটু শান্তি একটু সুখের জন্যে ছোটাছুটি করেচে, আমরা তাঁকে সুখ-শান্তি কিছুই দিতে পারিনি। প্রথম জীবনে ইংল্যাণ্ডে পড়তে এসে সাত বছর কাটিয়ে গেছলেন, আমার শাশুড়ীর কাছে শুনেচি। তাঁর বেহিসেবি খরচ জোগাতে বিধবা শাশুড়ীকে দু'খানা বাড়িই বেচতে হয়েছিলো। তারপর পয়সা অভাব হওয়ায় ফিরে আসেন তিনি ভারতে এবং তাঁর রাশ টেনে ধরবার ভার পড়ে আমারই ওপর। কিন্তু পারলাম কই ?

মিসেস দত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন।

মিস ইলিয়টও চুপ করে রইলেন।

মিসেস দত্ত একটু পরেই শুরু করলেন আবার : নতুনের মোহে পড়ে কয়েকটা বছর তিনি শান্ত শিষ্ট হয়েই আর পাঁচজনের মত সংসার ধর্ম করলেন। কখনো চাকরি করলেন, কখনো ব্যবসা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ইংল্যাণ্ডে বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়ে যে অর্থ তিনি নষ্ট করেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের শেখা বিদ্যায় তার একাংশও তিনি ঘরে আনতে পারলেন না ; অথচ আমাদের সংসারে এলো আর একটি পোষ্য, আমাদের খোকন। অবশ্য কয়েক মাস পরেই তার জন্যে স্থান ছেড়ে দিয়ে পুরোন পোষ্য আমার শাশুড়ী পরলোক গমন করলেন। লক্ষ্য করেছিলাম, আমার প্রতি স্বামীর মোহ ক্রমে কেটে আসছিলো বটে, তবে খোকনের মায়ায় বাঁধা পড়েছিলেন মাত্র কয়েকটা বছরের জন্যে। কিন্তু প্রায়ই বলতেন, এখানে থেকে আমার কিছুই হবে না। এখানে মানুষের কদর মানুষ বোঝে না। আমি

আবার ইংল্যাণ্ডে যাবো। তারপর একবার—একবার আমি খোকনকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে বাপের বাড়ি গেচি, হঠাৎ সেখানে চিঠি পেলাম, বম্বে থেকে তিনি লিখচেন, ভাগ্য অন্বেষণে আবার ইংল্যাণ্ডে যাচ্চি। ক্ষমা করো।

আশ্চর্য তো!—মিস ইলিয়ট বলে ফেললেন।

এ সংসারে কিছুই আশ্চর্যের নয় মিস ইলিয়ট।—মিসেস দত্ত বললেন, নইলে আমার এই ইংল্যাণ্ডে যাওয়া-আসা কী কম আশ্চর্যের? হ্যাঁ, যা বলছিলাম : স্বামী ইংল্যাণ্ডে পোঁছে মাঝে মাঝে চিঠি দিতেন এবং কালেভদ্রে কিছু টাকা পাঠাতেন। কিন্তু বছরখানেক পরে চিঠি বা টাকা দুই বন্ধ হয়ে গেলো। বুঝলাম, আবার তাঁর পুরোন রোগ নতুন করে দেখা দিয়েচে। আর আমার ধারণাও সত্যি—সে খবর ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসা কয়েকজনের কাছ থেকে কানাঘুষো জানাও গেলো। তাঁকে নাকি অনেকেই বার-এ বা নাইট ক্লাবে দেখেচেন এবং কোন বান্ধবী সহ।

ইজ ইট? আ, রিয়েলি ভেরি সরি।--মিস ইলিয়ট বললেন।

আপনারা এ ক্ষেত্রে কি করতেন মিস ইলিয়েট?—সহজ গলায় প্রশ্ন করলেন মিসেস দত্ত।

ন্যাচারালি ডিভোর্স স্যুট ফাইল করতাম।

ডিয়ার, এইখানেই তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাত।—আর একবার ম্লান হাসলেন মিসেস দত্ত : তোমরা এ ক্ষেত্রে যখন উকিল ব্যারিষ্টারের বাড়ি যাও, আমরা তখন 'শক' খেয়েও স্বামীর সখকে মেনে নিয়ে চঞ্চল মনকে থাবড়ে থুবড়ে ঠাণ্ডা করি। পতি আমাদের দেশে পরম গুরু, তোমাদের মত ফ্রেণ্ড নয়। অতএব প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম, ভগবান, আমার স্বামীকে সুমতি দাও। কিন্তু ঈশ্বরের মতি-গতি বোঝা ভার। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এলো মিডলসেক্স হসপিটাল থেকে। হাউস-সার্জেন

টেলিগ্রাম করচেন : কাম্ শার্প। মিঃ ডাট ওয়ান্টস ইউ। কণ্ডিসান আলার্মিং।

মিঃ ডাট ওয়ান্টস মি। রোগশয্যায় স্বামী আমাকে স্মরণ করেচেন। মধুলোভী বান্ধবীদের আর হয়তো দেখা নেই। বিপদে আমাকেই তিনি আশা করেচেন। কিন্তু কেন যাবো? না, যাবো না। অভিমান দেখা দিলো। কিন্তু আশ্চর্য, ক্ষণেক পরেই সে অভিমান দূরে সরিয়ে দিয়ে দেখা দিলো স্ত্রীর ভালবাসা। আমার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠলো। আমি টেলিগ্রাম হাতে করে ছুটলাম আমার আত্মীয়স্বজনের বাড়ি-বাড়ি। তাঁরা সাহায্য করলেন; সবাই পরামর্শ করে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন ইংল্যাণ্ডগামী প্রথম জাহাজেই। মনে অসীম সাহস দেখা দিলো। অসীম সাহসে পাড়ি দিলাম আমার পরম প্রিয়জনের কাতর আহ্বানে;

পৌঁছুলাম ইংল্যাণ্ডে। স্টেসন থেকে নেমে সোজা গেলাম হসপিটালে। কী ভাবে যে গেলাম, কেমন করে গেলাম—আজ তা ভাবতেও পারিনে। সামনেই দেখতে পেলাম একটি নার্সকে। বললাম তাকে আমার আগমনের কারণ। নার্সটি আমাকে ওয়েটিং-রুমে নিয়ে গিয়ে বসালো, এবং একটু পরেই একজন ম্যাট্রন এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো একটি ছোট ঘরে। দেখলাম, ঘরে শুয়ে আছে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি দেহ। ম্যাট্রন মুখের ঢাকাটা খুলে দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, মিঃ ডাট পাস্‌ড এওয়ে ওনলি হাফ এন আওয়ার এগো। আ'ম সো সরি ফর য়ু মিসেস ডাট্।

দেখলাম যেন ঘুমিয়ে আছেন। আশ্চর্য, আমি কেঁদে উঠলাম না। শুধু মনে হলো, কোথায় আমার দেরি হলো। সামান্য আধঘণ্টা দেরি! এত হাজার মাইল ছুটে এলাম, অথচ হে ভগবান, তুমি মাত্র আধঘণ্টা দেরি সইতে পারলে না!

মিস ইলিয়ট দেখলেন, মিসেস দত্ত রুমালে চোখ মুছচেন। যে

অশ্রুজল সহসা রুদ্ধ হয়ে গেছলো, আজ ক'টা দিন পরে তা যেন বাঁধ ভেঙে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়চে।

মাই গ্যড! মিস ইলিয়ট ভাবলেন: হাউ সারপ্রাইজিং! এই মহিলা ইংল্যাণ্ডে স্বামীকে হারিয়ে ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাচ্ছেন; আর আমি যাচ্ছি ইংল্যাণ্ড থেকে ভাবী স্বামীর কাছে! আসচে মাসে ডেলহীতে উইলির সঙ্গে তাঁর বিয়ে।

রুমালে চোখের জল মুছে মিসেস দত্ত বললেন, মিস ইলিয়ট, এখন আমি কী ভাবচি জানেন?

কি?

আমি যখন আসি, খোকন জিগ্যেস করেছিলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো মা? বলেছিলাম তোমার বাবাকে আনতে যাচ্ছি। এখন সে জিগ্যেস করলে কি বলবো তা ভেবে পাচ্ছিনে। ছেলে এতদিন পিতৃহীন ছিলো, আজ সে পিতৃহারা হলো। তাই না?

মিস ইলিয়ট চুপ করে রইলেন। কী উত্তর দেবেন!

সাগর-নগর 'বাতরি' এখন ভূমধ্যসাগরের জল কেটে চলেচে। উত্তর সাগরের উত্তুরে হাওয়া এখন অনেকটা কম। তাই সাগর-নগরের অনেকেই সন্ধ্যার পরও খানিকটা সময় বাইরে ডেক-চেয়ারেই কাটাচ্চে।

'বাতরি'র মুখ পূবের দিকে। তার বাঁ দিকে শ্বেতাঙ্গদের দেশ ইয়োরোপ, ডাইনে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্মভূমি আফ্রিকা। অনেকেই ভেবে-ছিলো রাত পোহালে দিব্যি দুধারের সাদা কালো তীর দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। কিন্তু ম্যাপের সরু ভূমধ্যসাগরটার সঙ্গে বাস্তব ভূমধ্যসাগরের ফারাকটা যে অনেক, সেটা বোঝা গেলো পরদিন সকালে।

দেখা গেলো, চারধারেই শুধু জল, আর জল। স্থলচিহ্ন কোথাও

নেই। বিরাট অতলান্তিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে এই এক ফালি ভূমধ্যসাগরের কোন তফাত নেই। ইনিও বুঝি অসীম, অতল।

মাটির নগরে যদি বাঙালিপাড়া থাকে, সাহেবিপাড়া থাকে, তবে সাগর-নগরেই বা থাকবে না কেন? যদি মানুষের সমাজে উঁচু-নীচু দুই শ্রেণী থাকে তবে সাগর-নগরেই বা থাকবে না কেন? সাগর-নগরেও দুটি শ্রেণী আছে: টুরিস্ট ক্লাস আর ফার্স্ট ক্লাস।

তবে টুরিস্ট ক্লাসে যেমন হৈ হৈ. ফার্স্ট ক্লাসে তেমন কই? সবাই মুখ বুজে বই পড়েন, না হয় মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন। অথবা ডেক-চেয়ারে বসে সমুদ্রের ঢেউ গোণেন। অবশ্য একসঙ্গে আঠারো দিন একই জায়গায় কাটাতে হলে সকলে আঠার মত লেগে না থাকলেও অন্তত কথাবার্তা তো বলতে হয়। তাই তাঁরা আলাপ পরিচয় করেন, নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে। চেপে চেপে কথা বলেন, মেপে মেপে হাসেন।

তবে ফার্স্ট ক্লাসে আরামটা আরোও বেশি। বিছানার গদিটা আরো পুরু, আরো নরম। চাদর, ঝালর আরো ভালো। ঘরের আর্শিটা আরো বড়। বেসিনটা আরো দামি। তোয়ালেটাও বেশ বড়। আলোটাও খুব বাহারি। তাছাড়া বেডরুমের সঙ্গে বাথরুম। অনেক সুবিধে।

এবং খাওয়ার পরিমানটা বেশি না হোক (বেশি দিলেও খেতে পারেন না ওঁরা) রকমটা কিন্তু বেশি। তার চাইতেও বেশি টেবিল সাজাবার ভড়ং। দামি টেবিল ক্লথ। দামি ক্রেকারি, দামি ছুরি কাঁটা চামচ। ফার্স্ট ক্লাসের দামি লোকেদের জন্যে দামি ফাস্ট ক্লাস সব জিনিস।

ওঁরা বেশি পয়সা দিয়েচেন বেশি আরাম পাবেন বলে; কিংবা বেশি মাথা ধরে বলে। বিশেষ করে লোকের হৈ-হৈ গোলমাল অনেকেই সহ্য করতে পারেন না। বেশি ঘেঁষাঘেঁষি, মেশামেশি অনেকেই

পছন্দ করেন না। ওঁরা সীমার মাঝে অসীম হয়ে বাজান আপন সুর।

তাই ফার্স্ট ক্লাসের অবস্থাটা কলকাতার থিয়েটার রোডের মতন। অনেকটা জায়গা নিয়ে গেট বন্ধ করে দারোয়ান বসিয়ে নিজেরা ভিতরে বসে আছেন ফুলের বাগান সাজিয়ে। কারোর সঙ্গে আলাপ নেই, পাশের বাড়ির সঙ্গেও নয়। কিন্তু যাও গড়পাড়ায় বা দর্জিপাড়ায়, দেখবে সন্ধ্যার পরে সব বসে গেচে খালি গায়ে লুঙ্গিটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে। আড্ডা জমিয়েচে। সব খুড়ো-ভাইপো, দাদা-ভাই, মামা-ভাগ্নে পাতানো। যেন এক একটা পুরো পরিবার।

ফার্স্ট ক্লাসে আছেন স্বামী জ্ঞানানন্দ। মাদ্রাজী ভদ্রলোক। বিবেকানন্দ সোসাইটির একজন হর্তাকর্তা। টেনে টেনে বাংলা বলেন। পরনে গেরুয়া বসন। সৌম্য শান্ত চেহারা।

প্রৌঢ়া মিসেস হোর যাচ্ছেন করাচী। ভদ্রমহিলা নাকি স্যার সামুয়েল হোরের নিকট-আত্মীয়া। চোখে একটু কম দেখেন, তবে দূরদৃষ্টি খুবই। ইংল্যাণ্ডের একজন শ্রদ্ধেয়া সমাজ সেবিকা।

তাছাড়া কনষ্টান্স ডাচেস অব ওয়েষ্টমিনিষ্টারও এই সাগর-নগরকে ক'দিন ধন্য করে গেচেন। অপূর্ব সুন্দরী, স্থির যৌবনা। জিব্রলটারে নেমে গেচেন তিনি।

কর্ণেল গ্র্যাণ্ট-স্যুটি এবং তাঁর স্ত্রী, মিঃ জে. টি. উইলস এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র কন্যারা, মিসেস এম, স্মিথ এবং তাঁর কন্যা, মিঃ এবং মিসেস আর. এল, রালফ এবং এক বাঙ্গালী পরিবারও আছেন মিঃ এন, চৌধুরী এণ্ড হিজ ফ্যামেলি।

ওঁরা দূরে থাকেন, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন। ওঁদের সঠিক পরিচয় পাওয়া শক্ত।

টুরিস্ট ক্লাসে লাউঞ্জে বসে মিষ্টার ও মিসেস গ্র্যাটন এবং ডাঃ মহাবিষ্ণু সেন গল্প করছিলেন।

কথায় কথায় প্রকাশ পেলো, ইংরেজ দম্পতি নাকি বম্বে পর্যন্ত গিয়ে আবার এই জাহাজেই দেশে ফিরবেন। শুনে ডাঃ সেন অবাক হলেন, সেকি! ইণ্ডিয়া দেখবেন না?

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই এ-ওঁর মুখের দিকে চেয়ে নিলেন একবার এবং মিসেস গ্র্যাটনই ঢোঁক গিলে বললেন, মানে, ইচ্ছে ছিলো ইণ্ডিয়া দেখবার, কিন্তু শুনেচি—প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড, ইণ্ডিয়ানরা নাকি ব্রিটিশারস্‌দের এখন তেমন পছন্দ করে না।—এবং আরো সব তথ্য যা তিনি ষ্টকওয়াইভস ক্লাবে তাঁর ভারত-বিদ্বেষিনী বান্ধবী মিসেস স্যামসনের কাছে শুনেছিলেন, সবই চেপে গেলেন।

ডাঃ সেন বললেন, আপনারা ভুল খবর পেয়েচেন। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ ছিলো, ব্রিটিশ জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়। মিঃ এটলির চেষ্টায় আমরা স্বাধীনতা পেয়েচি, তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আমাদের কাছে প্রিয়পাত্র। লর্ড পেথিক লরেন্সকে আমরা ভারতবন্ধু হিসেবেই জানি। তাছাড়া আমি নিজে ইংল্যাণ্ডে বহু লোকের সঙ্গে মিশেচি এবং বুঝেচি তাঁরা অনেকেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থনই করেচেন। মিসেস গ্র্যাটন, আপনি বিশ্বাস করবেন কি, শাসকমণ্ডলী আর জনসাধারণ দুটি আলাদা জাতের!

মিসেস বললেন, ও, উই আর সো সরি! উই য়্যাব বীন রংলি ইনফর্মড্।

মিঃ গ্র্যাটন বললেন, আমরা শুনেচি, ইণ্ডিয়ায় এখনো বাঘ-সাপের উপদ্রব আছে, ক্যানিবলস আছে, তোমরা নাকি পুতুল পূজো করো, তোমাদের লর্ড কৃষ্ণা—নাকি—

আ, ডিয়ার, প্লীজ স্টপ।—মিসেস লজ্জা পেয়ে মুখর স্বামাকে মূক হবার অনুরোধ জানালেন।

কিন্তু ডাঃ সেন ব্যাপারটা সব বুঝলেন। বুঝলেন, কোন 'ভারত-

হিতৈষী' তাঁদের ভুল খবর দিয়েচেন, তাঁদের ভয় পাইয়ে দিয়েচেন।

বললেন, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, যিনি আপনাদের এই সব বলচেন, আমার মনে হয় তিনি ইণ্ডিয়ায় আসেননি, কিংবা তিনি নিজেই ইণ্ডিয়ার বিষয়ে সঠিক খবর রাখেন না। আমার উচিত, অ্যাজ য়্যান ইণ্ডিয়ান আপনাদেরকে সঠিক বিবরণ দেওয়া।

মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন প্রায় একবাক্যে বললেন, ও, উই উইল বি সো গ্ল্যাড টু হিয়ার এবাউট ইণ্ডিয়া!

ডাঃ সেন বললেন, ইণ্ডিয়ায় বনজঙ্গল আছে। বাঘ সাপ সেখানেই থাকে, সহর বাজারে থাকে না। বিরাট দেশ আমাদের। বহু বড় বড় সহর, পাকা পথঘাট অনেক। বম্বে, ক্যালকাটা, ডেলহী, ম্যাডরাসকে তোমাদের ইয়োরোপের বহু সহরের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। ক্যালকাটার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেতে বাসে প্রায় দুটি ঘণ্টা সময় লাগে এত বড় সহর। ইণ্ডিয়ায় ইস্ট থেকে ওয়েস্ট বা নর্থ থেকে সাউথে যেতে ট্রেনে প্রায় দু'দিন দু'রাত হয় কাটাতে।

রিয়েলি!

ইয়েস! তাছাড়া দেশটায় চমৎকার হিল-বিউটি, সী-সাইডস্, ক্যানালস্, হিষ্টরিক্যাল মনুমেণ্টস, ওয়ালর্ড-ফেমাস টাজ্ মহল, অজাণ্টা, এলোরা অনেক কিছুই দেখবার আছে। তাছাড়া আমাদের দেশে যে নোংরামি আছে, তা সবই আপনাদের ব্রিটিশ আমলেরই তৈরী। আমাদের উন্নতির দিকে, শিক্ষার দিকে তাঁরা দেখেননি, তাঁদের লক্ষ্য ছিলো আমাদের শাসন করা ও শোষণ করা! আর ক্যানিবলসের কথা বললেন, আই লাইক টু ইনফর্ম ইউ-- মানুষ খেকো বন্যজাতি আফ্রিকায় আছে, ইণ্ডিয়ায় নয়।

ও, উই আর সো সরি!--সত্যই বোধ করি লজ্জা পেলেন তাঁরা।

ডাঃ সেনের ততক্ষণে আবেগ এসে গেচে মনে। বললেন, হ্যাঁ,

আমরা পুতুল পূজো করি। আপনারাও তো লর্ড যীশাসের মূর্তি পূজো করেন, কীর্তিমান পুরুষদের ষ্ট্যাচুতে মাল্য দান করেন। আসল কথা কি জানেন? কাল্পনিক কিছু ভেবে নেওয়ার চাইতে বাস্তব কিছু চোখের সামনে রেখে তারই মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রার্থনা করা আরো সহজ, আরো সোজা। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের একটি ঘটনা বলি: ইণ্ডিয়ারই এক রাজা তাঁকে বলেছিলেন, পুতুল পূজো করার কোন মানে হয় না। স্বামিজী ঘরে রাজার বাপের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, ঐ ছবিটা কাউকে নামাতে বলুন। রাজার আদেশে ছবিটা নামানো হলো। স্বামিজী বললেন, ঐ ছবিটার উপরে থুতু ফেলুন। শুনে রাজা গেলেন চমকে: আমার বাবার ছবি, আমি কি করে পারি? তখন স্বামিজী বললেন, কেন? ওটা তো নেহাতই একটা ছবি। ওর মধ্যে তো আপনার বাবা নেই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রাজা স্বামিজীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন, বুঝলেন নিজের ভুল। আশাকরি আপনারাও বুঝেচেন।

ইট ইজ সো-ও ইন্টারেষ্টিং!

ডাঃ সেন বললেন, এই স্বামিজীই পরে আমেরিকায় গিয়ে হিন্দু-ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং তোমাদের দেশেরই একটি মেয়ে সিষ্টার নিবেদিতা আমাদের দেশে আজ প্রাতঃস্মরণীয়া, শ্রদ্ধেয়া।

ডাঃ সেন আরো বলতে লাগলেন, আর লর্ড কৃষ্ণের কথা যা মিঃ গ্র্যাটন বলতে যাচ্চিলেন তা আমি জানি। দেখুন, ওসবের অনেক আধ্যাত্মিক মানে আছে। সব রূপক ব্যাপার। আর, আপনাদের ভার্জিন মেরীও তো লর্ড যীশাসকে জন্ম দিয়েছিলেন। এরও এক্সপ্লানেশন আছে হয়তো। আসল কথাটা হচ্চে, সব ধর্মেরই নিজস্ব মতবাদ আছে, লক্ষ্য আছে, ব্যাখ্যা আছে। তা নিয়ে না বুঝে সমালোচনা করা মূর্খতা। জানেন না বোধহয়, আমাদের ঐ স্বামিজীর মন্ত্রগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু হয়েও ক্রীশ্চান ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের

সাধনা করেছিলেন এবং প্রচার করেচেন যীশু, আল্লা, রাম সবই এক। যে কোন পথেই মোক্ষ-লাভ করা যায়।

আশ্চর্য!—মিসেস গ্র্যাটন বললেন, আপনাদের হিন্দু ধর্মের উদারতা লক্ষ্য করবার বিষয়।

আর আপনি অতি শক্ত ব্যাপারটা অতি সহজ করে আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ায় আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। ইজণ্ট ইট্ ডিয়ার?—বললেন মিষ্টার।

অ' কোর্স।—ডাঃ সেন আমাদের দিব্যজ্ঞান দিলেন।

ডাঃ সেন বললেন, আপনাদের ভ্রান্ত ধারণা আশাকরি আমি দূর করতে পেরেচি।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।—দুজনেই বললেন, ইণ্ডিয়া দেখবার প্রোগ্রাম আমরা রিজেক্ট করে কী ভুলই করেচি!

মিঃ গ্র্যাটনের এ মন্তব্য এবার কিন্তু আন্তরিকই।

মিসেস গ্র্যাটন মনে মনে ঠিক করলেন, হোম-এ ফিরে গিয়ে ক্লাবে সবার সামনে মিসেস শ্যামসনকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবেন। হুঃ! এখন ইণ্ডিয়ার বম্বেটুকু দেখেই সাধ মেটাতে হবে।

লাউঞ্জ থেকে ডাইনিং রুমে যাবার করিডরে সি. মিটারের সঙ্গে সানিয়ালের দেখা হয়ে গেলো।

এই যে মিটার সাহেব! জিব্রলটারে আপনার রাইটিকে তো দেখলাম ভাগিয়ে নিয়ে রেঁস্তোরায় ঢুকলেন. তারপর?

তারপর আর কি?—চিত্ত মিত্র তাঁর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, কিছু গাঁটগচ্ছা গেলো, কেক কফি, জিব্রলটারের সুভ্যেনির ইত্যাদি।—হেসে বললেন, অর্থাৎ মন্দিরের প্রবেশ-দক্ষিণা আগাম দিয়ে রাখলাম!

বটে। বটে। পারের কড়ি তড়িঘড়ি দিলেন তবে? খুব

হিসেবি লোক তো!

মিটার বললেন, এসব ব্যাপারে বেহিসেবি হওয়া মানেই বেহাত করা। বলি, বেড়ালের ইঁদুর ধরা দেখেচেন?

তা দেখেচি বৈকি?

এও ঠিক বেড়ালের ইঁদুর ধরার ব্যাপার! মারবার আগে খেলাতে হয়, এখন খেলাচ্চি!

সানিয়াল বললেন, কিন্তু এটা ভালো হচ্চে কি?

তার মানে?—মিটার বললেন, বেড়াল ইঁদুর দেখলে লোভ সামলাতে পারে না. আর ইঁদুর গর্তে থাকলে বেড়াল তাকে ধরতে পারে? চলুন, বার-এ গিয়ে বসিগে।

চলুন।

দু'জনে বার-এ গিয়ে দু'গেলাস বীয়ার নিয়ে বসলেন। একচুমুক খেয়ে মিটার রুমাল দিয়ে গোঁফটা মুছে বললেন, দেখুন স্যার, কোনটি মরবার জন্যে হ্যাঁ করে আছে, তা আমরা এক নজরেই বুঝতে পারি। শুধু একটু কথার খেলায় খোলস তাদের আলগা হয়ে যায়। এনাক্ষী রাওটি বুভুক্ষু। এখন আমি সরে গেলেও, ও সরে আসবে আমার কাছে। ওর হাব-ভাব, ভাষা ভঙ্গী সেই রকমই ইঙ্গিত দিয়েচে। তবে এও বলে রাখি মিঃ সানিয়াল, সব মেয়েই এনাক্ষী রাও নয়, এবং তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁদের কাছ থেকে আমরা সরেই থাকি।

শুনে সুখী হলাম মিঃ মিটার!—সানিয়াল হাসলেন।

এমন সময় সেখানে দেখা দিলেন পাইপ-ফোঁকা কে-জি: এখানে বসে কি হচ্চে দু'জনের?

সানিয়াল বললেন, বেড়ালের ইঁদুর ধরার গল্প হচ্চে। বসুন। এক গেলাস হবে নাকি?

ধোঁয়া ছেড়ে কে-জি বললেন, আপত্তি নেই।

সি. মিটার বললেন কে-জিকে ঃ সেদিন আপনি জাতকের গল্পটা শুনে বড় মর্মাহত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, মরবিড এবং আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম, আপনার ক্ষত হৃদয়ে মলম লাগাবার। মনে আছে ?

কে-জি বললেন, আছে। কথা রাখবার জন্যে আগেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্চি।

সানিয়াল বললেন গেলাসে একটা চুমুক দিয়েঃ মিঃ মিটার আসলে প্রমাণ করতে চান, তিনি নারীর শ্রাদ্ধ করতেও যেমন পেছপা নন, তেমনি নারীকে শ্রদ্ধা করতেও জানেন !

মিটার গেলাসে আর এক চুমুক দিয়ে রুমালে গোঁফ মুছে বললেন, ঠিক বলেচেন। শুনুন, এই গল্পটাও জাতকেরই। পর্নিক জাতকের গল্প—

এমন সময় কে-জির বীয়ারের গেলাস টেবিলে আসতেই তিনি তাতে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, হ্যাঁ বলুন। আমার ক্ষত হৃদয়ে মলমটুকু লাগান।

মিটার শুরু করলেন, পর্নিক নামে এক বণিকের রূপবতী নামে এক কন্যা ছিলো। কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হলে বণিক তার জন্যে সংপাত্রের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হলো, আমার কন্যা যুবতী, সুন্দরী, কিন্তু সে যে সুচরিত্রা, তা কী করে জানা যায় ? যদি আমার কন্যা অসচ্চরিত্রা হয় এবং তাকে আমি পাত্রস্থ করি, তবে আমি মহাপাতক হবো, সন্দেহ নেই।

সানিয়াল হেসে বললেন, আচ্ছা বাবা তো ?

কাজেই—মিটার বলতে লাগলেন, বণিক একদিন তাঁর কন্যা রূপবতীকে বললেন, আমাকে বিশেষ কাজে কাছেই একটি সহরে যেতে হবে, অথচ আমার শরীর বড় দুর্বল। তবে তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে ভরসা পাই। কন্যাটি রাজি হলো এবং পর্নিক

কন্যাকে নিয়ে রওনা হলেন। ক্রমে তাঁরা একটি গভীর বনে পৌঁছুলেন। সেখানে ঝরণার ধারে এসে বণিক বললেন, জায়গাটি নির্জন এবং মনোরম, এসো এখানে বিশ্রাম করি। বণিক সবুজ ঘাসের উপর নিজের দেহ এলিয়ে দিয়ে কন্যাকে তাঁর পাশে বসিয়ে বললেন, দেখো রূপবতী, তোমাকে আজ একটি কথা বলতে চাই—

বলুন পিতা—

তুমি বুদ্ধিমতী। তুমি নিশ্চয়ই দেখেচো. ফুল তার রূপ গন্ধ সবাইকে বিতরণ করে, কোন বিচার করে না।

রূপবতী পিতার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললো, সে তো সবাই জানে কিন্তু একথা কেন পিতা?

বণিক বললেন, রূপবতি, আমি তোমার অসামান্য রূপে মুগ্ধ! তোমাকে আজ—

বণিক রূপবতীর হাত ধরতে গেলেন. কিন্তু রূপবতী এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দৌড়ে পালাতে গিয়েও পারলো না। ভয়ে বিস্ময়ে তার শরীর কাঁপছিলো; সে কাছেই একটা জায়গায় বসে পড়লো।

বণিক তার কাছে এসে বললেন, দেখ রূপবতী, এই নির্জন গহন অরণ্যে কিছুই প্রকাশ হবার সম্ভাবনা নেই—

তখন রূপবতী তার জলে-ভেজা পদ্মের পাঁপড়ির মত দুটি সজল চোখ মেলে বললো, পিতা, এ যে স্বপ্নাতীত! জল থেকে আগুনের উৎপত্তির মতই অসম্ভব। আপনি ক্ষান্ত হোন।—বলেই রূপবতী তার পিতার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

বণিক তখন সস্নেহে তাকে তুলে ধরে বললেন, কন্যে রূপবতি, আমার সন্দেহ আজ দূর হলো। তোমার চরিত্র পরীক্ষা করবার জন্যেই আমার এই আয়োজন। তোমার চরিত্রবল দেখে আমি প্রীত হয়েচি। চলো বাড়ি যাই।

বণিক ফিরে এসে পরম উৎসাহে সৎপাত্র দেখে ধুমধাম করে কন্যার বিবাহ দিলেন।—কী, কেমন গল্প ?

কে-জি আর সানিয়াল, দুজনেই গল্প শুনতে শুনতে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে গেছলেন যেন। প্রায় একযোগে বলে উঠলেন, চমৎকার!

মিটার বললেন, অর্থাৎ এই কথাই বোঝা গেলো, নারীমাত্রেই নরকের দ্বার নয়।

কে-জি বললেন, আমারও তাই মত্।

সানিয়াল ঠোঁটকাটা। বললেন, ভূতের মুখে আজ রামনাম শুনে অত্যন্ত সুখী হলাম।

মিটার হাসলেন, আমিও আপনাদের সুখী করতে পেরে অত্যন্ত খুশি।

এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন রেজা ঃ কী হচ্চে এখানে ?

সানিয়াল বললেন, দেখতেই তো পাচ্চো, আপাতত রসস্থ!

কিন্তু নীরস কিছু দেখতে চান ?—রেজা প্রশ্ন করলেন।

কী রকম ?—কে-জি কৌতুহলী হলেন।

আমরা জাহাজের ইঞ্জিনরুম দেখতে যাচ্চি। আমি, ডাঃ সেন, মিঃ রায়, চ্যাটার্জি এবং একটি জার্মান ছেলে হের এইটেল!

সানিয়াল বললেন, এই এঁটেল মাটিটিকে আবার জড়ালে কী করে ?

জড়িয়ে গেলো।

মিটার বললেন, তা তো যাবেই। জার্মান-জন যন্ত্র দেখতে চঞ্চল হবে, এতে আর আশ্চর্যের কি ?

রেজা বললেন, পার্শার আফিসে সবাই জড়ো হয়েচে, আমি আপনাদের ডাকতে এলাম।

সানিয়াল সোফায় দেহটা আরো খানিকটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, কিন্তু ইঞ্জিন দেখে কী হবে ? জাহাজটা চলচে, এটাই তো বড় কথা। কী করে চলচে, তা দেখে লাভটা কি ? বরং ওর চাইতে আর এক গেলাস করে হোক। কী বলুন ?

কিন্তু কে-জি বললেন, অত ব্যালান্স শীট খতিয়ে দেখতে গেলে এ জগতে অনেক কিছুই অদেখা থেকে যায়। তার চাইতে চলুন বরং দেখে আসা যাক—বিশেষ করে চান্স যখন পাওয়া গেচে।

রেজা বললেন, ঠিক বলেচেন কে-জিদা ; আমরা পার্শার অফিসে গিয়ে সবাই বলতে, ওরা রাজী হয়েচে। বললে, যাঁরা-যাঁরা যাবেন, পার্শার অফিসের সামনে গিয়ে জড়ো হতে।

মিটার বললেন, চলুন যাওয়া যাক। দেখবার জিনিস।

তবে তাই হোক।—সানিয়াল সোজা হয়ে বসলেন।

গেলাস শেষ করে সবাই চললেন রেজার সঙ্গে পার্শার অফিসের সামনে।

চিফ পার্শার মিঃ এন্‌ডরু মিরসলোর অনুরোধে চিফ ষ্টুয়ার্ড মিঃ চার্লস জিয়লকস্ সাগর-নগরের দর্শনার্থীদের নিয়ে চললেন ষ্টাফ-কোয়ার্টারের ভেতর ফার্ষ্ট ক্লাসের দিকে। কার্পেট পাতা সরু প্যাসেজ দিয়ে এলেন সবাই ফার্ষ্ট ক্লাসের প্রমেনেড ডেক-এ। সেখান থেকে এণ্ট্রান্স হল-এ। এসে দাঁড়ালেন এলিভেটরের সামনে। জিগ্যেস করলেন, আধো-আধো ভাঙা ইংরেজীতে, আপনারা নিশ্চয়ই নীচেয় ইঞ্জিন রুম আর উপরে নেভিগেসন ব্রীজ দুই-ই দেখতে চান।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।—সবাই একমত হলেন।

অর্থাৎ নগরের শুধু বস্তী কারখানা যেমন দেখা দরকার তেমনি উপরওলাদের দপ্তরখানা, মানে, যেখান থেকে কর্তারা কলকাঠি নাড়েন, সেটাও তো দেখা দরকার।

চিফ ষ্টুয়ার্ড বললেন, তবে আগে এই লিফটে নীচের ইঞ্জিনঘরে যাওয়া যাক।

অতএব লিফটে দু'তিন বারে সবাই গিয়ে নামলেন একেবার ডি-ডেক-এ। এই ডেক-এই সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, খান বারো-চোদ্দ মোটর রাখবার গ্যারেজ, যাত্রীদের মালপত্র রাখবার গুদাম এবং সব চাইতে কম দামের টিকিটের যাত্রীদের কেবিন। যাদের অর্থ নেই, তাদের পক্ষে পৃথিবীর আলো হাওয়া অনর্থক। এই কম দামি যাত্রীদের অনেকেই সকালে সেই যে ব্রেকফাষ্ট খেতে এ-ডেক-এ ওঠেন, আর নামেন রাত্রে ডিনারের পর নাচ বা সিনেমা দেখে। সারাদিনটা আগাছার মতই অন্যের প্রাপ্য আলো হাওয়াটুকু বুক ভরে নেন—বেঁচে থাকার পাথেয়।

ডি-ডেক থেকে একটা লোহার সিঁড়ি নেমে গেচে আরো নীচেয়—ইঞ্জিনঘরে। সাততলা জাহাজের এটি শেষ তলা। বিরাট দুটো ইঞ্জিন রুদ্ধ-গর্জন করচে সারাক্ষণ—ঝকঝক, ঝক-ঝক! গম্ গম্ করচে লোহার বিরাট ঘরখানা। কারোর কোন কথা শোনা যায় না, শুধু একটানা যান্ত্রিক যন্ত্রণার আর্তনাদ! বিজ্ঞানের খাঁচায় ভরা লৌহ দানবের দীর্ঘশ্বাস! লৌহ দানবের রুদ্ধ চাঞ্চল্যে সারা ঘরখানা কাঁপচে—যেন ভূমিকম্প!

দৈত্যের মত দুটো ইঞ্জিন দু'খানা বিরাট মোটা আর লম্বা সাফ্‌টকে ক্রমাগত ঘোরাচ্চে—প্রপেল্যার! জল কেটে পনেরো হাজার টনের জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে চলচে জাহাজের কর্তার ইচ্ছানুযায়ী। দাসানুদাস। আর খালাসাদের হাতের ক্রীড়নক ঐ দুই বিরাট লৌহ দানব!

ঘরে অস্বাভাবিক গরম। খালি গায়ে এরা অনবরত তদারক করচে ইঞ্জিন দুটোকে। হাতে অয়েল-ক্যান, রেঞ্চ, হাতুড়ি স্ক্রু-ড্রাইভার। কোথাও কিছু ঢিলে হবার উপায় নেই, ঢিলেমি চাল

অচল। সিংহকে নিয়ে খেলাতে গেলে চোখ-কান খোলা রাখাই দস্তুর।

আগে খালাসীদের কয়লা ঠেলতে হতো বয়লারে। কারণ বাষ্পের সাহায্যে চলতো জাহাজ। সমুদ্রের বুকে সে সব জাহাজ আজকাল হাস্যাস্পদ! তারা মাল বয়, যাত্রী বইবার আভিজাত্য তারা হারিয়েছে। ষ্টিম-শিপ বা 'এস এস' কথাটা এখন জাহাজী সমাজে ছ্যা-ছ্যা-র মতই। এখন অভিজাতদের পদবা 'এম্-ভি'— মোটর-ভেসেল।

সাগর-নগর 'বাতরি'ও মোটর ভেসেল—'এম-ভি!' শুধু তাই নয়, লাক্সারি লাইনার। শ্বেতকায়। নীল সাগরে ভেসে ভেসে যায় যখন, মনে হয়, সরোবরে রাজহংস।

চিফ-ইঞ্জিয়ার জন-গ্র্যাটকোস্কি, সাগর-নগরের নাগরিকদের সব ঘুরিয়ে দেখালেন। দেখালেন, কোথায় কীভাবে শিপ-মাষ্টারের দপ্তর থেকে টেলিফোনে আসে জাহাজকে আগু-পিছু করবার বা গতি কম-বেশি করবার নির্দেশ।

তারপর হেসে বললেন, আশা করি আপনারা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেলেন এবং এখন এই নরককুণ্ড ছেড়ে উপরে গেলে খোলা হাওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচবেন।

সত্যিই তাই। যদিও ভেন্টিলেটারে বাহিরের হাওয়া ভিতরে আসছিলো, তবু যেন সে হাওয়াও গরম, অসহ্য, অস্বস্তিকর!

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে বিদায় নিয়ে দর্শকরা চিফ ষ্টুয়ার্ডের সঙ্গে লোহার সিঁড়ি দিয়ে ডি-ডেক-এ উঠলেন, এবং সেখান থেকে লিফটে বোট ডেক-এ। লিফটের মুখেই দাঁড়িয়েছিলেন হাসিমুখে শিপমাষ্টার মিরশল গ্লাওয়াকি। সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি নিয়ে গেলেন ওয়েরলেস রুমে। রেডিও অফিসাররা সেখানে কর্মব্যস্ত। দু'জনের কানে হেডফোন। একজন চার্ট দেখতে ব্যস্ত। সাগর-

নগরের প্রাণপাখী যদি থাকে ইঞ্জিনরুমের খাঁচায়, তবে এইখানেই তার কর্ণ আর জিহ্বা! দূর-দূরান্তের কথা শুনতে হলে আর নিজের বিপদে 'ওগো বাঁচাও' বলে আর্তনাদ করতে হলে এই ঘরখানাই একমাত্র আশা, ভরসা, সম্বল।

তবে চোখ দুটি তার সান-ডেক-এ নেভিগেশন ব্রীজে। এইখানেই নানা রকমের মিটার। যাতে জলের তলায় কিছু লেগে হোঁচট না খায়, সে জন্যে ফিট করা আছে ফ্যাদোমিটার—জলের গভীরত্ব মাপবার যন্ত্র। তা ছাড়া রয়েচে রেডিও-কম্পাস, র্যাডার-ইণ্ডিকেটার।এবং অটোমেটিক গাইরো পাইলট –'দিক' বেঁধে দিলে চোখ বুজে যাবার ব্যবস্থা! তবু ষ্টেয়ারিং হুইলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নেভিগেটর। দৃষ্টি তার 'বাতরি'র নাকের দিকে! শুধু নাক সোজা গেলেই তো হয় না, অনেক সময় নাক-ঘুরিয়েও যাওয়ার দরকার হয়।

অফিসারদের কোয়ার্টারের সামনেই র্যাডার-রুম আর চার্ট রুম এবং তার সামনেই নেভিগেসন ব্রীজটা। লম্বা বারান্দা। দাঁড়ালেই অসীম সমুদ্র চোখের সামনে সসীম হয়ে দেখা দেয়। হু হু করে বাতাস বইতে থাকে, তাই চারিদিকটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা। জাহাজের সর্বোচ্চ ডেক, মস্তিষ্ক!

ব্রীজ থেকে ফেরবার পথে, সবাই যখন ষ্টোরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, চীফ ষ্টুয়ার্ড হেসে বললেন, এই জাহাজখানার ইঞ্জিন দুটো গ্যালন-গ্যালন ডিজেল অয়েল খায়, এবং তাদের দুজনকে খাওয়াবার আর তদারক করবার ভার ঐ চীফ ইঞ্জিনিয়ারের উপর। কিন্তু আপনাদের দেখাশোনা করবার সৌভাগ্য আমি পাওয়ায় আই'ম্ এক্সট্রিম্‌লি গ্লাদ। আসুন, এক এক করে দেখাই আমার ডিপার্ট্‌মেন্ট্!

ভদ্রলোক সামনেই একটা কেবিন খুলতেই, সবাই প্রায় আঁৎকে উঠলেন: কসাইখানা। গরু, ভেড়া, পাঁঠা, শুয়োরের ছালছাড়ানো

দেহগুলো টেবিলের উপর সাজানো। কসাই মংস কেটে কুচোচ্চে।

দিস্ ইজ বুচার্স শপ্।

বুঝেচি বাপু, বন্ধ করো দরজা এখন। সবার চোখে মুখে ঐ ধরনের ভাব ভদ্রলোক বুঝতে পেরে দরজাটা টেনে দিলেন।

পাশে দরজা ঠেলে খুলে বললেন, বেকারী। এখানে রোজ ব্রেদ্ বিস্কিত্ কেক এতসেত্রা তৈরি হয়।

দেখা গেলো মেসিনে তৈরি হচ্চে সব। সারা ঘরখানা যেন সাদা ময়দার পাউডার মেখে বসে আছে।

চীফ ষ্টুয়ার্ড বললেন, এবার লন্ড্রী।

আর একটা দরজা ঠেলা দিতেই দেখা গেলো, পোলিশ রজকিনীরা মেসিনে চাদর, ওয়াড়, টেবিল ক্লথ, ন্যাপকিন ইত্যাদি কাচ্চে, ইস্ত্রি করচে।

তার পাশের ঘরটা প্রেস। প্রিন্টিং মেসিন চলচে। ছাপার কাজ হচ্চে।

চীফ ষ্টুয়ার্ড বললেন, প্রত্যেক দিনের মেনু ছাপাবার ব্যবস্থা। ভদ্রলোক আরো বলতে লাগলেন, অল সর্তস্-অব সিতি-রিকোয়ার্মেন্তস আ' হিয়ার ইন দিস্ শিপ্। কাগজ, পেন্সিল, পিন থেকে শুরু করে চীনামাটির বাসন, বেড শীট, পিলো-কেস, ন্যাপকিন, এ্যাপরন, ট্রে-ক্লথ, টেবিল-ক্লথ, হোয়াইট কোট আরো অনেক জিনিস।

মিঃ মুঞ্জেশ্বর জিগ্যেস করলেন, হোয়াট এবাউট ড্রিংকিং ওয়াটার?

আ! চীফ ষ্টুয়ার্ড বললেন, ভেরি ইন্তারেস্তিং কোয়েশ্চেন স্যার। দেয়ার ইজ ওয়াতার এ্যান্দ্ ওয়াতার এভরিহোয়ার, বাত্ নো ড্রিংকিং ওয়াতার! পোর্ত থেকে ড্রিংকিং ওয়াতার, ওয়াশিং ওয়াতার, সব বোঝাই করে নিতে হয়। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক পোর্ত থেকে ফুদ্ এ্যান্দ্ গ্রেন্সও জোগাড় করতে হয়। অবশ্য এজন্যে সব পোর্তে স্তিভেদার, মানে, কন্ত্রাকতর্স আছে।

ভদ্রলোক তারপর পরম উৎসাহে হিসেব দিতে শুরু করলেন, আপাতত এই শিপে আছে বহুৎ ফ্রেশ ফ্রুট্‌স্‌, ভেজিতেবেল্‌স্‌, প্রায় পঞ্চাশ হাজার এগস্‌, দেড়শো গ্যালন ভিনিগার, দশ হাজার পাউন্দ সুগার, দেড় হাজার পাউন্দ টি, ন' হাজার পাউন্দ কনদেনসদ্‌ মিল্ক, বিশ হাজার পাউন্দ ফ্লাওয়ার, দু'শ পাউন্দ সালাদ্‌ অয়েল, আঠারো হাজার পাউন্দ ফিশ—

একটা বিরাট ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন, সব থরে থরে সাজানো। মাছ ডিম, ভেজিটেবিল-এর জন্যে রেফ্রিজারেটারের ব্যবস্থা!

সাগর-নগরের খাদ্য-ভাণ্ডার দেখে নাগরিকরা, মনে হলো আশ্বস্ত হলেন। হয়তো মনে মনে ভাবলেন, যাক, না খেয়ে মরবার ভয় নেই! উপরন্তু সাগর-নগরের কর্তৃপক্ষরা নাগরিকদের জামাই-আদরের ব্যবস্থা করেই রেখেচেন।

এইখানেই বোধহয় সাগর-নগরের সঙ্গে মাটির নগরের তফাৎ।

কে-জি নিরামিশাষী।

অবশ্য 'বাতরি'তে নিরামিষ খাদ্যের অভাব নেই! ব্রেড-বাটার-চীজ-কেক-কফি-টি তো আছেই, তাছাড়া ওরিয়েন্ট্যাল ডিশেরও ব্যবস্থা আছে। যথা: মাদ্রাস কারি, ভেজিটেবেল কারি, ডাল ভাত; আসপারাগাস ও স্পিনাক-এর মিক্সড ভেজিটেবল, পটেটো চিপ্‌স, বয়েল্ড বা ফ্রাইড পটেটো (সোজা বাংলায় যার নাম আলুভাতে বা ভাজা!) তাছাড়া টমেটো বা লেটুস সালাড এবং ম্যাংগো বা ওরচেষ্টার সস্‌! স্যুপ তো আছেই।

মাছ-মাংস ভোজীদের জন্যেও ভালোই ব্যবস্থা: গ্রীন সালমন, টার্টের সস, রোষ্ট চীকেন উইথ বিলবেরিজ, রোষ্ট-বীফ—ইংলিশ ষ্টাইল।

কিন্তু মুস্কিল হচ্চে এই, খাদ্যের নামগুলি গালভরা হলেও প্রাণভরা

নয় মোটেই—অন্তত বঙ্গপুঙ্গবদের রসালো রসনায়। তাছাড়া ডাইনিং টেবিলের ক্রোমিয়ম প্লেটেড কাঁটা চামচ, দামি চায়না বাসন, ধোপ-দুরস্ত টেবিল ক্লথ, ন্যাপকিন, ফ্লাওয়ারভাসে টাটকা ফুল ইত্যাদি চোখে দেখবার জিনিস, চেখে দেখবার নয়। অথচ শুকতো, চচ্চড়ি, মুড়িঘণ্ট, মাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি, বা মশলায় মশগুল মাংসখণ্ড ভরা বাটি সামনে ধরলে বসবার আসনের নক্সা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। প্রচ্যে খাওয়াটা মুখ্য, বসাটা গৌণ; পাশ্চাত্ত্যে বসাটাই ভদ্রতা, খাওয়াটা—বিশেষ করে গপগপিয়ে খাওয়াটা অভদ্রতা।

কে-জি প্রাচ্যের লোক। তাছাড়া হিসেবি। মনে মনে ভাবলেন হয়তো, খাওয়ার খরচটা যখন আগে-ভাগেই দেওয়া আছে, তখন খাওয়ার কষ্টটা ভোগ করি কেন? নিরামিষের ব্যবস্থা আছে ঠিকই, তা বলে জলো আর সেদ্ধ তরকারি আর কাঁহাতক খাওয়া যায়! কাজেই একদিন তাঁর টেবিলের সোনালী চুলের ওয়েটার দলা পাসাৎসা নাসাত্‌কসকে নিজের মুখ আর পেট দেখিয়ে এবং হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে ইশারায় বললেন, বাপুহে, খাওয়াচ্চো তো বটে, খাচ্চিও, কিন্তু মুখে রুচ্চে না, পেটও ভরচে না।

দলা ভালো করে বুঝলো না, কি বলচেন কে-জি। তবে এটুকু বুঝলো, ভদ্রলোক খাওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারচেন না। কাজেই তাঁকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গেলো জাহাজের কিচেন রুমে!

সাগর-নগরের কিচেন রুমই বটে! যেন যজ্ঞিবাড়ি। প্রায় জন পঞ্চাশ কুক গ্যাস আর ইলেকট্রিক ষ্টোভে রান্নায় ব্যস্ত। কিচেন-মেসিনারী রয়েচে হরেকরকম। কোনটায় খোসা ছাড়ানো হচ্চে, কোনটায় মেশানো হচ্চে, কোনটায় স্লাইস করা হচ্চে, কোনটায় হচ্চে রস নিংড়োনো। তা ছাড়া বিরাট ষ্টীম-কুক-এ সেদ্ধ হচ্চে ভাত, তরকারি, মাংস

'বাতরি' ভারতীয় বন্দরে নোঙর বাঁধে। বহু ভারতীয় এই জাহাজের যাত্রী। কাজেই ভারতীয় মেনু বা ইণ্ডিয়ান ডিশের ব্যবস্থা রাখা ছাড়া উপায় নেই। এবং সেজন্যে আছে একজন ইণ্ডিয়ান কুক।

ইণ্ডিয়ান কুকটি চাঁটগেঁয়ে মুসলমান। কৃষ্ণকায়। আর সব কুকগুলি যথারীতি লোহিত বর্ণের; যেন লাল গোলাপের বাগানে চিকন কালো ভোমরাটি! দ্‌লা কে-জিকে নিয়ে দাঁড় করালো ইণ্ডিয়ান কুকটির সামনে এবং পোলিশ ভাষায় কী যেন বললো তাকে। খাদ্য সম্বন্ধে কে-জি তাঁর প্রস্তাব জানাতেই কুকটি একগাল হেসে বিশুদ্ধ চাঁটগাঁইয়া ভাষায় যা বললো, কে-জির কাছে মনে হলো যেন তা প্রায় পোলিশ ভাষার মতই দুর্বোধ্য। তবু হাজার হোক দেশের ভাষা তো – কাজেই হাবে-ভাবে-ভাষায় এবং তার হাত নাড়ায় বুঝতে পারলেন, কুকটি যথাসাধ্য চেষ্টা করচে তাঁর মনের মত এবং মুখের মত তরকারি রাঁধতে!

আরো যা বললো কুকটি, তা সর্ববোধ্য বাংলা ভাষায় দাঁড়ায়: আরে মশয়, দ্যাশের জন্য আমার মনটা ঐ আগুনের মতই পোড়ে। কিন্তু এই প্যাটের জ্বালাতেই কালাপানিতে ভ্যাইসা বেড়াচ্চি আজ বিশটা বছর, আর আপনাগোর প্যাটের দিকে নজর রাখুম না? আপনি কন কি?

দ্‌লা চুপ করে দাঁড়িয়ে তার অদ্ভুত কথা শুনছিলো. কুকটি তাকে পোলিশভাষায় কী যেন বলতেই চলে গেলো সে। হয়তো বললো, তুমি এখন যাও বাপধন. আমি একটু দ্যাশের লোকের লগে দুইটা কথা কই।

বয়েন সাহেব, বয়েন।--কুক তার টুলটা এগিয়ে দিলো। এপ্রনের পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতটা মুছতে-মুছতে বললো, দ্যাশ আমার চাঁটগা সহর থ্যাহে পাঁচ কোশ দূর কর্ণফুলি নদীর ধারে। নাম আমার ইউসুফ আলি। বাপে একদিন মার দিছিল, সেই রাগে

কলকাতায় আইস্যা জাহাজের খালাসী হইয়া গিছলাম গিয়া ইংলণ্ডে। শেষে কিনা সেহানেই কাজকর্ম কইরা খাতাম আর বেড়াতাম—ঐ ইষ্টএণ্ডের পাড়ায়। সেহানে এক মাগী আমারে পাইয়া বসলো। তা শেষতক সাদি করলাম তারেই! এহন সায়েব, আপনাগোর আশীব্বাদে আমার দুই ব্যাটা আর পাঁচ বেটি। বড়জন ইঞ্জিনিয়ার হইছে। মটর গাড়ি চাপ্যা অফিস করে। বাড়িও একডা কিনছি। কিন্তু রান্নার নোকরি আর ছাড়ি নাই। এই জাহাজ কোম্পানী মাইনা দেয় ভালো, এরা লোকও ভালো। তাই এই কোম্পানীতেই আজ কাজ করতেছি প্রায় দশ বচ্ছর। ঐ ইংলণ্ড থেকে ইণ্ডিয়া পর্যন্তই আমার কাম। আপনাগোর জন্যিই আমার নোকরি। আর আপনি একটা কথা বললেন, আর আমি তা করুম না! আজ ডিনারেই স্পেশাল আইটেম পাইবেনই পাইবেন।

কে-জি বললেন, অশেষ ধন্যবাদ। বোঝেন তো, বাঙালীর জিব, একটু ঝাল-নুন না হলে যেন মনে হয় কিছুই হলো না। আর যতই দেশের দিকে যাচ্ছি, ততই ঝাল-টকের জন্যে জিবটা যেন সড়সড় করচে।

ইউসুফ যেন লুফে নিলো কথাটা: তা তো হবেই সায়েব। বাঙালীর জিব আমি চিনিনে। তাইতো আমার মেম-মাগকে বাঙলা রান্না করন শিখাইছি। এ সব ছ্যাশের খাবার আবার আমাগোর মুখে রোচে নাকি? আচ্ছা সাহেব, সেলাম। আপনার লগে দুটো পেরানের কথা কতি পার্যা ভারি আনান্দ পালাম।

কে-জিকে ইউসুফ কিচেনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। গরম ভ্যাপসা বিরাট রান্না-যজ্ঞখানা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে কে-জি নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন!

এ-ডেক-এর এক কোণে জড়ো হয়েচেন ডাঃ রায়, মিঃ চ্যাটার্জি,

ডাঃ প্রামাণিক, রামস্বামী আর রেজা। আর হের এইটেল। উইলহেলম এইটেল।

বয়েস বেশি নয়। ছোকরা। তবে জার্মান চেহারা! বয়েস থেকে শরীরটা প্রায় দশ বছর এগিয়ে আছে। মুখ দেখে মনে হয়, বছর চব্বিশ বয়েস হবে, কিন্তু দেখায় যেন চৌত্রিশ। তার উপর দু'গালে কটা দাড়ি, একমাথা সোনালী চুল, টকটকে পুরু ঠোঁট দু'খানা। হাতের মোটা কব্জী, আঙুলগুলো কদলীপ্রায় ফুলোফুলো। হাত নয়তো বাঘের থাবা। পেশীবহুল। বুকখানা পাথরের মত চ্যাটালো। সত্যিকারের পুরুষসিংহ। কিন্তু কথাবার্তায়, আচরণে মৃদু মন্থর ভাব: যেন নারকেলের মধ্যে নরম শাঁস আর ফোঁপরা।

ছেলেটির নীল চোখে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি। জিজ্ঞাসু নিয়েই চলেচে সে ভারতের দিকে। তার হাতে একখানি বই: হাউ টু প্র্যাকটিশ যোগ। জার্মানীর গোপেনজের সহর থেকে চলেচে দক্ষিণেশ্বরে যোগদা আশ্রমের অভিমুখে। ইচ্ছা, যোগ শিক্ষা।

হাতের বইখানা দেখিয়ে বললো, বইটাতে 'ইয়োগা' বিষয়ে পড়েচি। এখন ইচ্ছে হাতে কলমে শিক্ষা নেওয়া। শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া এসব শেখা বড় শক্ত। এজন্যে করেসপণ্ডেন্স করে বড় আশা নিয়ে চলেচি ইয়োগা' শিখবো বলে!

ডাঃ প্রামানিক বয়োবৃদ্ধ। জিগ্যেস করলেন, তুমি যে একলা বেরিয়ে পড়েচো, বাড়িতে তোমার কে আছেন? তাঁরা ছেড়ে দিলেন?

এইটেল হাসলো, বাড়িতে শুধু মা আছেন এখন। বাবা বছর খানেক হলো মারা গেচেন। এক বোন ছিলো, সেও বিয়ে করে তার হাজব্যাণ্ডের কাছে মিউনিকে আছে।

মিঃ চ্যাটার্জি জিগ্যেস করলেন, কতদিনের প্রোগ্রাম নিয়ে যাচ্চো?

এইটেল বললো, সব নির্ভর করচে মায়ের উপর। মা বোধহয় শীগ্রাই আবার বিয়ে করবেন। তা যদি করেন, তবে আর আমার

ফেরবার দরকার কি? ইণ্ডিয়াতেই থেকে যাবার ইচ্ছে। অবশ্য ইণ্ডিয়া-গভর্ণমেণ্ট যদি ভিসা এক্সটেণ্ড করতে রাজী হন।

আর যদি তিনি বিয়ে না করেন?—রামস্বামীর প্রশ্ন!

তা হলে আমাকে ফিরে যেতেই হবে। আমি ছাড়া মাকে দেখবে কে? আমার কর্তব্য তাঁকে দেখা।

সে তো বটেই!—ডাঃ প্রামানিক ডিটো দিলেন।

রেজা ফট করে ছেলেমানুষী প্রশ্ন করে বসলেন, তোমার কি ইচ্ছে? মার আবার বিয়ে করা উচিত, না, অনুচিত?

ডাঃ প্রামানিক তাড়াতাড়ি বাংলায় রেজাকে বললেন, এ প্রশ্ন করাটা কি ঠিক হলো?

কিন্তু এইটেল বললো, দেখো, আমার ইচ্ছের উপর কিছুই নির্ভর করে না। আর, মা'র উচিত-অনুচিত বিচার করবার আমার কোন অধিকারই নেই। তাঁর যদি মনে হয়, তাঁর আর একজন জীবনের সঙ্গী দরকার, তবে তাই তাঁর করা দরকার। এই যে আমার ইচ্ছে 'ইয়োগা' শেখা, আমার সে ইচ্ছায় কি তিনি বাধা দিয়েচেন!

রাইট। রাইট।—রামস্বামী বললেন।

ডাঃ প্রামানিক বললেন, তুমি এই বয়েসে যোগাভ্যাস করবার চেষ্টা করচো জেনে ভারি খুশি হলাম। তোমাদের দেশ যন্ত্রের সাধনা করে, আমাদের দেশ মন্ত্রের।

এই কথার উত্তরে এইটেল যা বললো, তা কেউই আশা করেননি: দেখুন স্যার, কোন দেশ বা জাত শুধু যন্ত্র বা শুধু মন্ত্রের সাধনা করলে সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে কখনোই এগুতে পারবে না, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। যন্ত্র মানুষকে পশুতে পরিণত করে, আর মন্ত্র নষ্ট করে মানুষের আত্মবিশ্বাস। আজকের মানুষকে চলতে হবে একহাতে ধর্ম আর অন্য হাতে কর্মকে নিয়ে। নইলে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই—নয় কি?

ঠিক, ঠিক!—ডাঃ প্রামানিক মাথা নেড়ে সায় দিলেন, সত্যি হের এইটেল, জার্মানীর যন্ত্র-সাধনা আর ইণ্ডিয়ার মন্ত্র-সাধনা যদি একসঙ্গে মিলিত হতে পারে, তবেই হয়তো মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে। তোমার মধ্যে এই দুই সাধনার মিলন দেখে সত্যিই আমি বিস্মিত, আনন্দিত! তোমার আশা পূর্ণ হোক, এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

এইটেল বললো, আশা পূর্ণ হবে কিনা জানিনে। সম্পূর্ণ অসহায়, নিঃস্ব হয়ে চলেচি ভারতে। ভরসা—ভালো কাজে বাধা যেমন আছে, বন্ধুও আছে অনেক। জাহাজের একবছরের রিটার্ণ টিকিট কাটা আছে, আর আছে আমার একটা দামি ক্যামেরা, বাইনাকুলার, আর প্রজেক্টর একটা। ঐগুলি বিক্রি করে আশাকরি ইণ্ডিয়ায় খরচ চালাতে পারবো কিছুদিন। আশ্রমেও হয়তো কোন ব্যবস্থা হতে পারে। নয়তো, রিটার্ণ টিকিট তো রইলোই!

এইটেলের ব্যবস্থার কথা শুনে যুগপৎ সবাই মুগ্ধ হলেন। ভাবলেন, এমন না হলে, তেমন কিছু সত্যিই পাওয়া যায় না। টাকার জোরটা কিছু নয়, মনের জোরটাই বড়।

বোঝা গেলো, এইটেলের যোগসাধনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেচে।

একটি জার্মান যুবক প্রথম যৌবনের রঙীন নেশা কাটিয়ে, কাম-মোহ ত্যাগ করে নতুন কিছু পাবার আশায় যোগাভ্যাস শেখবার জন্যে ভেসে চলেচে যে জাহাজে ইণ্ডিয়ায়, সেই জাহাজেরই বোট-ডেক-এর আড়ালে দুই ইণ্ডিয়ান নর ও নারী নিজেদের মধ্যে যোগা-যোগের ব্যবস্থা করে নিয়েচেন, নিছক দেহের তাগিদেই।

ব্যাপারটা চোখে পড়লো রামস্বামীর। সে সন্ধ্যায় ডাইনিং হলে সিনেমা হচ্ছিল। রামস্বামী খানিকক্ষণ থেকে পরে হল থেকে উঠে

বেরিয়ে এলেন। মাথাটা যেন ধরেচে মনে হলো। বার-এ গিয়ে এক পেগ হুইস্কি আর সোডা খেয়ে ভাবলেন, ফাঁকা হাওয়ায় একটু দাঁড়ালে মাথাটা হয়তো হাল্কা হতে পারে। অবশ্য, হাল্কা পায়ে তিনি যাননি উপরের বোট-ডেক-এ, তবে অন্যমনস্কভাবেই যাচ্ছিলেন রেলিং-এ বাঁধা লাইফ-বোটগুলোর পাশ দিয়ে। এমন সময় কানে এলো একটা বোটের আড়ালে ফুস-ফুস গুজ-গুজ আওয়াজ।

থমকে দাঁড়ালেন রামস্বামী। তাড়াতাড়ি সরে গেলেন পাশের বোটের আড়ালে। প্রায় সবাই সিনেমা হলে। ডেক ফাঁকা। ফিকে অন্ধকার। নিস্তব্ধ। উপরে সান-ডেক-এর একটা বিজলী বাতি দূরে জ্বলচে বটে, তবে তাতে অন্ধকার বাড়চে বৈ, কমচে না।

রামস্বামী প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেননি। তবে কান পেতে একটু শুনতেই বুঝলেন, ব্যাপারটা বেশ রসালো!

মেয়েলি গলায় মুক্তি পাবার আবেদন।

পুরুষের গলায় আরো থাকবার নিবেদন।

এবং সেই সঙ্গে খস-খস শব্দ, উঁ-য়াঁ অস্ফুট-ধ্বনি আর মাঝে মাঝে চুম্বনের চমকপ্রদ আওয়াজ!

মাই ডার্লিং!

নাও, লেটস্ গো! সামবডি মে কাম দিস সাইড!—মেয়েলি গলা।

ও নো, এভরিবডি ইজ নাও বিজি উইথ সিনেমা! এনাদার কিস প্লীজ।—পুরুষের গলা।

চুম্বনের শব্দ: আর ইউ নট্ ইয়েট স্যাটিসফাইড্?

ও, এ বেগার ইজ নেভার স্যাটিসফাইড!

নো, আই কাণ্ট ষ্টে এনি মোর্।

ব্লাউজের বোতাম আঁটতে আঁটতে বোটের আড়াল থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। শাড়িটা তখনো ঠিকঠাক

করতে পারেনি। চুলের খানিকটা এলোমেলো।

রামস্বামী আড়াল থেকে দেখলেন, এনাক্ষী রাও!

এনাক্ষী একবার এদিক ওদিক দেখেই হরিণীর মত তরতর করে নেমে গেলেন এ-ডেক-এ। সোজা বাথরুমে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

রামস্বামীর বুঝতে বাকি রইলো না, বোটের অন্তরাল থেকে এবার কোন নায়কটি বেরুবেন। রামস্বামী আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁর বেরুবার পথে, দুই বোটের ফাঁকটার সামনে। একটা সিগ্রেট বার করে ধরিয়ে একটান দেবার মুখেই বেরিয়ে এলেন সি. মিটার!

হ্যালো!

আচমকা সম্ভাষণে প্রথমটা চমকে গেছলেন সি· মিটার। তবে রামস্বামীকে দেখে গোঁফ চুমড়ে একগাল তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, হ্যালো! ইউ আর হিয়ার!

রামস্বামী সিগ্রেটে আর একটা টান দিয়ে বললেন, আই ওয়াজ অন্ ডিউটি।

কি রকম?

তোমাদের কুঞ্জদ্বার পাহারা দিচ্ছিলাম।

বটে, বটে। সো লেট্স গো টু বার!—মিটার রামস্বামীর হাত ধরে টানলেন: আজ আমি কল্পতরু। চলো।

কিন্তু রামস্বামী দাঁড়ালেন। বললেন, তার আগে তোমার ড্রেসটা ঠিক করে নাও। প্যাণ্টের বেল্টটা আঁটতেই ভুলে গেচো যে!

আই সি!—হেসে কোমরের বেল্টটা বেঁধে নিয়ে, সার্ট সোয়েটারটা টেনে-টুনে ঠিক করে বললেন, চলো, লেট মি হ্যাভ এনাদার গুড টাইম উইথ ইউ! ততক্ষণ, দাও তো একটা সিগ্রেট। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেচে।

এসব নিয়ে সাগর-নগরে বৃথা রাগ অভিমান করা। প্রেমের খেলায় এঁরা কেউই কচিখোকা বা খুকি নন। নিজেদের ভালো-মন্দের জ্ঞান সবারই আছে। আর কেউ কারোর তোয়াক্কা করে না, ধারও ধারে না। দু'দিনের সমাজ, দু'দিন পরে ভেঙে যাবে। আর কারো সঙ্গে কারোর দেখা হবে কিনা সন্দেহ। মাটির নগরে গিয়ে সবাই ছড়িয়ে যাবে যে যার তালে। কাজেই এই সাগর-নগরে যে যার চালে চলচে চলুক, শুধু দেখে যাও, কিছু বলতে গেলে তুমিই হবে হাস্যাস্পদ।

অবশ্য প্রকাশ্যে যদি অশোভন কিছু ঘটে, যদি অন্যের স্বার্থে কিছু আঘাত লাগে, যদি বিরক্তির কোন কারণ ঘটে—তবে আপত্তি করবার অধিকার আছে বৈকি সর্বদা এবং সর্বথা। এ নিয়ে মতদ্বৈধ নেই।

দিন যত এগিয়ে যাচ্চে, পরস্পরের বন্ধুত্ব হচ্চে গাঢ়, ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বাড়চেই যাঁরা 'আপনি' বলে শুরু করেছিলেন কথা, তাঁরা এখন 'তুমি' বলে কথা বলচেন, পদবির আগে 'মিষ্টার' লাগিয়ে কথা বলাও আর দরকার করে না। মাটির-নগরের ঠিকানা নিচ্চে পরস্পরে টুকে ঃ এই যাত্রার আনন্দময়-স্মৃতিটুকু নিয়ে পরে তো জাবর কাটতে হবে!

'বাতরি' জল কেটে এগিয়ে চলেচে পোর্ট সৈয়দের দিকে। বাইরের হিমেল হাওয়া ক্রমে হচ্চে উষ্ণ। ক্যাবিনে, লাউঞ্জে, ডেক এ বন্ধু-বান্ধবীদের হৃদয়েও দেখা দিচ্চে ভাবের তাপ! পরিচয়ের আদান-প্রদানের আর বাকি নেই। ছোট ছোট দল উঠেচে গড়ে। কোথাও চলেচে মন-দেওয়া-নেওয়া; কোথাও বা মন-খোলা হাসি-ঠাট্টা।

তাই তো দেখা যাচ্চে এইটেলের সঙ্গে মিঃ চ্যাটার্জিকে গল্প করতে, ডাঃ প্রামাণিকের সঙ্গে রেভারেণ্ড হেওয়ার্ডের, ডাঃমহাবিষ্ণু সেন

জমেচেন মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটনদের সঙ্গে। রেজা, কে-জি আর সানিয়াল যেন হরিহর আত্মা। মিসেস প্যারেলওয়ালার সঙ্গে মিসেস হল্যাণ্ডের খুব ভাব। শুধু ভাব নয়, নীচু গলায় রীতিমত আলোচনা চলচে এনাক্ষী রাওয়ের বেহায়াপনা নিয়ে।

মিসেস হল্যাণ্ডের রুমমেট হচ্চেন এনাক্ষী রাও। ভোর না হতেই কেবিনের সামনে মিটারের আসা এনাক্ষীর আশায় এবং অনেকরাত্রে এনাক্ষীর কেবিনে ফেরা—অবশ্যই আলোচনার বিষয়। তাছাড়া ডেক-এ, লাউঞ্জে, সর্বক্ষণ দুটির আঠার মত লেগে থাকা—চোখে লাগে বৈকি!

অবশ্য, সম্প্রতি মিসেস প্যারেলওয়ালাও তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে নীচু গলায় আলোচনা করবার বিষয়বস্তু পেয়েচেন। বিষয়বস্তুটি হচ্চেন কিরন্ময়ী বড়াই। তিনি আজকাল একটি পাকিস্তানী ছেলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করচেন। ছেলেটির নাম রাফিক। ইংল্যাণ্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেছলো। পড়েচে এবং প্রেমেও পড়েচে কয়েকবার, তবে প্রেমপাত্রীকে লতিফের মত সালোয়ার-পায়জামা পরিয়ে দেশে নিয়ে যাচ্চে না। দেশে তার ভাবি-বিবি ঠিক হয়েই আছে। বিলেত থেকে লায়েক হয়ে ফিরচে। ফিরলেই সাদি আর সরকারি চাকরি। শুধু তাই নয়, ভাবি-বিবির বাবা পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাকটার। অতএব পয়সাওয়ালা লোক। বিবির সঙ্গে একখানা বাড়ি পাবারও আশা আছে রাফিকের।

এমতাবস্থায় একটি বিদেশিনী শ্বেতহস্তিনীকে নিয়ে দেশে যাওয়া মানে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। কাজেই জাহাজে উঠবার আগে রাফিক তার শেষ প্রণয়িনী মিস ন্যান্সির হাত ধরে রফা করে এসেচে: ডার্লিং, তোমার মুখখানা আমার বুকের পটে এঁকে নিয়ে চললাম। আমাদের প্রেমের জের হিসেবে দেশ থেকে পাঠাবো পাকিস্তানী প্রেজেণ্টস্ আর প্রেমের চিঠি প্রত্যেক উইকে।

হ্যান্সি অবশ্য ছলছল চোখে বলেছিলো, তা ছাড়া আর উপায় কি ডার্লিং। তবে রাফিককে বিদায় দেবার সময় মনে মনে ফিক ফিক করে হেসে হিসেব করেছিলো, পার্টিংকিক-এর আগে রাফ্‌লি প্রায় শ'দেড়েক পাউণ্ড দুয়ে নেওয়া গেচে। যথা লাভ!

কিরন্ময়ী বড়াই রাফিকের সঙ্গে সামান্য মেলা-মেশা করছিলেন, তার একটু কারণ ছিলো। কথায় কথায় প্রকাশ করেছিলো রাফিক, যে, করাচীর কাষ্টমস্‌-এ রাফিকের নাকি এক চাচা উচ্চপদস্থ কর্মচারি। কাজেই কাষ্টমস্‌-এর কাঁটা তারের বেড়ার কাঁটা সরিয়ে দিয়ে অতি সহজেই ডিঙোবার ব্যবস্থা করতে পারেন ভদ্রলোক। এ হেন চাচা-ভাগ্যবান ভাইপোর সঙ্গে স্বার্থের খাতিরে যদি দুটো হেসে হেসে কথাই বলা যায়—তাতে কী এমন ক্ষতি!

তবে হ্যাঁ, ড্যান্সিংএর প্রোগ্রামের রাত্রে অনেকেই হল-এ কিরন্ময়ী বড়াইকে রাকিকের পাশে বসে বীয়ারের গেলাসে চুমুক দিতে দেখেচেন। সেটা নেহাৎই রাফিকের অনুরোধে, তাকে তোয়াজ করবার জন্যে মন রাখার অভিনয় মাত্র। আর রাফিক তো বলেইচে, বীয়ারে কোন দোষ নেই। নেশা হবারও ভয় নেই। মাত্র টু-পারসেণ্ট এলকহল। অথচ শরীরটা টনটনে হয়; আর নাকি লিভার ফাংসন ভাল হয়!

মিসেস বড়াইয়ের সত্যিই লিভারের গোলমাল আছে!

তবে রীতিমত ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ এখানে-ওখানে দেখা যাচ্চে একটু লক্ষ্য করলেই।

বাহাত্তুরে বুড়ো জন লেগেচেন রাজহংসী মিসেস হারমানের পেছনে। ভদ্রলোক জিব্রলটার থেকে উঠেচেন। সেখানে তিনি ব্যবসা করেন, যাচ্চেন করাচীতে। ইংরেজের ভক্ত দেশ, দেখা যাক, সেখানে কিছু সুবিধে হতে পারে কিনা।

বুড়ো পোর্ট থেকে উঠেই বোধকরি বার-এ গিয়ে বসেচেন আর হরদম মদ গিলচেন। এমন সস্তায় ভালো মদের সুযোগ ছাড়া বোকামি। হুইস্কি রাম, জান, পোর্ট, বীয়ার সব রকম চাখচেন; এবং এই কমিউনিষ্ট জাহাজে পোলিশ ভোদ্‌কা পাওয়া যায় দেখে তাও গিলেচেন এ পর্যন্ত প্রায় তিন বোতল।

কড়া মাল এই ভোদ্‌কা। দেখতে জলের মতন। কিন্তু মনে হয়, তরল আগুন যেন যাচ্চে কণ্ঠনালি দিয়ে পেটের মধ্যে। ফাঁকে ফাঁকে সোডাওয়াটার সিপ্‌ করতে হয়, নেশাটা তাতে জমে ভালো।

বুড়ো শুধু নাচের আসরে গিয়ে বসে।

কারণ সেখানে তখন ওয়াইন সার্ভ করা হয়; আর তাছাড়া রকমারি উইমেনের বাহারও দেখবার মত!

রাজহংসীকে চোখে ধ'রে গেলো জন-এর। তা, যাবারই কথা। কাজেই তাঁর টেবিলেই বরাবর বসতে লাগলেন জন। কথায় আছে, ইফ ইউ লভ এ গার্ল, ইউ মাষ্ট লভ হার ডগ অলসো! কাজেই রাজহংসীর হাজব্যাণ্ডের সঙ্গেও দুটো জড়ানো মিষ্টি কথাও বলতে হয়। আর দুজনের ড্রিংকের সব খরচা বহন করতে লাগলেন বুড়ো প্রেমিক জন! তবে দেওয়া নেওয়ার যুগে একতরফা কিছু করা বিধেয় নয়; তাই মিঃ হারম্যান যখন অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে নাচতে যান তখন জন রাজহংসীর নরম এবং পরম শুভ্র মোমের মত হাতখানায় তাঁর ফেনিল ওষ্ঠ ঠেকিয়ে দিতে ছাড়েন না।

রাজহংসী হাসেন, বোঝেন হয়তো, বুড়োর দৌড় ঐ পর্যন্ত। বাহুলতা বেয়ে মুখে বা আর কোথাও এগুবার সাহস হবে না বুড়ো শালিকের—অবশ্য যদি না রাজহংসী কৃপা করেন। আর, কবরের ভাবি মড়াকেই বা কৃপা করে লাভটা কি? তিনি 'তু' করলে কুকুরের অভাব? তবে হ্যাঁ, শুধু হাতখানা বুড়োর হাতে তুলে দিলে যদি ড্রিংক বাবদ কিছু হাতানো যায়, আর তাতে তিনি বা তাঁর

হাজব্যাণ্ড যখন কিছু মনে করেন না—তখন এই মজার খেলায় ক্ষতি কি ?

ওঁদের খেলা সানিয়ালের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। বরং ড্যান্সিং হলে, তিনিই তাঁর দলকে দেখালেন মজার কাণ্ড !

সানিয়াস বললেন, জানো ঐ বুড়োটা কম নির্লজ্জ ! সেদিন বাথরুমের দরজাটা ভিতর থেকে না বন্ধ করেই বুড়ো একেবারে উদোম হয়ে স্নান করচে। আমি দরজা খুলে ঢুকতে গিয়েই লজ্জায় মরি ! তা বুড়োর লজ্জা আছে ! বলচে, কাম অন্, কাম অন্—ডোন্ বি শাই ! আ মর ব্যাটা !

কে-জি শুনে বললেন, য়ুরোপে একসঙ্গে নগ্ন স্নানে দোষ নেই, কাজেই লজ্জার কথা বুড়োর মাথায় আসেনি।

রেজা বললেন, আসল কথা, বুড়ো নেশার ঝোঁকে ছিলো। হেসে বললেন, যাননি, ভালোই করেচেন।

আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত প্রণয় ঘটনা ঘটচে গ্যাংগুলি ও এলিসের মধ্যে। গ্যাংগুলির বিশুদ্ধ বাংলা গঙ্গোপাধ্যায় ও ইংরেজিতে গাঙ্গুলী। কিন্তু এলিসের কাছে গ্যাংগুলি।

এতদিন এস. গ্যাংগুলির কোন খবর পাওয়া যায়নি। কারণ, ডেক-এ ইনি এতদিন অনুপস্থিত ছিলেন। আর, তার কারণ হচ্চে, ভদ্রলোকের অসুস্থতা। সাউদাম্পটনে 'বাতরি'তে ওঠার পরদিনই সী-সিকনেসে পড়েছিলেন এবং তার পরেই হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় সাগর-নগরের হাসপাতালে ছিলেন শয্যাশায়ী। অবশ্য, ছিলেন ভালোই ! নার্সের নিয়মিত সেবা, ডাক্তারের তীক্ষ্ণ পর্যাবেক্ষণ এবং সেই মত ওষুধ সেবন করে দ্রুত উন্নতির পথেই এগিয়ে চলছিলেন। তাছাড়া মাটির বহু হতভাগ্য দেশের নগরে-নগরে যেমন ভেজাল খাদ্যের প্রকাশ্য প্রচার আছে—সে রকম কিছুর কথা এই সাগর-নগরের কর্তৃপক্ষরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না বলে রোগীরা

বিশুদ্ধ ওষুধ পথ্য এবং পানীয় পেয়ে থাকেন। সে কারণে যখন সাগর-নগরের হাসপাতাল থেকে ছাড়ান পেলেন গ্যাংগুলি, তখন দেখা গেলো, তাঁর ওজন গেচে বেড়ে, আর গাল দুটিতে বেগুনে আভা দিয়েচে দেখা।

এই জাহাজে এঁর টিকিট কাটা থাকলেও, আসতে পারতেন কিনা সন্দেহ এবং সে ক্ষেত্রে এলিসের সঙ্গে দেখাও হতো না নিশ্চয়ই এবং তাঁদের এই প্রেমোপাখ্যান লেখবার সৌভাগ্যও হতো না আমাদের। ভদ্রলোক ওয়াটারলু রেল ষ্টেশনে এসে দেখেন মাত্র কয়েক মিনিট আগে বোট-ট্রেনটি ছেড়ে গেচে। ট্যাক্সি থেকে ব্যাগ পত্র নামিয়ে বোকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ষ্টেশনে। শেষে ষ্টেশনে জাহাজের কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানাতেই তাঁরা তাঁদের নিজেদের কার-এ সোজা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সাউদাম্পটন ডকে।

এস. গ্যাংগুলি ডকে পৌঁছুলেন যখন, তখনও অন্যান্য যাত্রীরা পাশপোর্ট অফিসের সামনে লাইন করে দাঁড়িয়ে!

এইখানেই দেখা হয়ে গেলো মিস এলিস ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে এস. গ্যাংগুলির। লাইনে গ্যাংগুলির সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন মিস ক্যাম্পবেল। বেচারির স্যুটকেশটা ছিলো যেমন বড়, তেমনি ভারি। একলা মেয়ের পক্ষে সেটা ক্যারি করা একটু শক্ত। অথচ, ওটি কেন যে লাগেজের সঙ্গে না দিয়ে নিজের কাছে রেখেচেন, বোঝা শক্ত। গ্যাংগুলি মেয়েটির অসুবিধে দেখে নিজেই অফার করলেন, ইফ ইউ ডোন্ মাইণ্ড, আই মে হেল্প ইউ? এবং সেই থেকে ঐ এলিসস্য স্যুটকেশ গ্যাংগুলি সানন্দেই তাঁর কেবিন পর্যন্ত বয়ে এনেচেন। অতএব, ঐ উপকারের প্রতিদান নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন গ্যাংগুলি এবং তাঁর আশা পূর্ণও হলো।

হাসপাতালে থাকাকালীন, মিস এলিস নিয়মিত তাঁকে ভিজিট করতে লাগলেন এবং পাশে বসে গল্প জমালেন। মেয়েটি একটু

বেশিই মোটা এবং বেশি রকম গপ্পে। কাজেই হাসপাতালের পালা শেষ হলেও গ্যাংগুলির সঙ্গে এলিসের গল্পের জের চলতেই লাগলো। ডাইনিংরুমে, লাউঞ্জে, বার-এ, ডেক-এ সর্বত্রই দুটিতে জোড় বেঁধে হাসি আর গল্পে মসগুল হয়ে রইলেন।

অতএব, ঐ দুজনের মজলিসী ভাব, সাগর-নগরের অনেককেই ভাবিয়ে তুললো। আর, তাঁদের দুজনের হাব-ভাবে বেশ বোঝা গেলো, তাঁরা মজে আছেন এবং মজায় আছেন।

এই সব মজা-দলের মাঝে বিরহিণী মিসেস দত্ত কিন্তু বড়ই বেমানান। তিনি আজকাল মাঝে-মাঝে বেরুচ্চেন বটে বাইরে, তবে ডেক চেয়ারে বসে উদাস হয়ে চেয়ে থাকেন সমুদ্রের দিকে! অবশ্য, মিস ইলিয়ট কখনো কখনো তাঁর পাশে এসে বসেন, গল্প-সল্প করেন। সেই সময়টুকু মন্দ কাটে না মিসেস দত্তের।

'বাতরি'তে আবার চাঞ্চল্য দেখা দিয়েচে।

শুরু হয়েচে দল বাঁধা। আবার মাটির সহরে যাবার সুযোগ সামনে। সমানে পাঁচটা দিন জলে ভেসে ভেসে, অবশেষে দেখা গেচে মিশরের উপকূল।

'বাতরি' তার বাঁয়ে স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি রেখে, ডাইনে মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনেসিয়া, লিবিয়া ছাড়িয়ে, সিসিলি, মাল্টা, ক্রেট-এর আশপাশ দিয়ে এসে পেঁছেচে ইজিপ্টের দরিয়ায়। ইজিপ্টের উপকুল আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে 'বাতরি'র নোঙর ফেলবার কথা নেই, তাই এগিয়ে চলেচে পোর্ট সৈয়দের দিকে।

যাঁরা ইজিপ্টে বেড়াতে যাবেন তাঁরা নিজেদের নাম, কেবিন নম্বর জানিয়ে দিয়েচেন পার্শার অফিসে, জমা দিয়েচেন পাশপোর্ট। জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে ঠিক করা আছে ইজিপ্টেরই এক ট্রাভেল এজেন্সীর সঙ্গে: মেমফিস ট্যুরিং এজেন্সী।

পোর্ট সৈয়দের জাহাজ নোঙর করলেই, এঁদের লোক এসে ওঠে জাহাজে, ছোটে পার্শার অফিসে, জেনে নেয় কারা নামবেন মিশর দর্শনে। তারপর তাঁদের ডেকে-ডুকে নিয়ে, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কটি 'তীর্থযাত্রী' হলো গুনে গেঁথে মিশরী-পাণ্ডা 'দিস ওয়ে স্যার, খ্যাট্ ওয়ে ম্যাম' করতে করতে সবাইকে নিয়ে ওঠে ষ্টিমলঞ্চে।

এই যাত্রায় বেশি লোক পা বাড়ায় না। টাকার অংকটা বাধা দেয়। ছ' পাউণ্ড, প্রায় আটাত্তর টাকা খরচ করবার আগে অনেকেই মাথা চুলকে ভাবতে থাকেন। তবে যাঁদের সখ আছে কিংবা ভাবেন, এ সুযোগ তো আর পাবো না—তাঁরাই ছ' পাউণ্ডের ট্রাভলার্স চেক কেটে জমা দেন পার্শার অফিসে।

তবে হ্যাঁ, এ টাকা খরচ করলে আরামে নতুন দেশ ভ্রমণের সুখটুকু পাওয়া যায় ষোলো আনা। ট্যুরিং কোম্পানীর প্রতিনিধিও ভাব দেখান যেন ইজিপ্টের রাজ-অতিথি এসেচেন। তাছাড়া প্রায় এক রাত্রের প্রোগ্রাম: খাওয়া, থাকা, বেড়ানো, গাড়ি ভাড়া, উটে চড়া, সব ঐ টাকার মধ্যে।

সাগর-নগর ধীরে ধীরে পোর্ট সৈয়দের এলাকায় যখন ঢুকলো, তখন বেলা প্রায় একটা। আজ এক ঘণ্টা আগে লাঞ্চ সারা হয়ে গেচে সবাইয়ের। সবাই প্রায় ঝুঁকে এসে দাঁড়িয়েচে ডেক-এর রেলিংয়ে। সাগর-নগর হেলে গেচে নাকি?

এই বন্দর থেকেই সুয়েজখালের শুরু। এই খালের সৃষ্টি-কর্তা ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ গু লেশেপ্‌স-এর বিরাট স্মৃতিমূর্তি দাঁড় করানো বন্দরের মুখেই। হয়তো তাঁর আত্মা এই মূর্তিকেই আশ্রয় করে দিবারাত্র গণনা করচে পশ্চিম থেকে ক'খানা জাহাজ গেলো পূবে আর পূব থেকেই বা এলো ক'খানা? পুব-পশ্চিমের সর্টকাট এই সুয়েজ ক্যানেল। এই ক্যানেলেরই জন্ম হওয়ায় ঐ ওধারের

ঊত্তমাশা আজ হয়েছে কানা। মানুষের আশা-ভরসা অবিরত বয়ে চলেচে ঐ সুয়েজ ক্যানেলের একফালি সরু স্রোতের জল ধারায়! পূব-পশ্চিমের হ্যাণ্ড-শেক করবার স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েচেন ঐ ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার। বিশ্বের নমস্য ব্যক্তি।

পার্শার অফিস তাদের নোটিশ বোর্ডে জানিয়ে দিয়েচে, নিজের নিজের ঘড়ি একঘণ্টা করে এগিয়ে নিতে। ক্রমেই এগিয়ে চলেচি পুবের দিকে, সূর্যিমামার জন্মভূমির দিকে—কাজেই সময়-রাজার সম্মানে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়া—এ আর এমন কথা কি?

অতি সন্তর্পণে সাগর-নগর এসে দাঁড়ালো মাটির নগরের খানিক তফাতে। একটু দূরে থাকাই ভালো হয়তো, বেশি ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়। আত্মীয়তা দূর থেকেই জমে, কাছে এলেই কমে।

মিশরযাত্রী এবং যাত্রীরা মিশরী-পাণ্ডার সঙ্গে ষ্টিমলঞ্চে নামলেন সাগর-নগরের প্রায় ছ'শো যাত্রীর মধ্যে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ জন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে জন কুড়ি, 'বাতরি'-কে একেবারে গুডবাই জানিয়েই নামলেন। তাঁদের টিকিট ঐ পর্যন্তই। তাঁদের যাত্রা হলো শেষ।

দর্শনার্থীদের মধ্যে নামলেন মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন, কে-জি, ডাঃ মহাবিষ্ণু সেন, সানিয়াল, বেঁটে কে. এম. শা, রামস্বামী, ফার্স্ট ক্লাস থেকে স্বামী জ্ঞানানন্দ, মিসেস টি· ডবলিউ· হোর এবং আরো অনেকেই।

ক্যানেল কোম্পানীর অফিসের পাশ দিয়ে ষ্টিমলঞ্চখানা ভটভট করে এসে থামলো ডাঙায়। যাত্রীরা নামলেন। আর ততক্ষণে ডাঙার ডিঙি নৌকোয় চড়ে মিশরী-ব্যবসাদাররা তাদের সওদা নিয়ে নিয়ে ভিড়েচে গিয়ে সাগর-নগরের লোহার দেওয়ালের গায়ে। নীচে থেকে ছুঁড়ে দিয়েচে দড়ি জাহাজের ডেক-রেলিংয়ের সঙ্গে। তাতে থলি বেঁধে তার মধ্যে মাল ভরে পাঠিয়ে দিচ্চে প্রায় চারতলা উঁচু

প্যাসেঞ্জার ডেক-এ। ভাবটা: মাল দেখে দাম দাও।

বিশ্বাস করেই ছেড়ে দিচ্চে জিনিস। জানে তারা, যারা এই জাহাজের যাত্রী, যারা এত পয়সা খরচ করে যাতায়াত করচে, তারা সামান্য কয়েক টাকার জিনিস নিয়ে কেবিনে গিয়ে দরজা 'লক' করে বসে থাকবে না। তাছাড়া জাহাজে আর পাঁচজনও তো আছেন।

ইয়েস স্যার, টেক স্যার, ভেরি গুড স্যার!—নীচের ডিঙি থেকে ব্যবসায়ীদের সরব আবেদন।

চামড়ার নক্সা করা ব্যাগ, জুতো, মনিব্যাগ, মিশরের হাতের কাজ করা বহু রকমের জিনিস দড়ি বেয়ে উপরে উঠচে আর নামচে। দামে বনলে কেবিনে ঢুকচে।

এ তো ইংল্যাণ্ড নয়, মিশর। শো-কেস নয়, ডিঙি নৌকো। এখানে দামদস্তুর চলে। এক পাউণ্ডে প্রায় সাতানব্বই পিয়াস্তার হিসেবে পাউণ্ড-শিলিংএ দাম হাঁকচে ব্যবসাদার। আর তার অর্ধেক দাম বলচে সাগর-নগরের নাগরিকরা। হয়তো পেয়েও যাচ্চে জিনিসটা সেই দামে। ভাবচে, খুব জিতলাম। ব্যবসাদারও মুখে বলচে বটে, লস স্যার। অলরাইট, টেক স্যার।—আর মনে মনে ভাবচে হয়তো, যাক গছানো গেচে ভালো দরেই!

পোর্ট সৈয়দের কাষ্টমস্-এর বেড়া পার হবার জন্যে যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁদের বাদ দিয়ে দর্শনার্থীরা প্রায় জন পঁচিশেক। ছ'খানা বড় ট্যাক্সি চেপে তাঁরা গাইডের সঙ্গে চললেন রাজধানী কায়রোর দিকে।

সরু সুয়েজ ক্যানেলের ধার দিয়ে দিয়ে পীচ ঢালা রাস্তা। একটানা সোজা পথ। সান বাঁধানো সুয়েজ খাল আর পীচ ঢালা পথটা যেন কম্পিটিসন দিয়ে চলেচে। পথের দুধারে গাছের সারি।

ইসমালিয়া পর্যন্ত সুয়েজের পাড় দিয়ে দৌড়ে পথটা বেঁকে গেলো ডাইনে—কাইরোর দিকে। হু হু করে চলতে লাগলো

পর-পর মোটরের দল। ইজিপ্টের মরুভূমি দিয়ে উটের সারি—ক্যারাভান চলে মন্থর গতিতে। আর ইজিপ্টের পীচ-পথ বেয়ে বায়ু-গতিতে চলে আমেরিকান মোটর গাড়ি—সারি সারি। সে যুগ আর এ যুগের যান সমান সম্মানে বিরাজমান এই মিশরে।

পথের দুপাশে দেখা গেলো এলোমেলো মাটির বাড়ি, চায়ের চালা ঘর, চাষীর আস্তানা, মিশরের দারিদ্র্য। প্রাক্তন রক্ত-শোষা রাজা ফারুকের চর্বিত ছিবড়ে!

পোর্ট সৈয়দ থেকে কায়রোর পথ একটুখানি নয়। হাওয়াই গাড়িতেই পাকা পাঁচ-ছ'ঘণ্টা লেগে যায়। অবশ্য মাঝে একটা রেষ্টুরেণ্টে মিনিট পনেরো দাঁড় করানো হয় হাত-পাগুলো একটু মেলবার জন্যে, কোমরটা একটু টানটুন করবার জন্যে। তাছাড়া জলতেষ্টা, বাথরুম পাওয়া, চায়ের জন্যে চিঁ-চিঁ করা—অনেক কিছুই তো আছে। তাই মাঝে একবার ইনটারভ্যালের ব্যবস্থা।

সন্ধ্যের বেশ খানিকটা পরেই গাড়িগুলো বিদেশী যাত্রীদের নিয়ে ঢুকলো কায়রো সহরে। বিরাট সহর। বেশ চওড়া রাস্তা। পরিষ্কার পথ ঘাট। সর্বত্র আলো ঝলমল। আর সব চাইতে আশ্চর্য, বহু বিরাট অট্টালিকা। দশ থেকে পনেরো তলা বাড়ি যেন আগাছার মতই সর্বত্র।

নীল নদের ধারে বিরাট হোটেল—গুইজিরা প্যালেস হোটেল। সত্যিই প্যালেস হোটেল : চোদ্দ তলা বিরাট প্রাসাদ। গেটে জরির লাল পোষাক পরা দারোয়ান। সদর দরজা থেকে ভেতর তক লম্বা পাতা লাল কার্পেট।

ট্যাক্সিগুলো এসে দাঁড়ালো হোটেলের সামনে। নামলেন সাগর-নগরের নাগরিকরা। রিসেপসনিস্ট ছুটে এসে সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁদের নিয়ে গেলেন ভেতরে।

ট্যুরিং কোম্পানী আগে থেকেই হোটেলে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কাজেই কেউ কোনো রকম মাথা না ঘামিয়ে ছোট-ছোট দলে লিফ্‌টে চড়ে উপস্থিত হলেন নিজেদের কামরায়। হোটেলে বয়রা সব ব্যবস্থা করে দিলো। এ যেন, সারাদিনের কাজ সেরে নিজের ঘরে ফেরা।

এক-এক ঘরে দু'জন করে থাকবার ব্যবস্থা। পুরু গদিমোড়া ডবল বেড। ড্রেসিং টেবিল। হট-এণ্ড-কোল্ড ওয়াটারের ব্যবস্থা। দরজা-জানলায় ভেলভেটের পর্দা। পাশে টিপয়ে টেলিফোন।

পায়ে হাঁটলে ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক। তবে দেড়শো মাইল একটানা মোটরে এলেও শরীরটা যে চাঙা থাকবে তার কোন মানে নেই।

ঝড়ের মত এগুতে গেলে যাত্রা-শেষে শরীরটা আর ঝরঝরে থাকে না—ঝড়ঝড়ে হয়ে যায়। কাজেই ঘরে ঢুকে অনেকেই প্রথমে যা করলেন—ধড়াচুড়ো নিয়েই নরম এবং পরম আরামের বিছানায় দেহটাকে দিলেন এলিয়ে। আ-আ-আঃ।

কিন্তু চলার পথে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা দৃষ্টিকটু, বিবেকবিরুদ্ধ ব্যাপার। কাজেই এক সময়ে সবাই প্রায়ই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন। বেসিনে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলেন, চুলটা আঁচড়ে নিলেন, মেয়েরা ঘষে নিলেন গালে একটু পাউডার।

মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন স্বভাবতই একটি ঘর পেয়েচেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ আর রামস্বামী ঢুকচেন একঘরে। কে-জি আর সানিয়াল একটা ঘর ঠিক করে নিয়েচেন। ডাঃ সেন আর কে এম শা আর এক ঘরে। এমনিতর অন্যান্য ঘরে আরও অনেকেই।

ডাইনিং রুমে টেবিল সাগানো হয়েচে।

সাগর-নগরের লাঞ্চ হজম হয়েচে কখন! মিশরের ডিনারের

জন্যে সকলেরই উদর উদ্‌গ্রীব। বোঝা গেলো হোটেলওয়ালাও এবিষয়ে উদাসীন নয়। শুধু তাই নয়, টেবিলের খাদ্যসম্ভার দেখে এও বোঝা গেলো—এরা ডানহস্তের ব্যাপারে রীতিমত উদার, অতিথি-পরায়ণ।

স্যুপ, রুটি, মাখন, চীজ এবং সেই সঙ্গে মিশরের বিশেষত্ব—পোলাও, কাবাব, স্যালাড, দই। তাছাড়া আঙুর, আপেল, কফি, চা। সবাই যেন রাক্ষসের মত শুরু করলেন খাওয়া। পূর্বদেশীয় জিবগুলো রসালো হয়ে উঠলো। মাসের পর মাস সেদ্ধ খেয়ে, এখন মসলার স্বাদ পেয়ে মনে হলো যেন রক্তের স্বাদ পেয়েচে পোষা বাঘের বাচ্চা। পশ্চিমী জিবগুলোকে কাঁটা-চামচের সাহায্যে নেড়ে চেড়ে সাবধানে খেতে হলো : দিস মে বি হট, দ্যাট মে বি স্পাইসি। অসাবধানে কিছু খেলেই, দুদু-খাওয়া শিশুর মুখে ঝাল খাওয়ার দুরবস্থা ঘটবার সমূহ সম্ভাবনা।

রক্তের জোর যাদের কম, ডাইনিংরুম থেকে তাঁরা আবার সোজা গেলেন বেডরুমে। তাঁদের মধ্যে, রাত্রে কায়রোর অচেনা পথে ঘুরপাক খাওয়ায় লাভ নেই। 'শয়নে পদ্মলাভ'-ই বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁদের দলে মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন, মিসেস হোর, স্বামী জ্ঞানানন্দ এবং পঞ্চাশোর্ধ্বের আরো কয়েকজন।

তবে যারা এখনও যৌবন-চঞ্চল, বাধাকে অবাধে ঠেলে চলেন, জীবন যাত্রায় সবে শুরু—তাঁরা ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে সদর গেট দিয়ে পড়লেন কায়রোর আলো ঝলমল শান বাঁধানো পথে।

ডাঃ সেন, কে-জি, শা, সানিয়াল, রামস্বামী শুরু করলেন হাঁটা। লক্ষ্যহীন চলা। যে দিকে হোক গেলেই হয়। একটু দূরেই নীল নদের পুল। গেলেন সবাই সেই দিকেই। নীল নদ রাত্রের ভয়ে যেন কালো হয়ে আছে। দুই তীরে নৌকাগুলো নিঝুম, লঞ্চগুলো নিস্তব্ধ। তীরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে সব।

কায়রোর রাজপথ কিন্তু তখনো গমগমে। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সিগুলো ব্যস্ত। কাফেখানা সরগরম। সিনেমার মাইকে বাজচে গান। দোকানে চ'লেচে কেনা-বেচা। এ পথে-সে পথে লোক আর লোক। আলখাল্লা পরা ফেজ মাথায় সেকেলে লোক, সার্ট-প্যান্ট-কোট পরা একেলে লোক। বোরখা পরা সেকেলে নারী, বোরখা ছাড়া ঘাঘরা পরা একেলে মেয়ে। সৌন্দর্যের সব চলন্ত স্বাক্ষর। নীল নদের নীল নয়না।

বিদেশীরা এলোমেলো হেঁটে চলেচেন। তা বলে মিশরীরা তাঁদের দিকে হাঁ করে চেয়ে নেই। থাকবার কথা নয়। পূর্ব-পশ্চিমে চলাচল করেন যাঁরা, এ অঞ্চলে তাঁদের আসা-যাওয়া আছেই। কায়রোর ফুটপাতে তাঁদের পায়ের ধুলো পড়চে আজ থেকে নয়, বহুদিন থেকেই।

কে-জি বললেন, আচ্ছা, একটা সিনেমায় গেলে হতো না?

সানিয়াল দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, কেন, একদিন অন্তর জাহাজে সিনেমা দেখে আশ্ মিটচে না?

রামস্বামী বললেন, বরং কোন নাইট ক্লাব বা কাবারে-তে যাওয়া যাক। শুনেচি, এখানের নাচ নাকি দেখবার।

বেঁটে শা বললেন, সেই ভালো।

সেন, সানিয়াল দু'জনেই বললেন, মন্দ না প্রস্তাবটা।

প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলো। কিন্তু কোথায় নাইট ক্লাব? কোথায় কাবারে? কথায় আছে, যাদৃশী ভাবনার্যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী! আর এ তো রাতের নরকে যাবার বাসনা! গাইড মিলবে না!

মিলে গেলো। দু'জন মিশরী তরুণকে হাতের নাগালে পেয়ে রামস্বামী ইংরিজীতে জিগ্যেস করলেন গন্তব্যস্থানের কথা; এবং দেখা গেলো, তরুণ দু'জন ইংরিজী জানেন এবং বোঝেন। উপরন্তু এসব লাইনে ওয়াকিবহালও বটে।

বললেন তাঁরা, যাবে তো, কিন্তু বিদেশীদের পক্ষে ওসব স্থান খুব নিরাপদ নয়।

বেঁটে শা বুক ফুলিয়ে বললেন, সেই জন্যেই তো যাওয়া। মরদ আমরা, মরণকেও ভয় করিনে।

শফরি ফরফরায়তে। অতএব বাঁটকুল শা-ই তো শৌর্য দেখাবেন! সবাই হেসে উঠলেন।

তরুণদ্বয় বললেন, বেশ, চলো তবে। কাছেই আছে একটা নাইট ক্লাব। তবে সাবধান করে দিই, বেশি ড্রিংক ক'রো না তোমরা, বেশি টাকাও বার ক'রো না। ওখানকার মেয়েদের আমল দিয়ো না বেশি। তোমাদের দেখলেই তারা আলাপ করতে আসবে, ড্রিংক দিতে বলবে। কিন্তু ব'লো পয়সা বেশি নাই।—হেসে বললেন, মেয়েগুলো এক-একটা মদের পিপে! আরো বললেন, এসব আগে থেকেই শিখিয়ে রাখচি; কারণ, ওখানে সাবধান করা শক্ত, বুঝতে পারলে রাগ করবে!

কে-জি তাঁর পাইপে একটি দ্বিধাজড়িত টান টেনে বললেন, তবু যেতে হবে?

শা বললেন, হবে, হবে, নিশ্চয়ই হবে। জগৎটাকে দেখতে হবে।

সানিয়াল রসিকতা করলেন, পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে, ভালো ছেলে করে আর রাখিয়ো না ধরে!

ডাঃ সেন বললেন, অতএব দাও সবে লক্ষ্মীছাড়া করে!

তবে তাই হোক।—কে-জি ধোঁয়া ছেড়ে বললেন।

ইভাকুয়েশন ব্রীজের কাছে কোবানা অঞ্চলে আলোর মালা পরা 'সফিয়া-হেলমি'—নাইট-ক্লাব! মাদাম সফিয়া হেলমি এই নৃত্যশালার মালিকা। কায়রোর এই নাট-মন্দিরের বিশেষত্ব পেটের নাচ বা পৈটিক নৃত্য!

টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলেন সবাই। দুরু দুরু বুকে, ভুরু-কোঁচকানো চোখে। মাঝারি সাইজের হল। নরম সবুজ আলোয় ছায়া-ছায়া, মায়া-মদির ভাব। আনাচে কানাচে মৃদু মধুর সুরের মূর্চ্ছনা! সারা ঘরখানা যেন স্বপ্নালু। হলের এককোণে ছোট্ট একটা রঙ্গমঞ্চ।

আর দেওয়ালের ধারে ধারে কেবিনের সারি। সেখানে আধ-অন্ধকারে গেলাসে ফেনিল সুরা নিয়ে টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে প্রেমিক-প্রেমিকা। প্রেমিকা-প্রেমিকা বলা ভুল: কামিনী আর কামুক, নারী আর পুরুষ এসে জড়ো হয়েচে ক্ষণিক উত্তেজনার লোভে, ক্ষণিক আনন্দের আশায়! এযুগে পরম আনন্দের জন্যে মন্দির-মসজিদ-গির্জায় আর যায় না কেউ সহজে। তাই চরম আনন্দের জন্যে এই বার-বণিতার নাইট ক্লাব: সভ্যতার অভিশাপ!

বিদেশীদের ছোট্ট দল দখল করলো রঙ্গমঞ্চের সামনের আসন ক'টি। তাঁদের সঙ্গে বসলেন মিশরী তরুণ দু'জন!

রামস্বামী বললেন, ড্রিংকের অর্ডার দেওয়া যাক। কী বলো? মিশরীদের জিগ্যেস করলেন, ইজিপ্টের স্পেসালিটি কি?

মিশরকুমারদের একজন বললেন, ক্রু-দ্যু-তলেমি, সাদা রংয়ের ওয়াইন; লাল রংয়ের ওয়াইন, সাতু-গিয়ানাক্লিস কিংবা নেফারতিতি। ক্লস মারিয়াৎ বা ক্লস মাতামিরও ভালো, তবে কড়া!

সুরা-পরিচিতি শুনে কে-জি বললেন, আমার জন্যে কিন্তু বিশুদ্ধ বীয়ার। কারণ, এসব ক্ষেত্রে নিজেকে নিজের আয়ত্তে না রাখার মানে রীতিমত বিপজ্জনক দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়া!

শা বললেন, কাওয়ার্ড!

কে-জি বললেন, স্বীকার করচি।

রামস্বামী মিশরকুমারদের বললেন, তোমাদের যেটা ইচ্ছে বলে দাও।

তাই বলচি।—মিশরী একটি মেয়েকে ইশারা করতেই এগিয়ে এলো সে। তাকে কী যেন বলায় ট্রেতে করে নিয়ে এলো সুরা-ভরা বোতল, গেলাস, চাবি, স্যালাড ইত্যাদি। কে-জির জন্যে বীয়ার।

মাছ দেখে যেমন মাছি আসে, মদ দেখেই তু' তিনজন মেয়ে এলো কাছে। মুখে রংয়ের প্রলেপ, দেহে যৌবনের আমন্ত্রণ।

মে উই হ্যাভ দি প্লেজার অব ইয়োর কোম্পানী ?

ইংরিজী জানে মেয়েগুলি। আর জানে, অনুমতির অপেক্ষা না করেই পুরুষদের গা ঘেঁষে বসতে হয়। তবু ভালো, কোলে উঠে বসেনি তারা। কারণ, তেমন আচরণেরও তু'চারটি নমুনা ঘরের এখানে-ওখানে ছড়ানো। তবে, বিদেশীদের সঙ্গে প্রথমেই অতটা ঘনিষ্ঠতা করা হয়তো নিয়মবিরুদ্ধ।

সামনে কেউ বসে থাকলে, তাকে কিছু না দিয়ে মুখে তোলা যায় না সহজে। কাজেই বাড়তি গেলাস চেয়ে নিয়ে তাতেও ঢালতে হলো কিছুটা ফেনিল পানীয়। অবশ্য মদের পিপের পক্ষে ঐ পরিমাণটুকু বারি-বিন্দুমাত্র। তা হোক। দিয়ো কিঞ্চিৎ, না করো বঞ্চিত !

কিছু পেলে কিছু দিতে হয়। মেয়েরা তাদের হোস্টদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো ঃ তোমরা ইণ্ডিয়ান ?

হুঁ !

শা বললেন, আমি পাকিস্থানী।

গুড। ইণ্ডিয়ান, পাকিস্থানী গুড ! উই লাইক দেম।

অর্থাৎ পিঠে হাত বোলাবার পর মাথায় হাত বোলাবার চেষ্টা !

গেলাস ততক্ষণে খালি হয়ে গেচে। একটি মেয়ে রামস্বামীর হাঁটুর উপরে হাত রেখে বললো, আর এক রাউণ্ড হবে না ?

রামস্বামী পূর্ব-শিক্ষানুযায়ী পকেট দেখিয়ে বললেন, নো মনি !

মেয়েটি বললো হেসে ঃ ও, ইউ স্পীক লাই !

রামস্বামীও হেসে বললেন, নো লাই, সাচ্চা হ্যায়!

হোয়াট ?

কে-জি বীয়ারের গেলাস খালি করে গম্ভীর হয়ে পাইপ টানছিলেন। হেসে বাংলায় বললেন, এবার কেটে পড়ো খুকীরা, আর কেন ?

হোয়াট ?—এবার আর একটি মেয়ে প্রশ্ন করলো।

উত্তর দিলেন মিশরকুমারদের একজন তাঁদের ভাষায়। দেখা গেলো, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তারা। তবে যাবার সময় একটি ফাজিল মেয়ে শা-র চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে তাঁর মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললো: মাই লিট্‌ল জেণ্টলম্যান!

একটু পরেই মঞ্চের পর্দা উঠলো।

শুরু হলো নৃত্য। অর্ধনগ্ন নর্তকীদের লীলায়িত ভঙ্গীমা। সারা দেহে শুধু কামনার ইশারা।

রূপসী—তবু যেন পুরুষ-উপোসী তারা—এমনি ভাব, এমনি চোখের ভাষা! নরম মাংসের ঢেউ খেলালো দেহটাকে ক্ষণে-ক্ষণে এলিয়ে মেলিয়ে ধরচে পুরুষ-দর্শকদের কামাতুর চোখের সামনে। কখনো বা আত্মসমর্পনের ইঙ্গিত! বল্লুলতার আর দেহলতার সে কী আকুলতা! সেই সঙ্গে শুভ্র নগ্ন উদরের উদ্দাম চাঞ্চল্য: এই নৃত্যালয়ের বৈশিষ্ট্য!

ঢের হয়েচে! এবার চলো যাওয়া যাক।—কে-জি প্রস্তাব করলেন।

ডাঃ সেন বললেন, তা গেলে মন্দ হয় না। অনেক রাত হলো।

কিন্তু শা, সানিয়াল, দেখা গেলো, অনিচ্ছুক: থাকো না আরো খানিকক্ষণ।

রামস্বামী বললেন, কেন, বাড়িতে কি তোমাদের বৌ ভাত দিয়ে বসে আছে?

কে-জি কিছু বললেন না। তিনি ভাবছিলেন, মাতৃজাতির ঐ ধরনের প্রকাশ্য দেহ-প্রদর্শনী আর যেন বসে দেখা যায় না! ঐ নর্তকীদের সুগঠিত বক্ষযুগল, অনাবৃত নাভিদেশ, গুরু উরুদ্বয় দেখে মনে হচ্ছে, ওগুলি পুরুষের ভোগের নৈবেদ্য ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ঐ নাভিদেশই শিশুর গর্ভাশ্রয়, ঐ বক্ষসুধায় শিশুর ক্ষুধা-নিবৃত্তি, ঐ গুরু উরুর উপরেই শিশুর নিদ্রা ও বিশ্রাম—কিন্তু এসব দেখে সেসব ভাবতেই ভুলে যাচ্ছেন। দূর! এ নৃত্য, নারীত্বের অপমান!

উঠে দাঁড়ালেন কে-জি। দেখাদেখি উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ সেন।

অগত্যা আর সবাইকেও উঠতে হলো। এ দল বালির বাঁধের মতই পল্কা। সাময়িক উদ্দেশ্য নিয়ে এক সঙ্গে হওয়া—অন্তরের যোগাযোগের বাঁধুনি এখানে নেই। তাই বালির একাংশ খুলে এলে, ভেঙে গেলে, হুড়মুড় করে সবটাই ধ্বসে পড়ে। দল ভেঙে গেলো।

নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসছিলো দল। আধ-অন্ধকার করিডরে একটি জোয়ান মিশরী এসে দাঁড়ালো। সামনে ছিলেন রামস্বামী। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদু হেসে বললো, এনিথিং মোর ইউ ওয়ান্ট স্যার?

হোয়াট?

গুড গার্লস!

পাশেই শা ছিলেন। রামখোকার সখ কম নয়, শুনতে পেয়েই জিগ্যেস করলেন, হাও মাচ্?

পেছনে কে-জি হয়তো আঁচ করলেন ব্যাপারটা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, আবার এখানে দাঁড়ালে কেন? নাও, লেট্স গো!—বলেই প্রায় ঠেলে দিলেন সবাইকে।

মিশরী একপাশে সরে সেলাম করে দাঁড়ালো।

সবাই বেরিয়ে এলেন ফুটপাথে। মিশরী তরুণ দু'জন কে-জিকে বললেন, খুব ভালো করেচেন। নইলে সব খুইয়ে আসতে হতো।

কায়রোর রাজপথ তখন প্রায় নির্জন, নিস্তব্ধ। মিশরী দু'জন একটা ট্যাক্সি ডেকে দলটাকে উঠিয়ে দিয়ে, সবাইয়ের সঙ্গে হ্যাণ্ড শেক করে বিদায় নিলেন।

ট্যাক্সিতে শা বললেন, ঘোষ একটা বেরসিক।

কে-জি তাঁর পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে বললেন, তা রসিক-নাগর, থেকে গেলেই তো পারতে। কিন্তু ঐ রস-সাগরের হাঁটুজলই যে তোমার পক্ষে ডুবজল, সে খেয়ালে আছে?

সবাই হো হো হেসে উঠলেন।

পরদিন ভোর বেলার কায়রো কুয়াশায় ভর্তি। দু'হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না।

ট্যুরিং কোম্পানীর লোক এসে ব্রেকফাষ্ট খাইয়ে সবাইকে ট্যাক্সি বোঝাই করলো।

তবু ভালো, বেলা বাড়তেই ঘন কুয়াশা ফিকে হয়ে এলো। ট্যাক্সিতেই পিরামিড পর্যন্ত যাওয়া যেতো। তবে প্রোগ্রামে উটে-ওঠার ব্যবস্থা ছিলো। কাজেই গতি এখানে কাম্য নয়, কাম্য বৈচিত্র্যের। তাই সবাই হাসিমুখে ট্যাক্সির নরম গদি ছেড়ে উটের কুঁজের উপর লাফিয়ে উঠলেন উটওয়ালাদের সাহায্যে। সাজানো-গোছানো-ঘন্টা-বাঁধা উটগুলো হাঁটু মুড়ে বসেছিলো। মালেকের হাতে নাকে-বাঁধা দড়ির টান পেয়ে উঠে দাঁড়ালো অতি সন্তর্পনেই। পিঠে তাদের কাঁচা-সোয়ার উঠেচে, তা বোধহয় সোয়ারির আচার ব্যবহারেই বুঝে ফেলেচে উটগুলো, তাই এই সাবধানতা। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার ওরাও তো অংশীদার। ভদ্রতা ওদেরও অজানা নয়!

যাত্রীদের দোলানি খাইয়ে খাইয়ে উটগুলো গিজাতে পিরামিডের গোড়ায় এসে দাঁড়ালো। এই সেই পিরামিড। এতদিন যা ছবিতে বা ছায়াছবিতে দেখেছেন সবাই, আজ সেই পরম বস্তুটি বাস্তবাকারে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। আকাশের উদ্দেশে পৃথিবীর প্রাচীনতম নৈবেদ্য! রাজঐশ্বর্যসহ মিশররাজের পারলৌকিক রাজভবন! বিশ্বের বিস্ময়!

উটে চড়ে, উট থেকে নেমে ফটো তুললেন সবাই। আহা, এই পরমক্ষণকে আলোছায়ায় বন্দী করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পাথরের পর পাথর সাজানো বিরাট পিরামিড। শান্ত, গম্ভীর, ঊর্ধ্বমুখী।

একধারে সুড়ঙ্গ গলিপথ। মাথা উঁচু করে যাবার উপায় নেই। সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। রাজ সমাধিতে মাথা উঁচু রাখা অন্যায়, দৃষ্টিকটু। সুড়ঙ্গ পথটি অন্ধকার, সরু, অস্বস্তিকর। কিছুটা গিয়েই ফিরে এলেন সবাই। যদিও গাইড মোমবাতি জ্বালিয়ে পথ দেখাচ্ছিলো, তবু মনে হলো তাঁদের, বুঝি মৃত্যুর দুয়ার অদূরেই। পার্থিব ভদ্রলোকেরা তাই পৃথিবীর আলো-হাওয়াতে ফিরে আসাই যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন।

একটু দূরেই নর-সিংহের প্রস্তর মূর্তি: স্ফিনিক্স। মহাকালের ঝড়ঝাপটা অগ্রাহ্য করে আজও থাবার উপর ভর করে বসে আছে। বুঝি দেখছে: পৃথিবীর কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকগুলোর পশুপ্রবৃত্তি, তাদের পাশবিক ব্যবহার। নর-পশুটি নিজেও বুঝি বিস্মিত!

ন্যাও, স্যারস্, লেটস্ গো টু মিউজিয়াম।—গাইডের নির্দেশমত এবার সবাই ট্যাক্সিতে।

ইজিপ্সিয়ান মিউজিয়াম। মিদান এল্ তহ্রির।

সেকালীন মিশরীয় সভ্যতার বাস্তব-চিহ্নগুলি সযত্নে সংরক্ষিত। টুটানখামেনের রত্নরাজি, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাট-আলমারি, বসন-

বাসন, শাসনযন্ত্র, তরবারি, তীর-ধনুক—হরেক রকমের দ্রষ্টব্য। শুধু সোনা আর সোনা। টিনের পাতের মতই যেখানে-সেখানে ব্যবহৃত।

মমি। দু'চার হাজার বছর বয়েসের পুরোন মৃতদেহকে কী অপূর্ব কৌশলে মহাকালের নাগালের বাইরে রাখা হয়েচে! বৈজ্ঞানিক প্রহেলিকা।

সত্যিই যাদুঘর। একালের দর্শকরা যেন কোন যাদুমন্ত্রে চলে গেচেন সেকালের সোনার যুগে—টুটানখামেন, ক্লিয়োপেট্রার যুগে! কারোর মুখে যেন কথা নেই, চলা-ফেরায় চাঞ্চল্য নেই। শুধু দেখা—দেখে যাওয়া। চোখ ভরে দেখে যাওয়া, মন ভরে নিয়ে যাওয়া। সবাই যেন আপন-আপন সংগ্রহ মনের স্মৃতি-ভাণ্ডারে ভরে নিতে ব্যস্ত।

চমক ভাঙলো গাইডের ডাকে: ন্যাও, টু বাজার প্লাজ, হারি আপ।

সবাই বুঝি মাটিতে ধপাস করে পড়লেন।

বাজারে! কেনা-বেচা। হৈ-হল্লা। যেখানে শুধু—প্লীজ কাম, প্লীজ সী, প্লীজ টেক, ভেরি গুড্, ভেরি চীপ।

এমনিই চলতো কি সেকালের মিশরের বাজারে? হয়তো। কেনা-বেচা, লেন-দেন, দর-দাম কি মানুষের সমাজে আজকের আবিষ্কার! হাজার-হাজার বছরের প্রাচীন প্রথা। তবে সেই পুরোন ব্যবসা-বৃক্ষ আজ বহু-পল্লবিত, বহু শাখায়-শাখায় সুবিস্তৃত।

মাস্কি-বাজার কায়রোর সেরা বাজার। কাছাকাছি আরব দেশের বহু বাজারের তুলনায় গণ্যমান্য পণ্যস্থল। বাজারের সরু সরু পথের দুধারে দোকানের সারি। দোকানে-দোকানে মিশরে-প্রস্তুত হাজারো রকমের দ্রব্যসম্ভার: কার্পেট, চামড়ার জিনিস, শিল্প, চীনামাটির বাসন, রঙীন-পাথর, পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলনা, আরো কত কি!

খান-খালিল বাজারে কাফেখানাই বেশি। রেষ্টুরেণ্টের ছড়াছড়ি। টার্কিশ কফি আর পার্শিয়ান চা চেখে দেখবার সুযোগ এখানেই। সৌখারিয়ে-র বাজারে টার্কিশ-ডিলাইট আস্বাদন করবার জন্যেও অনেক ভোজনবিলাসীদের ভিড়।

সুক-এল্ নাহাস্, সুক-এল্-সগ্ হা-র বাজার যথাক্রমে লোহা, তামা, পিতলওলা এবং স্বর্ণশিল্পীদের হাতুড়ির আওয়াজে সরগরম। ঘুরিয়ে-বাজারে বিশ্বখ্যাত ইজিপ্সিয়ান কটন আর থান কাপড়ের বিরাট আড়ত।

সাগর নগরের কয়েকজন নাগরিক ঘুরে-ফিরে দেখলেন যতটা পারলেন এবং নিজেদের মনিব্যাগের ভার কমিয়ে হাতের বা কাঁধের ব্যাগ করলেন ভারি। মিশর-বাজারের লক্ষ্মী এই সব বিদেশীরা। এদের পদধ্বনিতেই মিশরের ব্যবসা মহলে জেগে ওঠে সাড়া; বাজারে বাজারে দেখা দেয় চাঞ্চল্য।

মিশরের গা ঘেঁষে বয়ে চলেচে সুয়েজ খাল। কাজেই বিদেশী জাহাজকে ছুঁয়ে যেতে হয়ই এই দেশটাকে। আর যাবার সময় দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে যায় বৈদেশিক মুদ্রা, পরিবর্তে ঘরে নিয়ে যায় মিশরের স্মৃতি চিহ্ন—সুভ্যেনির।

গাইড জানালো, এইবার বিদায় বেলা। দুপুরে হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে উঠতে হবে ট্যাক্সিতে। তারপর কায়রো-সুয়েজ পথ ধরে সোজা সুয়েজ সহরে। 'বাতরি' ততক্ষণে সুয়েজখাল বেয়ে এসে পড়বে সুয়েজ সহরের মুখে। তবে জাহাজ নোঙর করে না সুয়েজ বন্দরে, অতি ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। লঞ্চে করে উঠতে হয় চলতি জাহাজের ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের ডেক-এর উপর। অতএব —

এসব যে যাত্রীদের অজানা ছিলো, তা নয়। তবু কায়রোর

বিচিত্র সুন্দর সহর দেখতে দেখতে কারোরই প্রায় যাবার কথা মনে ছিলো না। তাছাড়া সঙ্গে যখন গাইড আছে, তখন যাবার তাড়া দেবার ভার তারই উপরই থাক না কেন? আসলে ঘুম ভাঙাবার লোক থাকলে আরাম করেই ঘুমোনো যায়।

গাইড বললো, একটু তাড়াতাড়ি না করলে জাহাজ মিস্ করবার সম্ভাবনা।

জাহাজ মিস্! সবাই যেন হুঁসিয়ার হলো। এই জাহাজ-মিস্ আর ট্রেন-মিস্ করার মধ্যে যে অনেক পার্থক্য!

কায়রো-সুয়েজ পথটা কর্কশ, কঠোর, শুকনো। রুক্ষ মরুভূমির বুক-চেরা কালো পীচের পথ! পথ আর পথ। দু'ধারে ধূ-ধূ করচে বালি আর পাথর, আগুনের হল্কা-হাওয়া—মরু প্রান্তরের হাহাকার! বুঝি বিদেশীদের বিদায় দেওয়ার দীর্ঘশ্বাস!

হু-হু করে চলেচে ট্যাক্সিগুলো। মার্কিনী হাওয়া-গাড়ি। যান্ত্রিক সভ্যতার অহমিকার অভিযান। উটের একদিনের পথ এক ঘণ্টায় পাড়ি দিচ্চে। পৌঁছুতে হবে সাগর পারে। ঠিক সময়ে পারবে তো!

যাত্রীদের মুখে কথা নেই। লাঞ্চের পর ভরা পেট আর ভারি মন নিয়ে তাঁরা ট্যাক্সিতে উঠেচেন। গদি হেলিয়ে বসে আছেন কেউ, কেউ বা এলিয়ে পড়েচেন ঘুমের ছোঁয়ায়। ধূ-ধূ করা মরুপথও যে দেখবার সে ধারণা থাকলেও, উৎসাহ নেই আর!

সুয়েজ বন্দর এসে গেলো।

ছোট্ট সহর। সুয়েজখালের পূর্ব মুখের প্রহরী। খালের নামেই এর নাম। কিংবা এই সহরটুকুর নামেই খালের নাম! সে তর্কের প্রয়োজন নেই। স্বনামখ্যাত দু'জনেই! নেমে জানা গেলো, 'বাতরি' এখনো আসেনি। ক্যানেল অফিস আরো জানালো,

আসতে দেরি হবে। খালের মুখে জাহাজের ভিড়। ট্রাফিক্ জ্যাম্‌ড্‌! এ তো কায়রোর রাজপথ নয় যে কান ঘেঁষে ওভারটেক করে বোঁ করে বেরিয়ে যাবে! পর পর লাইন ধরে যেতে হবে। একটির পর একটি জাহাজ।

দলের সবাই হৈ-হৈ করে উঠলেন, এ কী রকম? আগে জানলে আমরা আরো কিছু সময় কায়রোতে কাটিয়ে আসতে পারতাম!

গাইড বললো, আমরাই বা জানবো কেমন করে? এখনও জানিনে ঠিক কখন আসবে জাহাজ। আপনাদের এখন জাহাজে সেফ ডেলিভারি দিতে পারলেই আমাদের ছুটি। অর্থাৎ আপনাদের সঙ্গে আমাদেরও এখন দুর্ভোগ ভুগতে হবে।

যাক। তবু ভালো। সবাইকে ফেলে লোকটা পালাবে না। দুর্ভোগ ভোগবার ভাগীদার পাওয়া গেলো। দেখে সবাই শান্ত হলেন। একবার চেয়ে দেখলেন সুয়েজখালের বিরাট চওড়া মুখের দিকে: নাঃ, 'বাতরি'র দেখা নেই।

জায়গাটি বড় মনোরম! জলের ধারটা শান বাঁধানো। তাতে ছলাৎ-ছলাৎ লাগচে নীল জলের ঢেউ। ধার দিয়ে বরাবর ঘাসের আস্তরণ। তারই উপর মাপা দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে পাম গাছের সারি। তার পাশে পাতা পীচের পালিশ পথ। পথের ওপাশে পাকা বাড়ি আর বাড়ি: ডাকঘর, অফিস, দোকান, গুদাম ইত্যাদি।

কাছেই সিনাই হোটেল।

গাইড বললো, আপনারা ইচ্ছে করলে ঐ হোটেলের লাউঞ্জে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। এজন্যে কোন চার্জ দিতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করে এসেচি। তবে রাত্রে যদি থাকতে হয়, তবে ডিনার চার্জ লাগবে।

সত্যিই তো, বাড়তি একবেলা এতগুলো লোকের খাওয়াবার খরচ তো কম নয়! জাহাজ যদি ভিড়ে আটকে যায়, তাতে ট্যুরিং

কোম্পানীর কী দোষ! তবু তো থাকবার ভালো ব্যবস্থাই করেচেন ভদ্রলোক। অগত্যা প্রস্তাব মেনে নিলেন সবাই।

খবর পাওয়া গেলো, 'বাতরি' রাত বারোটার আগে পেঁছুবে না।

কাজেই ফাঁক বুঝে সানিয়াল, ডাঃ সেন, কে-জি, শা এবং আরো আট-দশজন চললেন মাইলখানেক দূরে সুয়েজ শহর দেখতে। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী স্বামী জ্ঞানানন্দ, মিসেস হোর, তাছাড়া মিঃ আর মিসেস গ্র্যাটন এবং আরো কয়েকজন হোটেলের লাউঞ্জে বসে থাকাই স্থির করলেন। হয়তো ভাবলেন, কী জানি, যদি জাহাজ চলে যায়!

সুয়েজ শহরটা ছোট্ট। তবে দু'তিনটে সিনেমা আছে, বাজার আছে, ছোট-বড় বাড়ি আছে, চওড়া সরু রাস্তা আছে—অর্থাৎ শহুরে হতে হলে যা-যা থাকা দরকার—সবই আছে। হ্যাঁ, মোটর গাড়িও আছে। তাছাড়া আছে জগৎজোড়া নাম। সেটা কম কথা নয়। এই সুয়েজ শহরের চাইতে কত তো বড় বড় শহর আছে এই দুনিয়ায়—কিন্তু এমন এক ফোঁটা শহরের বিশ্বব্যাপী নাম আছে কারোর? সুয়েজ খালের 'খালিফ' এই শহরটা। শহরের কোট-প্যাণ্ট আর আলখাল্লা পরা লোকগুলোর ভারি অহংকার ঐ এক ফালি খালের জন্যে!

শহর দেখে এবং কেক-বিস্কুট, কফি-কলা দিয়ে ডিনার সেরে সন্ধ্যের পরে ফিরলেন সবাই। যাক, জাহাজ মিস্ করলেন না তাঁরা। লাউঞ্জে বসে হাত-পা নেড়ে শুরু করলেন গল্প। লাউঞ্জে-বসা আর সবায়ের নমো-নমো ডিনার সারা হয়ে গেচে হোটেলেই। তাঁরা শ্রোতা হলেন শহর ঘোরা বক্তাদের। এই তো নিয়মঃ নো রিস্ক নো গেন। যাঁরা কপাল ঠুকে বেরিয়ে গেছলেন, তাঁরা তাল ঠুকে শুরু করলেন গল্প।

কে-জির সঙ্গে মিসেস হোরের গল্প হচ্ছিলো। হোটেলের বয়কে দিয়ে দু'কাপ কফিও আনানো হয়েচে।

কথায়-কথায় মিসেস হোর বললেন, আপনার সঙ্গে, মিঃ গস্, আলাপ হয়ে ভারি আনন্দিত হলাম।

কে-জি বললেন, আমিও!

মিসেস হোর বললেন, আমি ইণ্ডিয়ানদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। অমন ইন্টেলিজেন্ট পিপল হোল্ ওয়ার্ল্ডে আর আছে কিনা সন্দেহ।

কে-জি বললেন হেসে, থ্যাংকু মিসেস—

হোর!—মিসেস বললেন, আমার নাম মিসেস টি. ডবল্যিউ. হোর। আমি স্যার স্যামুয়েল হোর-এর রেলেটিভ।

কে-জি বললেন, স্যার স্যামুয়েল হোর-এর নাম ইণ্ডিয়ায় অত্যন্ত সুপরিচিত।—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি গৌরব বোধ করচি।

ও, নো নো!—মিসেস হোর তাড়াতাড়ি বললেন, আমি এমন কিছু নই মিঃ গস্। আমি সাধারণ মহিলা মাত্র। যাচ্চি দেলহীতে আমার বান্ধবীর আমন্ত্রণে। সেখান থেকে ইচ্ছে আছে লর্ড কৃষ্ণার বার্থ প্লেস এবং কুরুকশেত্রা ব্যাটলফিল্ড দেখবার।

একটি বনেদী নীলরক্তের ইংরেজ মহিলার মুখে কৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্রের কথা শুনে কে-জি যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হলেন: আপনি বলেন কি মিসেস হোর! আর ইউ রিয়েলি ইন্টারেস্টেড্ ইন আওয়ার লর্ড কৃষ্ণ এণ্ড কুরুক্ষেত্র?

মিসেস হোর বললেন, ইয়েস মাই ফ্রেণ্ড, আই অ্যাম!

এমন সময়ে সেখানে ডাঃ সেন আসতেই কে-জি বললেন, ওহে, তোমাদের মক্কেল দু'জনকে এই টেবিলে ডাকো না?

কাদের কথা বলচো?

ঐ যে বসে আছেন মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন, বই পড়চেন। আমাদের দেশ আর ধর্মের বিষয়ে ওঁদের যে ধারণার কথা বলছিলে

সেদিন, এই ইংরেজ মহিলার মুখে অন্যরকম শুনলে ধারণাটা বদলে যেতে পারে।—কে-জি পরিচয় করিয়ে দিলেন : মিসেস টি. ডবলিউ হোর, ডাঃ এম. বি. সেন—মহাবিষ্ণু সেন।

বিষ্ণু! এনাদার নেম অব লর্ড কৃষ্ণা! ইজণ্ট ইট?

রাইট ইউ আর!

ডাঃ সেন বললেন, জাস্ট এ মিনিট, মিসেস হোর। আমার পরিচিত ঐ ইংলিশ কাপ্‌ল মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস গ্র্যাটনকে এখানে ডেকে আনি! আই থিংক ইউ উইল বি গ্ল্যাড টু মীট্‌ দেম্‌!

ডাঃ সেন গ্র্যাটন-দম্পতিকে ডেকে এনে পাশের দু'টো চেয়ার টেনে বসালেন। কে-জি তাঁদের আলাপ করিয়ে দিলেন মিসেস হোরের সঙ্গে। অর্ডার হলো আরো তিন কাপ কফির।

ডাঃ সেন বললেন গ্র্যাটন-দম্পতিকে : মিসেস হোর হিন্দু রিলিজিয়ানের বিষয়ে অনেক কিছুই জানেন এবং ইণ্ডিয়ায় গিয়ে—

মিসেস হোর তাড়াতাড়ি বললেন, ও নো, আমি হিণ্ডু রিলিজি-য়ানের বিষয়ে তেমন কিছুই জানিনে। তবে চেষ্টা করচি জানবার। আমার ষোলো বছর বয়েস যখন তখন থেকেই ডেলি 'গীটা' পাঠ করচি, অবশ্য ইংলিশ ভার্সনে!

কে-জি জিগ্যেস করলেন, ডেলি পড়চেন?

ইয়েস।—আজ মর্নিংএও পড়েচি। আমার বয়েস এখন ওভার ফিফটি, কিন্তু মনে পড়ে না, একদিনও গীটা-পাঠ বাদ দিয়েচি।

মিসেস গ্র্যাটন বললেন, রিয়েলি ভেরি ইণ্টারেষ্টিং!

মিসেস হোর বললেন মিসেস গ্র্যাটনকে : তার কারণ হচ্চে, ঐ ছোট্ট বইখানি পড়ে আমি অসীম তৃপ্তি পাই। আমার পাঁচটি ছেলে মেয়ের মধ্যে এখন মাত্র একটি ছেলে বেঁচে আছে। শীঘ্রই তার অল্ডারম্যান হবার চান্স আছে। স্বামীকেও হারিয়েচি বেশ কয়েকবছর আগে—কিন্তু ঐ ছোট্ট বইখানি গীটা-র উপদেশ মনে

গেঁথে থাকায় শোকে মুশড়ে পড়িনি কোনদিনও।

মিসেস গ্র্যাটন আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন, কী এমন আছে ঐ গীটায় জানতে পারি কি?

শুনে মিসেস হোর মৃদু হাসলেন। সে কি এখনই, এতটুকু সময়ে বলা যায় মিসেস গ্র্যাটন! আমি তো সারা জীবন ধরে পড়লাম, পড়চি—তবু যেন প্রতিবারেই নতুন হয়ে, নতুন ভাবে ভেসে ওঠে আমার মনে। গীটা-র যত রকম ইংলিশ ভার্সনে এক্সপ্ল্যানেসন আমি পেয়েচি, তা কিনেচি আর পড়েচি। ইণ্ডিয়াতে গিয়ে আরো কোন ভার্সন পেলে কিনবো ইচ্ছে আছে।

মিসেস গ্র্যাটন বললেন, সত্যিই মিসেস হোর, ইউ আর রাইট। আমি এক লাফেই স্বর্গে উঠতে চেয়েছিলাম। আমি বম্বে গিয়ে গীটা কিনে পড়বার চেষ্টা করবো।

মিসেস হোর বললেন, ইয়েস, দ্যাটস রাইট মিসেস গ্র্যাটন। পড়ে দেখবেন অপূর্ব মাধুর্য, অপূর্ব রস, অপূর্ব ভাব, অপূর্ব ভাষা। পড়তে পড়তে নিজেকে ভুলে যেতে হয়, এই ওয়ার্ল্ডকে ভুলে যেতে হয়। আমাকে নেবাররা বলতো, তুমি যে এত শোক পেলে, তবু ভেঙে পড়োনি তো? তেমনি খাচ্চো, দাচ্চো, হাসচো, বেড়াচ্চো? আমি তাদের আমার ছোট্ট গীটাখানি বার করে দেখিয়ে বলতাম, সবই এই বইখানির কৃতিত্ব। তারা বুঝতে পারতো কিনা কে জানে, আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতো! মিসেস গ্র্যাটন, আপনি গীটা পড়বার চেষ্টা করবেন জেনে ভারি খুশি হলাম। পড়বেন, দেখবেন এই ওয়ার্ল্ডের কোনরকম ট্রাবলসই আপনাকে দমিয়ে দিতে পারবে না। মনে পাবেন ডিভাইন পীস—শান্তি।

থ্যাংকু মিসেস হোর!—মিসেস গ্র্যাটন বললেন।

মিঃ গ্র্যাটন এতক্ষণ গালে হাত দিয়ে সব শুনছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, গিন্নি 'হিণ্ডু' হয়ে যাবেন না তো! লণ্ডনে রামকৃষ্ণ-

মিশনে দু'চারজন গেরুয়া-পরা ইংলিস লেডিজও তিনি দেখেননি যে তাও নয়।

ডাঃ সেন ভাবছিলেন, যাক, নিজেদের জাত-বহিনের মুখ থেকে গীতার কথা শোনায় ভালোই হলো।

আর কে-জি ভাবছিলেন, ছি, ছি, একজন বেদেশী মহিলা গীতা এমন করে পড়চেন আর পড়চেন; অথচ নিজে তিনি একবারও পুরো গীতাখানি পড়েননি এতটা বয়েসেও। নাঃ, এবার কলকাতায় গিয়ে অন্তত গীতার বাংলা অনুবাদটা পড়েও বোঝবার চেষ্টা করবেন। ভাবটা: 'হে ভারত, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পর-ধন-লোভে-মত্ত করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'!

নাঃ, 'বাতরি'র দেখা নেই!

সাগর-নগর কি সাগর সাঁতরে এসে শেষকালে খালে ডুবে মরলো! নাকি, অকুলে গেলো ভেসে? জনকয়েক নাগরিকদের কথা ভুলে গেলো নাকি সাগর-নগর!

রাত্রের নিস্তব্ধতা নেমে এসেচে। হাল্কা আঁধার। সারা আকাশে চুমকি-তারা। বাতাসে শীতের আমেজ।

রাত্রি দশটা, এগারোটা, বারোটা—একটা বাজালো। গাইড মাঝে মাঝে ফোনে খবর নিচ্চে কোম্পানীর অফিসে: না, এখনো দেরি আছে! বোধহয় কাল সকালের দিকে 'বাতরি' আসবে সুয়েজ খালের এমুখে। উপায় কি? প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় নেই। এ তো মাটির নগর নয়, যে, নাগরিকরা পায়ে হেঁটে পৌঁছুবে সেখানে। সাগর-নগরের সবই উল্টো। এক্ষেত্রে সাগর-নগর এগিয়ে আসবে, ভেসে আসবে নাগরিকদের কাছে, তবেই তো! এখানে পৌঁছুবার ভার সাগর-নগরের, নাগরিকদের নয়।

তাই হোটেলের লাউঞ্জের সোফায়, চেয়ারে নাগরিকের দল এলিয়ে-মেলিয়ে, কেউবা গুড়িসুড়ি মেরে বসে আছেন। কেউ ঢুলচেন, কেউ বই পড়চেন, কেউ বা নীচু গলায় শুরু করেচেন গল্প। এমনি করেই বোধকরি সাগর-নগর থেকে বিচ্ছিন্ন দলটিকে সহরের এই হোটেলে রাত কাটাতে হবে।

তবু কেউ-কেউ বাইরে এসে ঘুরতে লাগলেন। হৃদয়ের চাঞ্চল্য তাঁদের পায়ে এসে ঠেকচে যেন। দু'পা তাই অশান্ত।

স্বামী জ্ঞানানন্দ, কে-জি, রামস্বামী সান্যিয়াল লাউঞ্জ থেকে বাইরে এলেন বেরিয়ে। ঢিলে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলেন সুয়েজ খালটার দিকে। ফিকে আঁধারে সুয়েজ খালের নীলজল কালচে হয়ে গেচে। পারের সারি সারি গাছগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরী।

আর যা দৃশ্য চোখে পড়লো তা অভূতপূর্ব! এই গভীর রাত্রে এই খালের ধারে না এলে সত্যিই তা অদেখাই থেকে যেতো। এক এক করে জাহাজ বেরুচ্চে খাল থেকে - কোনটা মালের জাহাজ, কোনটা তেলের জাহাজ, কোনটা বা যাত্রী জাহাজ। তাদের সার্চ লাইটের অতি উজ্জ্বল আলোয় তৈরি হচ্চে একটি বিরাট লম্বা রূপোলী ফালি পথ। আর সেই আলোর পথ বেয়ে উড়ে চলেচে অসংখ্য সী-গাল পাখি। হয়তো ভেবেচে দিনের আলো। আহা, যেন সাদা সিল্কের শাড়ির গায়ে সাদা জরির ফুল। অথবা পাখিগুলি বুঝি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চে জাহাজটাকে ঃ এসো, এসো এই পথে। জলপথের শোভাযাত্রায় রথের আগে রশি ধরার দল।

চোখ ভরে দেখতে লাগলেন সবাই। একটার পর একটা, একই দৃশ্য! তবু বিচিত্র। খালের ধারে ঘাসের উপর বসে পড়লেন সবাই ঃ সত্যিই, কী অপূর্ব দৃশ্য! রাত্রের অন্ধকার নাকি পৈশাচিক-

দেরই রাজত্ব। না, না। কত স্বর্গীয় দৃশ্য বুঝি এমনি করেই নিদ্রা-ঢাকা চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, কে জানে।

—সুয়েজখালে সূর্য উঠলো।

কালচে খাল, লাল হলো। পরে নীল হলো আবার। খবর এলো, 'বাতরি' এবার এসে গেচে অনেক কাছে। ক্ষণে-ক্ষণের প্রতীক্ষার শেষক্ষণ দিলো দেখা। হাসি দেখা দিলো সাগর-নাগরিকদের মুখে। তাদের 'নগর' আর দূরে নয়!

সবাই প্রস্তুত। লঞ্চ এসে ঠেকলো তীরে। উঠলেন সবাই। ভট্‌ভট্‌ করে লঞ্চ চললো খালের বিশাল চওড়া মুখে মাঝ-দরিয়ায়।

ঐ যে! ঐ যে তেলের জাহাজখানার পরেই। সাদা রংয়ের। ঐ তো চোঙ-এ চিহ্ন! 'বাতরি'র প্রতীক! 'বাতরি' তো নয়, যেন শ্বেতপদ্ম ভেসে আসচে! না, একটা রাজহংসী।

ক্রমেই কাছে এলো 'বাতরি'। দূরের এতটুকু শ্বেতপদ্ম কাছে এসে বিরাট উঁচু লৌহনগরী হয়ে গেলো। হুইসল দিলো লঞ্চ: ওগো, এই যে আমরা!

হুইসলে উত্তর দিলো 'বাতরি': দেখেচি, এসো তোমরা।

স্পীড আরো কমিয়ে দিলো 'বাতরি'। তার গা বেয়ে ঝুলচে লোহার সিঁড়ি। লঞ্চ গিয়ে ভিড়লো সিঁড়ির শেষে। বেঁধে ফেললো নিজেকে ঐ লোহার সিঁড়ির সঙ্গে।

ন্যাও প্লীজ গেট আপ ওয়ান-বাই-ওয়ান। গুড্‌বাই।

গাইডের সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক সেরে চলমান জাহাজের লোহার সিঁড়ি বেয়ে সবাই উঠতে লাগলেন একের পর এক।

বাঁধন খুলে দিয়ে হুইসল দিলো লঞ্চ: উঠেচে সবাই। যাও। গুডবাই, বাতরি।

সাগর নগর তার নাগরিকদের নিজের কোলে টেনে নিয়ে স্পীড

দিলো বাড়িয়ে। মাটির সহর পড়ে রইলো পেছনে।

রেজা, আলি, ডাঃ রয়, চ্যাটার্জি, মিটার অনেকেই এসে জড়ো হলেন মিশরের তীর্থ-ফেরত যাত্রীদের কাছেঃ কী রকম আটকে গেছলেন সব?

কেন? কী হয়েছিলো? এত দেরি হলো যে!—মিশর-ফেরতাদের প্রশ্ন।

আর কী? ট্রাফিক জ্যামড। তা, কী করলেন সব?

সুয়েজ শহর ঘুরে বেড়ালাম।

বেশ, বেশ।

তারপর সব খবর ভালো তো? অর্থাৎ সাগর-নগরের কোন নতুন খবর আছে নাকি? বিদেশ থেকে ঘুরে এসে বাড়ির খবর, পাড়ার খবর নেওয়াই তো নিয়ম!

রেজা বললেন, কে-জিদা, সে এক মজার ব্যাপার। কাল রাত্রের ঘটনা।

ঘটনাটা সবিস্তারে বলবার আগেই সেখানে এসে জমলেন সানিয়াল আর ডাঃ সেন।

কী ব্যাপার?

রেজা হাসতে লাগলেনঃ উঃ, এখনো ভাবতে গেলে হাসি পায়। আমাদের কেবিনে লোয়ার বার্থে মিঃ পরকাশ নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। দেখেচেন বোধহয়, মোটা মত, বেঁটে মত ভদ্রলোক, মাথায় টাক। স্কটল্যাণ্ডে গেছলেন যেন কী করতে।

হ্যাঁ, তারপর?

রেজা বললেন, ভদ্রলোকের মাথায় টাক আর বেশ টকেটিভ, তাই আমরা মানে আর তিনজন রুমমেট ওঁর নাম রেখেচি, টোকিও!

গুড্!—সানিয়াল পিঠ চাপড়ে দিলেন রেজার।

কাল রাত্রে ড্যান্সিং হল থেকে ফিরে কেবিনে আসবার সময় দেখে এলাম, টোকিও একটি লম্বা ভদ্রলোকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খুব মদ গিলচেন। আমি দাঁতটা ব্রাশ করে সবে শুতে যাবো, এমন সময় টোকিও কেবিনের দরজা ধড়াম্ করে খুলে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকেই দরজা দিলেন বন্ধ করে। দিয়েই দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। উস্কো-খুস্কো চুল। চোখ দুটো লাল, ঠেলে বেরিয়ে আসচে যেন। আর—আর—রেজা হাসতে লাগলেন আবার।

রেজাকে ঠেলা দিলেন কে-জি ঃ আরে বলো না ছাই—

দেখলাম টোকিওর গলায় ঝুলচে মেয়েদের ব্রাশায়ার, না, বডিস— ঐ যে কী ছাই বলে—

বলো কী!—ডাঃ সেন বললেন।

সানিয়াল উন্মুখ হলেন, কোন লট-ঘট ঘটনা?

কে-জি বললেন, হতে পারে। তা বলে—

শুনুনই আগে ব্যাপারটা!

বলো, বলো, পেট আমাদের ফুলচে।

রেজা বললেন, আমি তো তাঁকে টেনে এনে বিছানায় বসালাম। আমাদের একজন দরজা দিলো লক্ করে।

হোয়াটস্ ম্যাটার মিঃ পরকাশ?—জিগ্যেস করলাম। আমার রুমমেট নাইয়ার তাঁর গলা থেকে ব্রাশায়ারটা খুলে নিয়ে জিগ্যেস করলো, গলায় এটা পরেচেন কেন?

ঐ মেয়েলী বস্তুটি দেখে টোকিও প্রায় সাপ দেখার মত আঁতকে উঠলেন, অ্যাঁ, ওটা নিশ্চয়ই ঐ কেবিনের মেয়েটির! কী হবে! সব্বনাশ!

আহা-হা। ব্যাপারটা কি বলুন না?

টোকিও বললেন, আস্তে, আস্তে। চুপ। শুনতে পাবে কেউ! মেয়েটি এই কেবিন জানে?

তা জানে না বোধহয়।—টোকিও হিন্দি ইংরিজি মিশিয়ে বলতে শুরু করলেন, কেয়া তাজ্জব কী বাত্। রিয়েলি অ'ফুল। মানে, আজ একটু ডোজ বোধহয় বেশি হয়ে গেছলো। তাই দেওয়াল ধরে ধরে নিজের এই কেবিন ভেবে একটা কেবিনে ঢুকে দেখি প্রায় অন্ধকার। কোণের ডিম্ আলোটা জ্বলচে শুধু। ভাবলাম, আপলোগ আভিতক নাহি আয়া—কিয়া, নিদ্ গিয়া। আমি আমার মাফলারটা টেবিলে রেখে জুতো মোজা খুলবো বলে লোয়ার বার্থে বসতে গিয়ে দেখি কে যেন শুয়ে, কার ঘাড়ে গিয়ে বসেচি। সেও আমার চাপে ধড়মড় করে উঠে বসেচে : হু ইজ দ্যাট্। দেখি, একটি তরুণী। মাই গ্যাড্। আমার নেশা গেলো চট্‌কে। তাড়াতাড়ি হাতের কাছে মাফলারটা নিতে গিয়ে এখন দেখচি, তার ব্রাশায়ারটা কাঁধে ফেলেই ছুট্ দিয়েচি।

বললাম আমরা, তা এমন হলো কেমন করে ?

টোকিও বললেন, এখন বুঝচি, এই সি-ডেক-এ না নেমে ডি-ডেক-এ এই ধরণের একটা কেবিনে ঢুকে পড়েছিলাম। নেশার ঝোঁকে বুঝতে পারিনি অতটা ! লেকিন, আভি কেয়া হোগা ?

বললাম আমরা, কেয়া আবার হোগা ? নিদ্ যাইয়ে।

নাইয়ার বললেন, ভয় নেই। আমি খুব ভোরে বেরিয়ে এই ব্রাশায়ারটা কাগজে মুড়ে লাউঞ্জের টেবিলে রেখে আসবো। যার জিনস, সে নিয়ে যাবে।

না, না, তাতে লোক জানাজানি হবে। হৈ চৈ পড়বে।—টোকিও বললেন, ওর চাইতে 'সী'তে ফেলে দেওয়াই ভালো।

বেশ, তাই করা যাবে।

রেজা বললো, আজ ভোরে সেই ব্রাশায়ারের সলিল সমাধি হয়েচে।

হিসেবি কে-জি বললেন, কিন্তু মাফলারটা ?

হয়তো মেয়েটা তার স্যুটকেসে পুরেচে। মাফলারটা নাকি দামি।

ডাঃ সেন বললেন, খুব মজার ব্যাপার তো ?

সানিয়াল জিগ্যেস করলেন, আর কি খবর বলো ? শাড়ি-দাড়ির খবর কি ?

রিপোর্টার রেজা হেসে বললেন, তাঁরা যথারীতি গলি-ঘুঁজি আর আনাচে-কানাচে ঘুরচেন !

জন ?

তিনিও নিয়মিত রাজহংসীর হাতে খাচ্চেন চুমু আর বার-এ খাচ্চেন সুরা।

বড়াই-রাফিক ?

ফিকে !—ফিকে করে হাসলো রেজা।

আর, আর, হ্যাঁ—মনে পড়লো সানিয়ালের : এলিস এবং ড্যাংগুলি ?

তাঁরা এখনো খেলায় মত্ত।

বেশ ! বেশ ! লীলে-খেলা সব ঠিক মতই চলচে তবে !—সানিয়াল রেজার পিঠ আবার চাপড়ে বললেন, ব্রাদার, ইণ্ডিয়ায় গিয়ে আমি তোমাকে স্পাই-বিভাগের হেড বানিয়ে দেবো।

রেজা বললেন, সেজন্যে এখনই হেড-এক দেখা দিলো নাকি ? স্যারিডন দেবো ?

এমন সময় রামস্বামী এসে উপস্থিত সেখানে।

বললেন, ন্যাও লিশ্‌ন। আমাদের কেবিনের নিউইয়র্ক-হকের কাণ্ড শোনো।

কী ?

আমরা তিনজনই পোর্টসৈয়দে নেমে যাওয়ায় খালি কেবিন পেয়ে হক নাকি মিস রীডকে কেবিনে নিয়ে এসেছিলো।

বলো কি ?—কে জি বললেন।

অন্যায়। খুব অন্যায়।—ডাঃ সেন বললেন, কার কাছে শুনলে তুমি ?

সানিয়াল ফোড়ন কাটলেন ঃ বাহবা, বাহবা।

রামস্বামী বললেন, চ্যাটার্জি আমায় ডেকে বললে। সে নিজে চোখে দেখেচে আমাদের কেবিন থেকে মিস রীডকে বেরিয়ে যেতে, পরশু রাত্রে। সিনেমা হচ্ছিলো তখন।

তা, হককে চ্যাটার্জি বললো না কিছু ?

রামস্বামী বললেন, আমিও বললাম চ্যাটার্জিকে। চ্যাটার্জি বললে, আমি কী বলবো বলো ? হয়তো বলতো, আমার কেবিনে আমি নিয়ে গেচি, তোমার তাতে কি ?

ঠিক, ঠিক।—সানিয়াল মাথা নাড়লেন।

ডাঃ সেন বললেন, হেড ষ্টুয়ার্ডকে এ বিষয়ে কমপ্লেন করা দরকার।

কিন্তু সাক্ষী আছে ? প্রমাণ আছে ?—রেজা বললেন।

কেন, চ্যাটার্জি সাক্ষী দেবে ?—ডাঃ সেন বললেন।

কিন্তু তার কথাই যে সত্যি তার প্রমাণ কি ? মিথ্যে করেও তো লাগাতে পারে ?—কে-জি বললেন পাইপে টান দিয়ে ঃ কিছুই হবে না। মাঝখান থেকে নিজেদের কেলেঙ্কারি বাইরে প্রচার হবে। চ্যাটার্জি যদি হাতে-নাতে ধরতে পারতো, তবে একটা উপায় হতো যা হোক।

মস্কোর রামস্বামী বললেন, নিউইয়র্ক আর কত ভালো হবে !

সানিয়াল হেসে বললেন, ছ্যা, ছ্যা !

'বাতরি' এখন রেড-সী বা লোহিত সাগরের নীল জল কেটে চলেচে পূবের দিকে।

আবহাওয়া গেচে বদলে।

ইয়োরোপের হিমেল হাওয়া তার শেষ সীমা পর্যন্ত এসে সাগর-নগরকে 'সী-অফ' করে বিদায় নিয়েচে। এশিয়ার গরম হাওয়া জানালো স্বাগতম্! উষ্ণ অভ্যর্থনা!

সাগর-নগরের হাল-চালও গেলো বদলে।

নাগরিকরা গরম জামা-কাপড় খুলে পুরলো স্যুটকেসে। পরলো স্ফুতির পোষাক।

সন্ধ্যাবেলায় ডেক চেয়ারগুলো আর সহজে খালি হয় না। রাত্রে সিনেমা দেখানো শুরু হলো খোলা ডেক-এ। কেবিনের বিছানা-গুলো অনেক রাত পর্যন্ত খালিই থাকে পড়ে।

কে কোথায় থাকে, কার সঙ্গে থাকে, কে জানে! কে কার খোঁজ রাখে! রাখে, যার রাখবার দরকার। সারা দুপুরটা কেউ প্রায় গরম ডেক-এ পা দেয়নি। হয় কেবিনে, না হয় লাউঞ্জে সময় কাটিয়েচে। বার-এও যথারীতি ভিড়! উত্তরে সৌদী আরব, দক্ষিণে আফ্রিকা—আকাশে বাতাসে গরম বালির হল্কা হাওয়াঃ সূর্যের রাজত্ব। কে যাবে সখ করে ভাজা-পোড়া ডেক-এ? এতদিন শীতে দুপুরে ছিলো ডেক ভর্তি, রাত্রে ছিলো ফাঁকা! এখন গরমে, উল্টে গেচে রুটিন!

সন্ধ্যায় স্যাম আলি, তার বিলিতী বিবি ডরোথী আর তাদের ছেলেমেয়ের পাল প্রায় গোটা পাঁচেক ডেক চেয়ার দখল করে আছে। জন, এলবার্ট, পামেলা, হেনরি আর কুচোরা ডেকচেয়ারগুলো একবার এদিকে টানচে, একবার ওদিকে। মেজাজ তাদের হয়েচে খিটখিটে। জল, জল, জল, দেখে দেখে চিত্ত 'সব' হয়েচে বিকল। বাচ্চাদের তাই আর ভালো লাগচে না।

মিঃ মুঞ্জেশ্বর, মিসেস মুঞ্জেশ্বর পাশাপাশি দু'খানা ডেক-চেয়ারে শুয়ে। মিষ্টারের ঠোঁটে সিগ্রেট, মিসেসের হাতে উল আর কাঁটা। পুলওভারটা শেষ হতে আর দেরি নেই। দু'তিন দিনের মধ্যেই শেষ

হবে। ইভা কাছে নেই। সে লাউঞ্জে বসে মিসেস ডাট বা দত্তের সঙ্গে ডোমিনো খেলায় মত্ত।

দুঃখ শোক মানুষের জীবনে আসে, তবে বাঁচোয়া, স্থায়ী আসন পেতে বসে না। জীবনে বড় ভিড়। ঘটনার পর ঘটনা ঘটবে বলে ঘটনারা 'কিউ' করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কোন একটা কিছুকে নিয়ে বেশিক্ষণ নাচবার বা নাচাবার সময় নেই, উপায় নেই। তা সে দুঃখেরই হোক, সুখেরই হোক। মিসেস দত্তের যে ক্ষতি, যে দুঃখ—তা সহজে ভোলবার নয়। তা বলে, সেই দুঃখটুকু আঁকড়ে ধরে হা-হুতাশ আর কতদিন করা যায়! তাই তিনি কান্না বন্ধ রেখে, বন্ধ ঘর থেকে এসেচেন বাইরে। মৌনতা ভঙ্গ করে মিস ইলিয়টের সঙ্গে শুরু করেচেন গল্প। আর ক'দিন হলো ইভার পাল্লায় পড়ে শুরু করেচেন ডোমিনো খেলা। মিসেস দত্ত হয়েচেন ইভার আন্টি! কাজেই বোন্‌ঝিটির আব্দার তাঁকে শুনতেই হচ্চে।

মিস ইলিয়ট তাঁর আগাথা ক্রিষ্টির ক্রাইম নভেলখানার প্রায় শেষ কয়েক পাতায় এসে পড়েচেন। কাজেই নিজের কেবিনের বার্থেই শায়িতা! খুনী কে এখনো ঠিক ধরা যাচ্চে না। আর গোয়েন্দা যে পর্যন্ত না ধরতে পারচে, সে পর্যন্ত মুখে বই ধরে রাখা ছাড়া আর উপায় কি? মিস ইলিয়ট নিরুপায়!

অবশ্য বই পড়চে উইলহেলম এইটেল-ও। লাউঞ্জে একটি সোফায় বসেচে সে। হাতে 'ইয়োগা' শেখবার বইখানা। ইণ্ডিয়ায় যাবার আগে বইখানা আর একবার ভালো করে পড়ে নেওয়া দরকার।

উপরে বোট ডেকে লতিফ আর তার শপ-গার্ল বৌ এমা ব্রাউন একটা অন্ধকার কোণে ঘনিষ্ঠতম হয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। এমার পরণে স্কার্ট। এই গরমে ঐ সর্বাঙ্গ মোড়া সালোয়ার-পায়জামা আর মাথায় ওড়না ব্যবহার করা যায় নাকি? ড্যাম ইট। অবশ্য,

লতিফ কোন আপত্তি করেনি। আর করলেই হলো! এ তো আর দেশি বিবি নয়! খাস্ বিলিতী। বেশি কিছু বললে করাচীতে নেমেই আবার রিটার্ণ টিকিট কেটে বসবে হোম-এ যাবার জন্যে!

মিষ্টার ধীলন একটি ডেক চেয়ারে ঘুমে অচেতন। আর তাঁর নাচিয়ে স্ত্রীটি ডেকের আর এক কোণে মিসেস হারমান, মানে, রাজ-হংসীর সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও ভারতীয় নৃত্যকলা নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন। অবশ্য, পাশ্চাত্য বাদ্যের তালে ভারতীয় নৃত্য চালু করা যায় কিনা—সে রকম কোন অসম্ভব আলোচনা চলচে না নিশ্চয়ই।

মিসেস কিরণ্ময়ী বড়াই করাচীর কাষ্টম হাউসের বেড়া অনায়াসে পার হবার আশায় রাফিককে খোশামত করা আপাতত বন্ধ রেখে ডেকের ম্লান আলোতেই একটা বাংলা উপন্যাস খুলে বসেচেন। উপন্যাসখানা কে-জির লেখা: 'ভাঙাগড়া'! রেজা তাঁর কে-জিদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন পড়তে। লাউঞ্জে বসে রেজাকে বাংলা বই পড়তে দেখে মিসেস বড়াই নিজেই গিয়ে আলাপ করে বইখানা বায়না দিয়ে রেখেছিলেন, রেজার পড়া হয়ে গেলেই বইখানা যেন তিনি পান। পড়ার পর রেজা মিসেস বড়াইকে খুঁজে বার করেই বইখানা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একদিন মিসেস বড়াইয়ের সঙ্গে তাঁর কে-জিদার আলাপও করিয়ে দিলেন।

মিসেস বড়াই কে-জিকে বললেন, আপনি? আপনার নাম শুনেচি, বই পড়লাম। এমনভাবে এখানে দেখা হবে, ভাবতেও পারিনি।

কে-জি হেসে বললেন, আর্থ ইজ রাউণ্ড। দেখা হবে না, কেন ভেবে নিয়েছিলেন, বুঝলাম না।

মিসেস বড়াই বললেন, তা বটে।

সেলিম আর মিস রীড যথারীতি বার-এ বসে। সামনের টেবিলে

হুইস্কি, সোডা। হক আজকাল ঘনঘন নেকটাই বদলাচ্চেন। তাঁর রুমমেটরা, মানে রামস্বামী, ডাঃ সেন, কে-জি, কেউই অবশ্য তাঁকে খালি কেবিনে তাঁর এবং মিস রীড-এর ব্যাপার নিয়ে জেরা করেননি। তবে তিনজনই সেই থেকে হকের সঙ্গে আর কথাও বলেননি। একই ঘরে, হক সেই থেকে একঘরে। বাট্ হু কেয়ার্স! রাত দু'টোয় কেবিনে শুতে এসে পরদিন বেলা বারোটায় ঘুম থেকে উঠে বাকি সময়টা বাইরে কোন বান্ধবীর সঙ্গে কাটালে রুমমেটের সঙ্গে নাই বা থাকলো সম্পর্ক! একটা বান্ধবীর সঙ্গে দশটা বন্ধুরও তুলনা হয় না।

গ্যাংগুলি আর এলিস আপাতত বেশ উচ্চস্তরে বিচরণ করচেন। দু'জনে পাশাপাশি দুটি ডেক চেয়ারে শুয়ে কালো আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। না, তারা গুনচেন না তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা গ্যাংগুলির মুখস্থ। এলিসের হাতে হাত রেখে তারই একটি আবৃত্তি করলেন ঃ

'আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে।
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল-প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি!
কিছু নাহি ভয়, জানি নিশ্চয়ই—তুমি আছ, আমি আছি॥
দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটিনি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী—তুমি আছ, আমি আছি॥

গ্যাংগুলি, এর মানে বুঝিয়ে দাও।—এলিস বললেন।

ষ্ট্যাঞ্জা বাই ষ্ট্যাঞ্জা গ্যাংগুলি ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিলেন এলিসকে।

এলিস আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, হাউ সাবলাইম! জানো গ্যাংগুলি, তোমার এই কবিতা আবৃত্তি শুনে আমার ইচ্ছে হচ্চে বাংলা শিখতে।

বেশ তো, এবার ইণ্ডিয়ায় গিয়ে শিখো।

এলিস যেন নিজের মনেই বললেন, দেখি, চেষ্টা করবো। অন্তত, টেগোরের কবিতা পড়বার জন্যেই বাংলা শিখতে হবে।

ওদিকে প্রমেনেড ডেক-এ রীতিমত তর্ক শুরু হয়ে গেচে, যাকে বলে 'হট ডিসকাসন'। ডাঃ প্রামানিকের সঙ্গে কে-জির। ডাঃ প্রামানিকের মতে এখন ইণ্ডিয়ার দরকার আগে খাদ্য, পরে বিদ্যে। আর কে-জি-র মত ঃ না, আগে বিদ্যে পরে খাদ্য বলা ভুল হবে, তবে খাদ্য আর বিদ্যে একসঙ্গে দরকার। ড্যাম, ব্যারেজ, ট্রাকটরের সঙ্গে চাই স্কুল, কলেজ, ফ্রি-এডুকেশন। কোন জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হলে সামনে চাই জ্ঞানের আলো! অন্ধকার পথে চলা মানেই হোঁচট খাওয়া।

ডাঃ প্রামানিক বললেন, থামুন মশায়, যে দেশে বেশির ভাগ লোক একবেলা খেয়ে থাকে, বহুলোক অনাহারে থাকে—তাদের ঘরে দরকার এক মুঠো চাল, আপনার জ্ঞানের আলো নয়। অন্নাভাবে তার চোখের আলো নিভে গেলে তার ঘরে তখন জ্ঞানের আলো জ্বলতে থাকলে তা হাস্যকরই মনে হবে!

দু'জনের দুটি দল হয়ে গেচে। ডাঃ রয়, চ্যাটার্জি, রামস্বামী—ডাঃ প্রামানিকের মতে ঘাড় নাড়চেন, তাল দিচ্চেন। কে-জির দলে আছেন রেজা, সানিয়াল, ডাঃ সেন আর মিসেস প্যারেলওয়ালা। তাঁরাও তাল ঠুকচেন তাল বুঝে।

কী ? সি. মিটার কোথায় ? আর, এনাক্ষা রাও ? কী জানি। সাগর-নগরের অনেক তলা, অনেক ডেক, বহুৎ কেবিন, অগুন্তি গলি ঘুজি, বিস্তর আড়াল-আবডাল। কেউ গা-ঢাকা দিলে খুঁজে বার করা বড় মুস্কিল।

সাগর-নগরের সুইমিং-পুলেও ভিড়।

এতদিন শীতের দাপটে গরম জামা-কাপড় ছেড়ে কেউই সুইমিং কষ্টিউম পরে জলে নামতে চায়নি। এবার যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। গলা জল। ডোববার ভয় নেই, যত খুসি ঝপাংঝপাং করো—সে সুযোগ কেউ ছাড়ে! বুড়োরা তাই কচি খোকা সাজলেন যেন। অবশ্য, ছোটরাও জল-ঝম্পের আনন্দ থেকে বাদ গেলো না। জলের লেভেল কমিয়ে তাদের জন্যেও জল-ঝম্পের ব্যবস্থা আছে ঘণ্টাখানেকের জন্যে। তাছাড়া খানিকটা সময় আলাদা করা, অর্থাৎ রিজার্ভড্ করা—ফর লেডিজ।

একেবারে নীচেয় ডি-ডেক-এ সুইমিং-পুলটি লম্বায়-চাওড়ায় প্রায় চল্লিশ ফুট করে। গভীর অন্তত দশ ফুট। নীচের তলা পর্যন্ত লোহার সিঁড়ি নেমে গেচে। সাদা রং করা। তাতে সমুদ্রের নীল জল, টলটলে জল, দেখলেই গা ডোবাতে ইচ্ছে হয়। ময়লা জল ফেলে জল তোলা হয় পাম্প দিয়ে।

পাশেই জিমনেশিয়াম। ব্যায়ামাগার। বহুবিধ ব্যবস্থা : রোয়িং মেসিন, ষ্টেসনারি-সাইকেল, মেকানিক্যাল হর্স—মানে, বসে বসে দাঁড় টানো (হাতের ব্যায়াম), অচল সাইকেল চালাও (পায়ের ব্যায়াম), কাঠের ঘোড়ায় চড়ে ঝাঁকানি খাও (শরীরের ব্যায়াম) !

কাল এডেন পেঁছুবে 'বাতরি'।

সুয়েজ ছাড়বার তিন দিনের দিন। বিকেলে দূরে দেখা গেলো

আর একখানা জাহাজ। সাগর-নগরের সঙ্গে আর এক সাগর-নগরের দেখা।

ভোঁ-ও-ও-ও-ও। কী হে, কেমন আছো ?

ভোঁ-ও-ও-ও-ও। ভালো।

ডেক-এ জড়ো হয়েচে নাগরিকরা। দুই জাহাজেরই। হাত নাড়চে, রুমাল নাড়াচ্চে! যার দূরবীন আছে, চোখে লাগিয়েচে, স্পষ্ট দেখতে চায়। ভুলে গেচে, এ সংসারে অস্পটতাই সুন্দর, মধুর, কাব্যময়। বেশি স্পষ্ট হওয়া মানে, সব কিছুই হারানো।

জাহাজটা কী এমন দেখতে! জাহাজের লোকগুলো কি অদ্ভুত ? না। তবু সুন্দর। বিচিত্র। দু'দিন একটানা জল দেখবার পর, জলের বুকে ঐ বৈচিত্র্যটুকু কে হারাতে চায়! বন্দরে, জাহাজঘাটে জাহাজের ভিড়ে ও জাহাজের কোন দাম নেই। সমুদ্রের পথে একা পথিক, দল ছাড়া—তাই দ্রষ্টব্য।

রাত্রের অন্ধকারে 'বাতরি' এসে ভিড়লো এডেন বন্দরে। বন্দরে ভিড় নেই। বন্দর থেকে সহর নাকি দূরে। যাত্রী অনেক নামলো। তিন ঘণ্টার ছুটি। যাও, বেড়িয়ে এসো মাটির সহরে। আর হ্যাঁ, ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নাও, আরো এক ঘণ্টা বেশি। পার্শার অফিসের নির্দেশ।

এডেন-এ কাষ্টম ডিউটির ঝামেলা নেই ঃ খোলা বন্দর। কাজেই জিনিসের দাম কম, তাই খদ্দরের ভিড় বেশি।

সাগর-নগরের নাগরিকরা ট্যাঁকে বেঁধে নিয়েচে টাকা, ট্রাভেলার্স চেক। সুবিধা দাম হলে কিনতে হবে ক্যামেরা, দূরবীণ, ইলেকট্রিক সেফটিরেজার, আরো যা-যা পাওয়া যায়।

সস্তায় কিছু কেনার একটা মাদকতা আছে।

বিদেশী খদ্দেরের আশায় এডেনের দোকানগুলি তখনও খোলা। বন্দরের কাছের দোকানগুলোয় ভিড় বেশি। তবে যারা আরো সস্তায়

কিনতে চায়, দেখতে চায় সহরটাও—অর্থাৎ একঢিলে দুইপাখি মারাই যাদের মতলব, তারা ট্যাক্সিভাড়া করে চলে গেলো সহরে। অল্প সময়, অথচ অল্প দামে জিনিস কিনতে হলে ট্যাক্সি ছাড়া উপায় কি?

ঘণ্টাদুয়েক পরেই এক-এক করে ফিরতে লাগলো নাগরিকরা সাগর-নগরে। হাতে থলে, বগলে প্যাকেট, কাঁধে ক্যামেরা, চোখে দূরবীন আর মুখে হাসি। বিজয়ীর হাসি।

কিন্তু জাহাজ ছাড়চে না কেন?

তিনঘণ্টা তো কখন হয়ে গেচে। সাগর-নগর কি মাটির নগরের প্রেমে পড়ে তার বন্দরেই ধর্ণা দেবে? রাত কাটাবে এডেন-এর বন্দর-বন্ধনে।

পার্শার অফিসে অনেকেই ধাওয়া করলো: হোয়াটস্ ম্যাটার?

ম্যাটার যাকে বলে গুরুতর। জগৎ সিং নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এখনো এডেন সহর থেকে ফেরেননি জাহাজে। পোর্টে নামবার সময় যাঁরা-যাঁরা পার্শার অফিসে পাশপোর্ট জমা দিয়ে গেছলেন, সবাই ফিরে এসেচেন, পাশপোর্ট ফেরত নিয়েচেন—আসেননি কেবল ঐ পাঞ্জাবী দম্পতি। তাঁদের পাশপোর্ট খানা এখনো অথরিটির কাছে।

তাঁদের কেবিনও লক্ করা।

গেলেন কোথায় তাঁরা?

পোর্টে লোক গেচে খুঁজতে। কিন্তু 'বাতরি'র এক ষ্টুয়ার্ড একটু পরেই এসে খবর দিলো, নো, দে আর নৎ দেয়ার।

তবে?

তা হলে?

উপায়?

একজন ষ্টুয়ার্ড এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো পার্শার অফিসে।

অফিসারকে ডেকে নিয়ে গেলো। উপরে বোট-ডেকে। মেঝেয় একটা কার্পেট পেতে একটি স্ত্রী ও একটি পুং বপু গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নাক ডাকচে।

অফিসারটি ভদ্রলোককে ঠ্যালা দিয়ে ওঠালেন : হ্যালো স্যার, ইউ আ হিয়ার।

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন ভদ্রলোক : কেয়া হুয়া ?

প্রায় সকলেরই সেই প্রশ্ন : কেয়া হুয়া ?

জগৎ সিং চোখ কচলে চীনে ইংরিজি ও ভাঙা হিন্দিতে যা বললেন, তার বাংলা মানে দাঁড়ায়, আমরা পাশপোর্ট জমা দিয়ে বেরুবো, এমন সময় আমার জেনানা বললেন, তার মাথা দরদ করচে। একটু খোলা হাওয়ায় নিদ্ গেলে সেরে যাবে হয়তো। তা ভাবলাম, ঠিক আছে। এডেন-এ নামলে কিছু টাকাও খরচ হয়ে যেতো, যাক্ বেঁচে গেলো। কাজেই ইজিপ্টে কেনা কার্পেটখানা কেবিন থেকে এনে ছড়িয়ে চোখ বুজে খোলা হাওয়ায় শুয়ে থাকতে গিয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েচি।

জগৎ সিংয়ের কথা শুনে সবাই হো-হো হেসে উঠলো। সেই হাসির ধাক্কায় মিসেস সিংয়েরও ঘুম গেলো ভেঙে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসে মাথায় ওড়নাখানা টানলেন, ঢাকলেন তাঁর স্ফীতবক্ষ। আগোছালো পোষাক টেনেটুনে গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

পার্শার ভদ্রলোক ততক্ষণে পাশপোর্টখানা জগৎ সিংয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে ছুটলেন ক্যাপ্তেনকে খবর দিতে। কেলেঙ্কারি!

এক ভদ্রলোক নীচুগলায় বললেন, এরা সব ইণ্ডিয়ার বাইরে যায় ইণ্ডিয়ার মুখ হাসাতে। ড্যাম, ফুলস্।

জগৎ সিং আর তাঁর স্ত্রী গেছলেন নটিংহ্যামে তাঁদের ছেলে প্রীতম সিংকে দেখতে। আর সেইসঙ্গে তাঁদের বিলিতী বৌমাকেও। অবশ্য বাড়তি আকর্ষণও ছিলো : তাঁদের নবজাত নাতিটিকেও দেখে আসা।

আহা, ডল পুতুলের মতো, একমাথা সোনালী চুল। আর, দেশটাও দেখে আসা হলো।

সপরিবারে জগৎ সিংয়ের এই জগৎ দেখা ঘটলো তাঁর লেড়কার একান্ত ইচ্ছে আর পেড়াপিড়িতেই।

এডেন-এ একঘণ্টা সময় এগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো!

দু'দিন বাদে গালফ অব এডেন পার হবার পর পার্শারের ঘরে নোটিশের নির্দেশানুযায়ী 'বাতরি'র যাত্রীরা আরো একঘণ্টা হাতঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নিলো।

সময় এগিয়ে চলেচে, মন যেন এগিয়ে যাচ্চে তারও আগে। ঘরমুখো ঘোড়ার মত ছুটেচে মন। পাকিস্থানী-যাত্রীরা যেন মানসচক্ষে দেখচে দূরে ঐ সমুদ্রের ওপারে করাচী বন্দর। আর হিন্দুস্থানের বাসিন্দারা দেখচে ভারতের বন্দর—বোম্বাই!

ভারত মহাসাগরে পড়লো 'বাতরি'।

বিশাল সমুদ্র। অথৈ জল। থৈ-থৈ করচে ঢেউয়ের পর ঢেউ। চারদিকে নীল, নীল, নীল জল। মাথার উপর ফিকে নীল আকাশ। পৃথিবীতে আর কোন রং আছে? বুঝি নেই। পৃথিবীতে মাটি আছে? না বুঝি। কী? পৃথিবীতে তিনভাগ জল, একভাগ স্থল—মাটি? কই? কোথায়? কোথায় সেই ধূলো-মাটি, কাদা-মাটি, দেশের মা-টি?

সাগর-নগরে নাগরিকরা যেন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো। আর ক'দিন পরে যে মাটিতে পা দেবে তারা, সে মাটি প্রাণের মাটি, ধ্যানের মাটি, জ্ঞানের মাটি, অজ্ঞানের মাটি। মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে তারা পেয়েচে ঐ মাটিরই প্রথম স্পর্শ। প্রথম আলো, প্রথম হাওয়া, প্রথম স্বাদ ঐ মাটিতেই। পরে ক্রমে পেয়েচে জ্ঞানের আলো! ঐ মাটির সঙ্গে অন্য মাটির অনেক তফাত।

সবার সাধ, ঐ দেশের মাটিই হয় যেন তার শেষের মাটি।

তবে সাগর-নগরের কয়েকটা দিনের মধ্যেও কি কারোর শেষের দিনের পরম এবং চরম বিদায়লগ্নটুকু চিহ্নিত হয়ে থাকে না? থাকে। তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়া মানুষটির শেষ সম্বল অসাড় দেহখানি আর মাটির স্পর্শ পায় না, হয় তার সলিল-সমাধি। সাগর-নগরের নাগরিকের মর-দেহ সাগরের তলায় নিশ্চিহ্ন হওয়াই তো স্বাভাবিক।

এডেন থেকে যে কয়জন ক'দিনের জন্যে স্থান করে নিয়েছিলো 'বাতরি'র লোহা এবং কাঠের-নগরে—তাদেরই একজনের বম্বে পর্যন্ত যাবার সমুদ্রযাত্রার টিকিট কাটা ছিলো বটে, কিন্তু তার সংসার-যাত্রার টিকিটের মেয়াদ ছিলো না বেশি। লোকটা ব্যবসাদার। নাম রেওয়াচাঁদ মাখিজানি। সিন্ধী। এডেন-এ তার ব্যবসা, বম্বেতে বসবাস। দেশের মাটির টান কমেনি তার। তাই মনে আশা নিয়ে বাসার দিকে বাড়িয়েছিলো পা।

কিন্তু রাত্রে সমুদ্রপথে সগর্জনে 'বাতরি' যখন তার কপালের জোরালো আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার ঠেলে চলছিলো, সেই সময় রেওয়াচাঁদের শেষক্ষণে তার হৃদযন্ত্র হলো অচল, চোখের আলো গেলো নিভে। আসল টিকিটের মেয়াদ হলো শেষ, অথচ জাহাজের টিকিটখানা বুক রইলো তেমনি তাজা।

'বাতরি'র বিরাট ইঞ্জিনটা হিস্-হিস্ করে বললো যেন ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেঃ মঁসিয়ে তোমার ইঞ্জিন ভারি পল্কা। সায়েন্টিফিক যুগে একদম অচল।

পরদিন সকালে সারা জাহাজে রেওয়াচাঁদের মৃত্যু-বার্তা রটে গেলো ক্রমে। সবার মনেই বিষাদের ছায়া এলো নেমে, আশংকাও দেখা গেলো। সাগর-নগরের সব ভালো, মৃত্যু ভয়ংকর। মাটি নেই, মা-ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে-বৌ কেউ নেই কাছে, কানে রাম-নাম নেই, মুখে গঙ্গাজল নেই, কারোর চোখে অশ্রু নেই—শুধু সামরিক

অভিবাদন! কাপ্তেন-খালাসীদের কর্তব্যের 'অনার!' তারপর নিঃশব্দে, নিঃশেষে সাগরের অতলতলে তলিয়ে যাওয়া!

রেওয়াচাঁদের পার্থিব দেহটাকে শুভ্র বস্ত্রে আপাদমস্তক ঢাকা অবস্থায় রেখে দু'ধারে দাঁড়ালেন 'বাতরি'র অফিসাররা। শিপ্-মাষ্টার ঈশ্বরের কাছে করলেন তার আত্মার কল্যাণ কামনা। স্যাল্যুট জানালেন মৃতের আত্মার উদ্দেশে! তারপর সেই বিষাদ-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে চারজন বাহক পরম যত্নে রেওয়াচাঁদের নশ্বর দেহকে ডালি দিলো সাগরের লোভী ঢেউগুলোর কাছে। ভারত মহাসাগরের ঢেউ লুফে নিলো, গ্রাস করলো এক ভারতের সন্তানকে। ভারতের মাটিতে না হোক, সমুদ্রে সমাধিস্থ হওয়ায় রেওয়াচাঁদের আত্মা হয়তো তৃপ্তই হলো।

আর সেই মুহূর্তে বম্বের এক মাঝারি পল্লীতে রেওয়াচাঁদের স্ত্রী হয়তো তার স্বামীর হাতের চিঠি পেলো: ম্যয় জলদি ঘর যাতি হুঁ।

বিদায় একদিন নিতেই হবে। সবাইকেই। কিন্তু সেই শেষ বিদায়ের আগেও বহু বিদায়ের পালা আমাদের সাঙ্গ করতে হয়। কিছুদিন আগে সবাই বিলিতী মাটির সহরের কাছে বিদায় নিয়ে সাগর-নগরে নিয়েছিলো আশ্রয়। আবার ক'দিন পরেই সাগর-নগরকে বিদায় দিয়ে অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়বে দেশের মাটির নগরের কোলে।

সাগর-নগরে বিদায়ের পালা শুরু হলো। নগর কর্তৃপক্ষরা ব্যবস্থা করলেন ফেয়ারওয়েল ডিনারের।

সে সন্ধ্যায় আহার্যের প্রাচুর্য দেখা দিলো টেবিলে-টেবিলে। সেই সঙ্গে ফুলদানিতে ফোটা-ফুলের মেলা। ষ্টুয়ার্ডরাও সেজেচে নতুন করে ফিকে রংয়ের নীল পোষাকে। সচিত্র সুন্দর মেনু-কার্ড দেওয়া হলো সবার সামনে। কনসার্টের দল বসলো এক কোণে। মৃদু

মধুর সুর আর নানা রঙের সুরার হলো সমন্বয়। সারা ডাইনিং হলটাও যেন সেজেচে। কাগজের রঙীন ফুল, বেলুন আর পতাকার বাহার সর্বত্র। যেন স্বপ্নপুরী। সারা সাগর-নগরে আলো ঝলমল। সাগরের বুকে বুঝি চলন্ত আলোর ভেলা।

শিপ্-মাষ্টার মিরাশল গ্রাওয়াকি এলেন সগর-নগরের নাগরিকদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। উঠে দাঁড়িয়ে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমার সম্মানিত বন্ধুগণ, আজকের সন্ধ্যায় এই বিদায়-ভোজসভায় আপনাদের সম্বর্ধনা জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। আশাকরি আপনারা সকলেই এই সমুদ্রযাত্রা উপভোগ করেচেন এবং আপনাদের অনেকের সঙ্গেই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে—সে বিশ্বাসও আছে। আপনাদের সহযোগিতার জন্যে আমার সঙ্গীদের হয়ে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে জানাচ্চি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। অতঃপর' আসুন, আমরা আমাদের দক্ষিণ হস্তের কাজে লাগি।

শুরু হলো ভোজন পর্ব।

তারপর সই নেবার পালা। সচিত্র মেনু-কার্ডে এর-পর ঠিকানা লেখালেখি চললো। এই যে ক'দিনের মেলামেশা, হাসি-গল্প, সেকি সাগর-নগর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হবে? শেষ যাতে না হয়, তারই শেষ চেষ্টা।

রাত্রি ন'টায় ফ্যান্সি বল্।

ফ্যান্সি ড্রেসের আয়োজন গত দু-তিনদিন থেকেই চলছিলো। দল পাকিয়ে অনেকেই ঠিক করেচেন কে কি সাজবেন। অনেকেই চেনা-জানা মহিলাদের কাছে আবেদন জানিয়ে রেখেচেন, তাঁদের সঙ্গে ফ্যান্সি বলে যোগ দেবার জন্যে। উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েচেন তাঁরা।

ডিনারের পর ফ্যান্সি বল-এর বিশেষ উৎসাহীরা কেবিনে ঢুকে

:লগে গেচেন বিশেষ রকম সাজসজ্জায়।

সুসজ্জিত ডাইনিং হলে শুরু হলো কনসার্ট।

মিসেস জেন গ্র্যাটন সেজে এলেন জিপসি বুড়ি। গলায় পুঁথির মালা। মাথায় রুমাল বাঁধা। হলে ঢুকেই সকলের হাত দেখতে শুরু করলেন। হাততালি পড়লো।

রেজা সেজেচে 'কোবয়'। মাথায় বিরাট টুপি। হাতে লম্বা দড়ি। দড়িটাকে ছড়িয়ে দিলো মেঝের মাঝখানে। আবার হাততালি।

কে-জি এলেন বাঙালী ফুল-বাবু সেজে। আদ্দির পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরনে। এক হাতে কোঁচা, আর এক হাতে ফুল। বারে বারে শুঁকচেন। সঙ্গে তাঁর গ্রাম্য-স্ত্রী। সেজেচেন মিস ইলিয়ট। কোনরকমে শাড়ি জড়িয়ে একগলা ঘোমটা টেনে এলেন কে-জির পেছনে পেছনে। এবার হৈ-হৈ পড়ে গেলো।

এলেন বেঁটে কে. এম. শা। পাক্কা ইংরেজ সাহেব। মাথায় টপ-হ্যাট। সঙ্গে তাঁর দ্বিগুণ ঢেঙা রাজহংসী মিসেস হারমান—মিঃ শার 'মিসেস' রূপে। মিসেস হারম্যানের হাত ধরে ঝুলচেন শা। দেখবার মত দৃশ্য। হাততালির সঙ্গে শিষ দিয়ে উঠলো অনেকেই।

সি. মিটার আর এনাক্ষী রাও সেজেচেন জেলে-জেলেনি। মিটারের মাথায় এনাক্ষীর শাড়ি জড়িয়ে পাগড়ি বাঁধা, আর এনাক্ষীর হাতে মাছের ঝুড়ি। আবার হৈ-হৈ।

কিমোনো পরে জাপানী মেয়ে সেজেচেন মিসেস ধীলন। জাপানী ঢংয়ে চুল বাঁধা। হাতে জাপানী ছাতা। চলনে লীলায়িত ভঙ্গী। আবার যথারীতি হাততালি।

সানিয়াল সেজেচেন বিরাট পাগড়ী মাথায় সুলতান। ইয়া গোঁফ। হাতে সিল্কের রঙীন রুমাল।

রামস্বামী সেজেচেন ইণ্ডিয়ান ফকির। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, গায়ে

চাদর। হাতে মুখে পাউডার, অর্থাৎ ছাই। বগলে কম্বল, হাতে চিমটে।

লতিফ সেজেছেন রেড ইণ্ডিয়ান। মাথায় পালক, হাতে ধনুক। গলায় পুঁথির মালা। কোমরে চওড়া বেল্ট।.

তাছাড়া কিরন্ময়ী বড়াই সেজেছেন গোপিনী। মাথায় কলসী, পরনে ঘাঘরা। কাবুলিওয়ালা সেজেচেন ডাঃ সেন। এলিস, চীনা মহিলা। মিঃ মুঞ্জেশ্বর রাজপুত বীর। কোমরে তলোয়ার।

দ্রুত তালে বেজে উঠলো কনসার্ট।

সবাই নাচতে নামলেন ফ্লোরে। জাপানী মেয়ে নাচতে লাগলেন বাঙালী বাবুর হাত ধরে। গ্রাম্য বৌ নাচতে লাগলেন টপ হ্যাট পরা ইংরেজের সঙ্গে। জিপসি বুড়ি হাত ধরলেন কাবুলিওলার। ঢেঙা 'মিসেস শা' ইণ্ডিয়ান ফকিরকেই নিলেন বেছে। রেড ইণ্ডিয়ান গোপিনীর সঙ্গেই শুরু করলেন নাচ।

নাচ। বিশুদ্ধভাষায় যাকে বলে ভালুক নাচ। তাল নেই, বেতালা। সুর হলো বেসুরো। বেপরোয়া নাচ। প্রাণ খোলা নাচ। নাচের ব্যাকরণ এ নাচে অচল। এ নাচ, প্রাণের নাচ, নাচের প্রাণ।

তবু কনসার্ট বাজিয়েরা সুর ঢালচে আপ্রাণ। বয়রা ঢালচে সুরা মূহুর্মুহু।

শুধু হৈ-হল্লা, হাসি, আনন্দ। গম গম করচে সুসজ্জিত ডাইনিং হল। সবার মাথার কাগজের টুপি, হাতে কাগজের পতাকা। কারোর হাতে বেলুন, যেন কচি খোকা এবং খুকুর দল। মহাসিন্ধুর বুকে ভেসে ছেলেরা করে খেলা।

এ খেলায় যোগ দিয়েচে 'বাতরি'ও। নেচে-নেচে, ভেসে-ভেসে চলচে সেও।

শুধু একজন, বিষাদিনী একাকিনী এক নারী জাহাজের পেছনের

আধ অন্ধকার ডেক-এ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন উত্তাল কালো সমুদ্রের দিকে চেয়ে। মিসেস ডাট্।

মিসেস ডাট্ যাননি ফ্যান্সি বল-এ। তাঁর যে ফ্যান্সি ড্রেস হবে, তা আজীবনের জন্যে, ওদের মতো দু'চার ঘণ্টার জন্যে নয়। কাজেই অত তাড়া কিসের ?

এডেনে অনেকেই সস্তায় কিনেচে ক্যামেরা, বাইনাকুলার। ডেক-এ তাই ছবি তোলার ধূম। কেউ বা চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে দূরের জিনিস কাছে এনে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখচে। যারা বেশি রসিক, অনেক সময় তাদের বাইনাকুলারের চোখ মেয়েদের অলক্ষ্যে মেয়েদেরই দিকে।

তবে ক্যামেরার চোখ প্রকাশ্যেই ঘোরাফেরা করচে এদিক ওদিক। বললেই হলো, একটা ছবি তুলতে চাই। নিশ্চয়ই !

তবে দাঁড়ান ওখানে, ঐ লাইফ বেল্টায় হেলান দিয়ে।

টিক। থ্যাংকু।

থ্যাংকু। একটা ছবি কিন্তু চাই।

শিয়োর। ঠিকানাটা লিখে দিন আমার নোট বইয়ে।

লেখা হলো ঠিকানা। ক্যামেরার মারফত আলাপ উঠলো জমে।

ক্যামেরা ছবি তোলবার যন্ত্র নয়, ভাব জমাবার হাতছানি। রেজার হাতে কিন্তু ক্যামেরা নেই, সে ঘুরে বেড়াচ্চে একবাক্স চকোলেট নিয়ে। চকোলেট-বাক্সের ডালা খোলা। হঠাৎ কে-জির সঙ্গে দেখা।

কি হে, এবার সিগ্রেটের বদলে চকোলেট খাওয়াবে নাকি ?

না কে-জিদা।—রেজা বললেন, চকোলেটে হাওয়া লাগাচ্চি।

তার মানে ?

রেজা বিষণ্ণবদনে বললেন, ইংল্যাণ্ড থেকে কেনা দামি চকোলেট,

ভাইপোদের জন্যে নিয়ে যাবো ভাবছিলাম, তা আর হলো না দেখছি।

কেন, কেন ?

আর বলবেন না। এতদিন ঠাণ্ডায় বেশ ছিলো। আজ বাক্স খুলে দেখি গরমে সব গলে গুড় হয়ে যাবার জোগাড়! তাই হাওয়া লাগাচ্চি!

শুনে হেসে উঠলেন কে-জি: কিন্তু এভাবে চোখের সামনে চকোলেট নিয়ে নাচালে তোমার চকোলেটই যে হাওয়া হয়ে যাবে রেজা ভাই।

ইস! ইয়ার্কি নাকি!—রেজা চট্ করে সরে গেলেন সেখান থেকে।

দেখি, দেখি, একটা ছবি তুলি আপনার। ঐভাবে চকোলেটের বাক্স হাতে নিয়ে দাঁড়ান।—মিসেস বড়াই তাঁর সত্ত কেনা ক্যামেরা তাক করে দাঁড়ালেন রেজার সামনে!

বেশ তুলুন!—রেজা চকোলেটের খোলা বাক্স সমেত হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন।

টিক।

তা রেজার পোজ্টা তোলবার মতই হলো বটে!

এডেন থেকে চারদিনের পথ পাড়ি দিয়ে 'বাতরি' এলো করাচী বন্দরে। করাচী। ভারতের এক বিচ্ছিন্ন অঙ্গ। প্রতিবেশী, তবে পরদেশী বন্দর।

সন্ধ্যার অন্ধকারে 'বাতরি'কে বিদায় দিয়ে অনেকেই নেমে গেলেন তাঁদের স্বদেশে। অনেক বিদেশীরও যাত্রা হলো শেষ।

আলি আর ডরোথী নামলেন তাঁদের কাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে। এবার স্বদেশে ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরবেন তাঁরা। লর্ড তো কিছুই করলেন না, এবার আল্লা যদি কিছু করেন!

মিসেস বড়াই রাফিকের সঙ্গ ছাড়লেন না। কাষ্টমস্-এর বেড়াটা

অন্তত রাফিকের সাহায্যে পার হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই হয়তো।

মিঃ এবং মিসেস হারমানের বাজের দলও নামলেন বাদ্যযন্ত্রের বোঝা নিয়ে। তাঁদের সঙ্গ নিলেন 'মদের পিপে' বুড়ো জন। মিসেস হারমানের পেছনের ফেউ।

লতিফ তাঁর শপ-গার্ল-বৌ এমা ব্রাউনকে সযত্নে হাতে ধরে নামালেন জাহাজ থেকে। যেন টবে বসানো দামি ফুলের চারা। কিংবা ভেড়া আনলো পথ দেখিয়ে ব্রিটিশ সিংহীকে। এখন প্রাণে মারা কিংবা জিইয়ে রেখে খেলানো—সবই এমা সিংহীর খেয়ালের উপর ভরসা।

তাছাড়া নামলেন বেঁটে কে. এম. শা। চিরতরুণ, চিরসবুজ। মিষ্টি মানষটি।

আর নামলেন, সর্বশ্রী (না, না, 'শ্রী' কথাটা পাকিস্তানের পক্ষে বিশ্রী এবং অচল) মেসার্স আব্বাস, আবজল, প্রায় গণ্ডা পাঁচেক মহম্মদ, গণ্ডা দু'য়েক খান, গোটা পাঁচেক হুসেন, একটি পুরো ডীন পরিবার এবং জালান, উদ্দিন, হানিফ, করিম প্রভৃতি। প্রায় দু'শো যাত্রী।

'বাতরি'র বুকখানা যেন অর্ধেক খালি হয়ে গেলো। তবে হাল্কা হলো যেন। যাঁদের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে এতদিন ভীরু এবং ভারি হয়েছিলো, আজ তাঁদের স্বদেশের মাটিতে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো 'বাতরি'। এতদিন ভয়ে-ভাবনায় প্রায় গলাডুবি হয়ে ছিলো, করাচী বন্দরে হাল্কা হয়ে বুক পর্যন্ত ভেসে উঠলো সে। সাগর-নগর যেন জল থেকে গলা উঁচিয়ে দেখতে লাগলো করাচীর মাটির নগর।

নামলো আরো অনেকেই। করাচী দেখবার উদ্দেশ্য তাঁদের।

সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবার সুযোগটুকু অনেকেই ছাড়লেন না। বিশেষ করে দেশের মাটির গন্ধ এই করাচীতে বেশ কিছুটাই আছে।

পার্সার অফিসে পাশপোর্ট জমা রেখে দল বেঁধে বেরুলেন ডাঃ সেন, চ্যাটার্জি, রামস্বামী, সানিয়াল, রেজা আর কে-জি। অবশ্য দাড়ি-শাড়িও নামলেন, তবে জোড়ে। গ্যাংগুলি ও এলিসও হাত ধরাধরি করে নামলেন। উইলহেলম্‌ এইটেল একলাই নামলেন, তবে পরে সঙ্গ নিলেন সানিয়ালদের। এইসব প্রাচ্য দেশে পথ পদর্শক হিসাবে এই দলটাই নির্ভরযোগ্য। তা ছাড়া নামলেন মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন, ডাঃ রয়, ডাঃ প্রামানিক, এবং আরো অনেকেই।

তবে নামলেন না মিসেস প্যারেলওয়ালা। মিস ইলিয়টও নামলেন না। মিসেস ডাট বা দত্তের নামার প্রশ্নই ওঠে না। মিঃ বা মিসেস ধীলন অথবা সকন্যা মিঃ-মিসেস মুঞ্জেশ্বরও স্থির করলেন 'বাতরি'তেই থাকা। সেলিম হক আর মিস রীডও ততক্ষণে বার-এ বসে বীয়ার বা ব্র্যাণ্ডি টানাই শ্রেয় মনে করলেন।

করাচীর কাষ্টমস-এ সার্চ-লাইট জ্বলচে। আলোয়-আলো।

ভিতরে হৈ-হৈ ব্যাপার। সাগর-নগরের নাগরিকরা মাটির নগরে যে দুরবস্থায় পড়েচেন, তা দেখবার মত। বাক্স, সুটকেশ সব খোলা, জিনিসপত্র ছড়ানো। দু'হাত দিয়ে তাই জিনিস আগলে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকেই—শা, আলিরা, হারমানদের দল, বড়াই-জায়া, রফিক প্রভৃতি। যেন চোরা কারবারিরা একসঙ্গে ধরা পড়েচে। মুখে তাঁদের দুর্ভাবনা আর হতাশার ছাপ। কাষ্টম অফিসারদের প্রশ্ন আর বাক্স-হাতড়ানো চলেচে অবিশ্রান্ত ভাবে।

সানিয়ালরা গেটের বাইরে এলেন। ঘোড়ার গাড়ি, অটোরিক্সা,

আর বাস রয়েচে দাঁড়িয়ে। একধারে পান-বিড়ি-সিগ্রেটের দোকান, খাবারের দোকান, চায়ের দোকান। ঘোড়ার গাড়ির কচোয়ানরা ছেঁকে ধরলো তাঁদের ঃ আইযে সাব, ফার্স্টক্লাস গাড়ি, আচ্ছা ঘোড়া। কাঁহা জায়েঙ্গে ?

বাজারমে।

চলিয়ে। পাঁচ রূপেয়া ভাড়া।

ইংল্যাণ্ডে-ইয়োরোপে দরাদরি করতে হয়নি। জিব্রালটারেও নয়। ইজিপ্টে দরাদরি থাকলেও, দরকার পড়েনি। অনেকদিন পরে আবার দর কষাকষির পুরোন অভ্যাস চালু করতে হলো।

নাহি, দো রূপেয়া।

কচোয়ান যেমন ঘোড়ার ল্যাজ মলতে জানে, তেমন ভারি সাহেবদেরও ল্যাজ মলতে কম ওস্তাদ নয়। আরে সাব, আপলোগ বিলাইতসে আঁতেহেঁ, আউর মোলাই করনে লাগা ?

রসিক সানিয়াল বললেন, আরে মিঞা, হামলোক সব দেশি সাব হ্যায়। দেখতা না চামড়াকা রং ?

শুনে হেসে ফেললো কচোয়ানরা ঃ আচ্ছা সাব, চার রূপেয়া।

এমন সময় একটা বাস ছাড়তে দেখে সবাই ছুটে গিয়ে বাসখানা ধরলেন। ঝর-ঝর শব্দে বাস চললো।

সরু পথ। ঘিঞ্জি সহর। এখানে ওখানে ময়লা ছড়ানো। গাড়ি ঘোড়ার খটখট শব্দ, অটো-রিক্সার ভটভট আওয়াজ, মোটর বাসের প্যাঁক-প্যাঁক হর্ণ। তার উপর দোকানে দোকানে রেডিয়োর গান, রাস্তায় হকারের চীৎকার, সব মিলিয়ে করাচী সহর সরগরম। সরু ফুটপাথে মুচি, নাপিত, তেলে ভাজার দোকান, ভিখিরীর দল। ষাড় গরুও বিচরণ করচে অবাধে। ফুটপাথে জায়গা নেই, তাই লোক চলচে পথ দিয়ে, পার হচ্চে পথ যেখানে সেখানে।

এ দৃশ্যের সঙ্গে বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতার পথের দৃশ্যের খুব

বেশি অমিল নেই। তবু সম্ভ বিলাত-ফেরত দেশি সাহেবদের চোখে সবই যেন দৃষ্টিকটু লাগলো। কায়রোও এঁদের হতাশ করেনি, বরং অবাক করে দিয়েছিলো, কিন্তু করাচীতে এসে সবই যেন ধাক্কা খেলেন। সঙ্গে এইটেল কি ভাবচেন কে জানে।

এই তো ধাক্কা খাওয়ার শুরু।

একটা পানের দোকানের সামনে এসে রেজা প্রস্তাব করলেন : পান খাওয়া যাক। অনেকদিন পান খাওয়া হয়নি।

ঠিক ঠিক।—রামস্বামী সমর্থন করলেন।

পান কিনে খেলেন সবাই। এইটেল প্রথমে ইতস্তত করলেও দলে পড়ে খেলেন একটা। তাঁর জীবনযাত্রায় অনেক কিছুই তো বদলাতে হবে। কাজেই শুরু হোক হাতে খড়ি। কে-জিও পাইপ পকেটে রেখে পান চিবোলেন একটি।

আচ্ছা, বিড়ি খেলে কেমন হয়?—সানিয়ালের প্রস্তাব।

মন্দ কি? সবাই প্রায় রাজী।

খাকি-ব্র্যাণ্ড ধরালেন সবাই। রেজা ছাড়া। বিশুদ্ধ দেশি ধূমপান।

করাচীর পথে ফিট-ফাট স্যুটপরা-সাবদের পান চিবোনো এবং বিড়ি টানা দেখে লুঙি-পায়জামা পরা অনেকেই অবাক হয়ে গেলো। ভিখিরীরাও ঘরের মানুষ ভেবে সাহস করে হাত পেতে এগিয়ে এলো কাছে।

কাজেই সাবদের পলাতক হতে হলো সেখান থেকে।

কাছেই স্টেশন, বাজার, সিনেমা বাড়ি ইত্যাদি দেখে অটোরিক্সা গোটা চারেক ভাড়া করলেন তাঁরা। হাত ঘড়িতে সাড়ে নটা। এবার জাহাজ ঘাটায়।

এসব সহর বহু দেখা আছে, আরো বহুদিন দেখতে হবে। কাজেই ছেড়ে যেতে দুঃখ নেই।

'বাতরি' ছাড়লো পরদিন ভোরে।

করাচী বন্দরের তখন ঘুম ভেঙেচে। কিন্তু তখনো 'বাতরি'র ডেক-এ কাষ্টম অফিসারদের নেশার ঘোর ভাঙেনি। ডেক-চেয়ারে এলিয়ে পড়ে ঘুমুচ্চেন সব।

রাত্রে জাহাজে ডিউটি দেবার পর, বার-এ গিয়ে মাত্রা-জ্ঞান ভুলে এমনি 'রসস্থ' করেচেন নিজেদের যে, আত্মস্থ হবার শীগ্রী কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হলো না। অগত্যা, পাক-সেপাহিরা তাঁদের চ্যাংদোলা করে ডেক থেকে জেটিতে নামালো। জাহাজের মাল নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁরা যদি লোভবশত নিজেরাই বেসামাল হয়ে বেমালুম 'মাল' ব'নে যান, তাতে আশ্চর্য হবার আছে বৈকি?

তাঁরা যখন ডেক থেকে একে-একে খালাস হলেন, তখন পূব-আকাশ রাঙা হয়ে উঠেচে। হয়তো লজ্জায়। সূর্য-যাত্রা শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'বাতরি' পাড়ি দিলো ভারতের দিকে।

জাহাজটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেচে। বুঝি ভাঙা হাট।

জাহাজের অনেক কেবিনই ফাঁকা, লাউঞ্জও প্রায় খালি। ডাইনিং হলের চেয়ার-টেবিলগুলো বেকার। ডেক-এর চেয়ারগুলোর অনেকেই খালি-কোল নিয়ে পুড়চে রোদ্দুরে।

সাগর-নগরের নাগরিকদের মনও যেন ফাঁকা।

হিন্দুস্থানের সঙ্গে পাকিস্থানের সদ্ভাব নেই? হয়তো। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে পাকিস্থান বিষোদগার করে? হয়তো। হিন্দুস্থানের লোক পাকিস্থানে নিরাপদ নয়? হয়তো।

কিন্তু সাগর-নগরে এই দুই রাজ্যের নাগরিকদের তো ভাব ছিলো মিল ছিলো! আর ছিলো বলেই বুঝি পাকিস্থানী বন্ধুদের, ভাইদের ছেড়ে হিন্দুস্থানী-হৃদয়ে আত্মীয়-বিচ্ছেদ-বেদনা দিলো দেখা। সাগর-নগরে খবরের কাগজ নেই, ইস্তাহার নেই, রেডিয়ো নেই—অর্থাৎ

বিষোদ্গারের উপায় নেই, কান-ভাঙাবার ব্যবস্থা নেই। অতএব শত্রুতা নেই, ঝগড়া নেই। কাজেই এই কটা দিন দুই দেশের নাগরিকদের হৃদয়ে বিষের জ্বালা ছিলো না, ছিলো বৈষ্ণব প্রেম।

তবে যাঁরা গত কাল পাকিস্থানের মাটিতে পা দিলেন, কিংবা আগামী কাল হিন্দুস্থানের মাটিতে দেবেন পা, হাতে পাবেন খবরের কাগজ, কানে শুনবেন রেডিয়ো-সংবাদ—তাঁদের মন কি আবার বিষিয়ে উঠবে না? হয়তো উঠবে। কিন্তু এ-ও ভাববেন তাঁরা—সাগর-নগরে তো আমরা বেশ মিলেমিশেই ছিলাম!

তাই হয়। এই বেড়ালই বনে গেলে বনবেড়াল হয়। অতএব সাগর-নগরের নাগরিকরা মাটির নগরে গিয়ে তাঁদের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সেখানকার মাটির তলায় যদি চাপা দেন—তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

মাটির-নগর যদি স্বার্থের হাট হয়, তবে সাগর-নগর জনগণের মহাতীর্থ!

কোনরকমে দিনটা কাটিয়ে, রাত্রে ডিনার সেরে সবাই এলোমেলো ঘুরে বেড়ালেন, লাউঞ্জে ঢিলেঢালা গল্প জুড়লেন, বার-এ বসে হাই তুললেন অনেকেই। পরে যে-যাঁর কেবিনে গিয়ে 'লক' করলেন দরজা।

অদ্যই শেষ রজনী।

রাত পোহালেই দেখা দেবে ভারতের সীমান্ত রেখা, পশ্চিম ঘাট। সবুজের সমারোহ। সারবন্দী অট্টালিকা। জাহাজ বাঁধা বন্দর।

মন চঞ্চল হয়ে উঠেচে অনেকেরই।

হ্যাঁ, অনেকেরই

অনেকের কাছেই সত্যিই শেষ রজনী। আর দেখা হবে কিনা, কে জানে? আবার এমনি করে হাতে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে

থাকতে পারবে কি ? কর্তব্যের টানে কে কোথায় ছিটকে পড়বে, ঠিক আছে নাকি তার ?

এনাক্ষী রাও আর সি. মিটার বোট-ডেক-এর এক আবছা কোণে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছেন। মিটারের কাঁধে এনাক্ষী রাওয়ের মাথা হেলানো—

এনাক্ষী ?

বলো মিটার।

আর কি আমাদের দেখা হবে না ?

কেন হবে না ?

আমি যে ভবঘুরে ! কোথায় থাকবো ঠিক নেই।

তবু তোমার মনে তো আমি থাকবো ?

নিশ্চয়ই থাকবে এনাক্ষী। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

সি. মিটার তাঁর বলিষ্ঠ দু' হাতে এনাক্ষীর দেহলতাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিলেন নিজের কোলের মধ্যে।

এনাক্ষী ?

কি ?

আমার কথা সত্যিই তোমার মনে থাকবে ?

যতদিন আমি থাকবো এই পৃথিবীতে, ততদিনই তুমি থাকবে আমার মনে। ঐ চাঁদ সাক্ষী।

শুনে আকাশের চাঁদ বুঝি হাসলো।

সি. মিটারও হাসলেন।

বললেন, চলো যাই কেবিনে।

এস. গ্যাংগুলি আর এলিস বসে আছেন আধ-অন্ধকার ফাঁকা লাউঞ্জে।

অদ্যই শেষ রজনী। না ?—গ্যাংগুলি বললেন।

হুঁ।—এলিসের উত্তর।

শেষ চিহ্ন পাবো না এলিস ?— গ্যাংগুলির আশা।

পাবে। তবে তোমাকে একটা কবিতা শোনাতে হবে।

কবিতা ?

হ্যাঁ। তোমার গলায় কবিতা আমার ভারি ভালো লাগে।

তাই নাকি ? বেশ—

'স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে ; জাগার বেলা হল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো
বেদনা হবে পরম রমণীয়—
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়ক্ষণে ক্ষণেক তরে যদি সজল আঁখি তোল।'

থামলেন গ্যাংগুলি : এবার আমার প্রাপ্য দাও।

এই নাও।

এলিস এঁকে দিলেন চুম্বন গ্যাংগুলির গালে।

হেসে গ্যাংগুলি বললেন, এরপর চুপ করে থাকা কাপুরুষতা স্বীকার করো তো ?

করি।

অতএব—

প্রতিদান দিলেন গ্যাংগুলি।

এলিস বললেন, তার মানে, আমি সেই ঋণী হয়েই থাকলাম।

হ্যাঁ। সুদে আসলে প্রাপ্য আমার বাড়ুক।

হাতঘড়ি দেখলেন এলিস : চলো, শুতে যাবে না ?

তোমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করচে না এলি।

আমারো।

তবু দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। অনেক রাত হলো।

কিন্তু উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই হক এবং মিস রীডের। দু'জনেই বার-এর এক কোণের টেবিলে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন।

অদ্যই শেষ রজনী।

তাই সুরার শেষ সীমা পার হয়ে অসীমে ডুবে আছেন। সামনের গেলাস দুটোই নিঃশেষিত।

বার-বয় অবস্থা দেখে ষ্টুয়ার্ড আর ষ্টুয়ার্ডেসকে খবর দিয়েচে।

হ্যালো স্যার!

হ্যালো মাদাম!

উঁ?

'বার' বন্ধ হয়ে গেচে। অনেক রাত হয়েচে। কেবিনে যান।

নো।

নেভার!

প্লীজ! প্লীজ!

গেট্ আউট।

অগত্যা ষ্টুয়ার্ড ধরে তুললেন হককে, মিস রীডকে ষ্টুয়ার্ডেস।

অ রাইট!—হক টিলে পায়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুরেলা গলায় বললেন, জিল্, লেটস্ গো টুগ্যাদার—টু ইয়োর কেবিন, অর 'টু মাই কেবিন?

কিন্তু বেরসিক ষ্টুয়ার্ড এবং ষ্টুয়ার্ডেসটি তাঁদের ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিলো যার যার কেবিনে!

মস্কোর রামস্বামী জেগে বই পড়ছিলেন। নিউইয়র্ক-হকের কাণ্ড দেখে মুচকে হেসে আবার বইয়ে মন দিলেন। হক ধড়াম করে নিজের বার্থে বসলেন ঘাড় ঝুলিয়ে: ড্যাম-ফুল সোয়াইন!

ষ্টুয়ার্ড ততক্ষণ দরজা টেনে দিয়ে বাইরে চলে গেচে।

মিস রীডের কেবিন খালি।

করাচীতে নেমে গেচেন মিসেস এচ্ ষ্টাকার্ড—তাঁর কেবিনের সঙ্গিনী। ষ্টুয়ার্ডে'স মিস রীডকে খালি কেবিনে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা দিলো টেনে।

আ, টু-উ হট্!

পাখাটা ফুল-ফোর্সে চালিয়ে দিলেন মিস রীড। উপরের ডেক-এ বার-এ চমৎকার হাওয়া ছিলো। এ যেন গোডাউন।

ড্যাম্ দিস্ ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট!

ঠাণ্ডা দেশের মেয়ের মেজাজ গেলো গরম হয়ে। রঙীন মেজাজটা গেঁজে যাবার জোগাড়! রাগে গজগজ করতে লাগলেন মিস রীড। জুতো জোড়া খুলে টান মেরে ছুঁড়ে ফেললেন। খুলে ফেললেন নাইলনের স্কিন-কলার মোজা। পট্ পট্ করে বোতাম খুললেন ব্লাউজের। বেল্ট খুলে নামিয়ে দিলেন পরনের নেভি-ব্লু স্কার্ট। আণ্ডার-ড্রেস, প্যান্টি বা ব্লুমার, ব্রাসায়ার—সব, সব একে একে দেহত্যাগ করলো মিস রীডের।

মুক্তি। যেন বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেন মিস রীড। বেসিনে লাগানো আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে নিজের দিকে চেয়ে বললেন, নাউ মাই সুইট জিল, মাই ইয়ং লাভলি গার্ল—হাউ ডি ইউ ফিল্?

তবে জিল নিশ্চয়ই ভালো 'ফিল্' করছিলেন না!

তাই হাত দু'খানা নিজের মুখের উপর চেপে ধরলেন একবার। পরে গিয়ে বসলেন নিজের বার্থে। গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবলেন একবার। বললেন, গুড নাইট, মাই ব্রাউন ফ্রেণ্ড।

বলেই মদিরাবেশে মিস রীড তাঁর শুভ্র নগ্নতনু এলিয়ে দিলেন বার্থের শুভ্র নরম বিছানায়।

আর, কেবিনের নির্লজ্জ পোলিশ আলোটা লোভীর মত সারারাত ধরে গিলতে লাগলো ইংরেজ ললনার নগ্ন-সৌন্দর্য।

সাগর-নগরে দেখা দিলো শেষ-সূর্য।

নাগরিকদের যাত্রা হলো শেষ। কেবিনে কেবিনে চাঞ্চল্য। বাক্স গোছাবার পালা। টেবিলে সাজানো চিরুণী, বুরুশ, টুথপেষ্ট, রেজার, সাবান, সেন্ট, পাউডার—সব একে একে ঢুকলো স্যুটকেসে, বাক্সে। । স্লিপিং স্যুট, ড্রেসিং গাউন, রুমাল, টাই, সার্ট, স্কার্ট, ব্লাউজ ইত্যাদি কিছুই যেন বাইরে পড়ে না থাকে।

সাগর-নগরের সঙ্গে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই চুকবে সব সম্পর্ক। চলমান জীবনের চাকা তখন চলবে মাটির নগরের মাটির পথে। তখন তো আবার বসতে হবে দোকান সাজিয়ে, সংসার সাজিয়ে? তখন লাগবে না ঐ দৈনন্দিন জিনিসগুলো?

লাগবে। তাই সংসারীরা গুছিয়ে তুললো ছড়ানো তাদের জিনিসপত্র।

ব্রেকফাষ্টের ঘণ্টা বাজলো। রোজকার মতই।

বসলেন সবাই। তবে সেই হৈ-হৈ আর নেই। শুধু বিদায়-বেদনার গুঞ্জন।

এই শেষ দেখা হয় তো।

না, না। নিশ্চয়ই যাবো আপনার বাড়িতে। আপনিও আসবেন কিন্তু।

নিশ্চয়ই।

বেশ কাটলো ক'টা দিন। না?

সত্যি! এ স্মৃতি ভোলবার নয়।

এখন কেবলি বাড়ির কথা মনে পড়চে।

পড়বেই তো। কতদিন পরে দেখা হবে সকলের সঙ্গে!

আমার ওয়াইফ তো বম্বে পর্যন্ত আসতে চেয়েছিলেন। আমি কায়রো থেকে বারণ করে লিখেচি।

আমার মা লিখেচেন, বম্বেতে যেন একদিনও না থাকি। সোজা কলকাতায় চলে যাই যেন।

আর আমি ভাবচি আমার দিদির কথা। উঃ, তার ঐ বেশ দেখবো কি করে ভাবতেও পারচিনে। মাত্র চার মাস আগে ভগ্নীপতিটি মারা গেচেন।

সত্যি। দেশে গিয়ে কত কী যে বদল হয়েচে দেখবো!

আবার তাঁরাও দেখবেন আমরা কত বদলে গেচি।

ডাইনিং হলের এক কোণের একটি টেবিলে বসেচেন মিসেস ডাট আর মিস ইলিয়ট।

মিসেস ডাট কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে ম্লান হেসে বললেন, মিস ইলিয়ট, স্বার্থপরের মত আমার কি মনে হচ্চে জানো?

কি?

মনে হচ্চে, জাহাজখানা যদি বম্বে না পৌঁছে আজীবন সারা সমুদ্র ঘুরে বেড়াতো, তবেই যেন ছিলো ভালো। অথচ দেখো, তুমি হয়তো ভাবচো, জাহাজখানা বম্বে পৌঁছুতে এতো দেরি করচে কেন? না? তোমাদের বিয়ে কবে?

মিস ইলিয়ট বললেন, ডেলহি-তে পৌঁছুলে উইলির সঙ্গে কনসাল্ট করেই দিন ঠিক হবে।

মিসেস ডাট বললেন, এই সর্বহারা ইণ্ডিয়ান দিদিটি তোমায় সর্বান্তকরণে আশীর্বাদ করচে, তোমরা সুখী হও।

শুনে মিস ইলিয়ট ভাবাবেগে মিসেস ডাটের হাতখানা ধরে মৃদু চাপ দিলেন একবার।

ঐ, ঐ যে দেখা যাচ্চে।

সমুদ্র সীমায় লম্বাটে কালো দাগ। বম্বে।

'বাতরি'র ডেকে একদিকে প্রায় সবাই হয়েচে জড়ো। ঐ যে তাদের দেশ, স্বদেশ। ইণ্ডিয়া।

ক্রমে কালো দাগ বড় হলো। সবুজ হলো।

শস্য-শ্যামলা ভারতবর্ষ!

কখন ঐ সরস মাটির পরশ পাবো? সবাই বুঝি তাই ভাবচে।

লাঞ্চের ঘণ্টা পড়লো।

সাগর-নগরে শেষ ভোজনপর্ব। নাগরিকদের শেষ প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার আয়োজন।

খাওয়ার দিকে মন নেই কারোর। কোন রকমে পেট ভরানো। মনে উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা।

কারণ? কাষ্টমস্-এর বেড়া।

ঐ বেড়া পার হলে, তবে শান্তি। অনেকেই সস্তায় সিগ্রেট কিনেচেন, যতগুলো সঙ্গে নেওয়া যায়, তার চাইতেও বেশি। কারোর কাছে দুটো রিষ্টওয়াচ। একটা হাতে, একটা পকেটের মধ্যে। রেডিয়োটার জন্যে আবার ডিউটি ধরবে কিনা কে জানে? অনেকের স্যুটকেসে সস্তায় কেনা ব্র্যাণ্ডির বোতলও স্থান পেয়েচে।

দুর্ভাবনা অকারণে নয়।

আরো, আরো কাছে এগিয়ে এসেচে বম্বে। বম্বে বন্দর। ভারতবর্ষ!

'ওই ভারত! ওই আমার যৌবনের বৃন্দাবন, বার্দ্ধক্যের বারানসী—ভারতভূমি! ওই আমার ইহকালের সাধনা, পরকালের কামনা—ভারতমাতা!

বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলো ঝিমুচ্চে। পোর্ট অফিসটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। ঐ যে গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া: পঞ্চম জর্জের ভারত পদার্পণের স্থাপত্য-স্বাক্ষর। আর ঐ—ঐ তো তাজমহল হোটেল।

বাইনাকুলার চোখে লাগিয়েচেন অনেকেই।

বাইরে থেকে ইণ্ডিয়াকে কেমন দেখা যায়, দেখতে হবে না? অনেকেই ক্যামেরা তাক্ করে দাঁড়িয়ে। ইণ্ডিয়ার ফটো তুলতে হবে।

মিঃ এবং মিসেস গ্র্যাটন রেলিং ধরে একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে আছেন। আ, ইণ্ডিয়া! দুশো বছর আমাদের ইংল্যাণ্ডের অধীনে ছিলো ঐ ইণ্ডিয়া। এখন কমনওয়েল্‌থ কান্ট্রি!

আর, ফার্স্টক্লাস ডেক থেকে মিসেস হোরও চেয়ে আছেন ইণ্ডিয়ার দিকে। গীটা-র দেশ। লর্ড কৃষ্ণার লীলাভূমি! হাউ ফরচুনেট আই অ্যাম্!

ধীরে ধীরে—অতি ধীরে সাগর-নগর এসে ঠেকলো মাটির নগরের গায়ে। বাঁধা পড়লো বন্দরের লৌহ-বন্ধনে। পাতা হলো সিঁড়ি।

চাঞ্চল্য দেখা দিলো সাগর-নগরে। শুরু হলো পোর্ট কুলিদের আনাগোনা। শুরু হলো কেবিন থেকে বাক্স নামানো আর যাত্রীদের নামা।

'দল' ভেঙে গেচে।

এখন সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। নিজেরটুকু নিয়ে ব্যস্ত। কোথায় সানিয়াল? কোথায় রামস্বামী? কোথায় ডাঃ সেন? আর কোথায় বা দাড়ি-শাড়ি? গ্যাংগুলি-এলিস? হক-রীড? ডাট-ইলিয়ট?

ব্যস্ত। বড় ব্যস্ত সবাই।

অবশ্য একে একে নেমেচেন সবাই। দাঁড়িয়েচেন সবাই ডকের কাষ্টম-হাউসের সামনে। লাইন করে দাঁড়িয়েচেন সবাই। বেড়া পেরে-হলেই ছড়িয়ে পড়বেন মাটির-নগরে।

পরে হারিয়ে যাবেন, মিশে যাবেন মাটির নগরের জনতার সঙ্গে। ভারতের জনতার মাঝে।

'বাতরি' দাঁড়িয়ে আছে ডকে। তার কর্তব্য শেষ। বুঝি বিশ্রাম নিচ্চে। বিরাট সাত তলা জাহাজখানা সমুদ্রকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে।

অদূরে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রাক্তন সাগর-নাগরিকরা—মাটির নগরে নাগরিকত্ব লাভের আশায়।

ঐ যাঃ! আমার গ্লাভজোড়া কেবিনে পড়ে আছে যে?

কিউ-এ দাঁড়ানো রেজা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেনঃ আমি আসচি, আমার জায়গাটা রাখবেন তো।

ছুটলেন রেজা জাহাজে।

কেবিন থেকে শেষ মালপত্র নামাচ্চে কুলিরা।

রেজা লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। ছুটলেন অতি পরিচিত অলি-গলি দিয়ে তাঁর কেবিনের দিকে।

নির্জন প্যাসেজগুলো নিঃস্তব্ধ। কেবিনগুলোর দরজা খোলা। ফাঁকা। লাউঞ্জের সাটগুলো খালি, বেকার। লোক নেই, জন নেই। মাঝে মাঝে দু'একজন ষ্টুয়ার্ড বা ষ্টুয়ার্ডেস গল্প করচে।

তরতর করে নেমে গেলেন রেজা নীচের ডেকে, তাঁর কেবিনে। খোলা পড়ে আছে কেবিন।

ঐ যে, ঐ যে ব্রাকেটে ঝুলচে তাঁর গ্লাভজোড়া! ইস্! বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিলো! প্যারিস থেকে কেনা তাঁর সাধের জিনিস!

গ্লাভজোড়া নিয়ে বেরিয়ে এলেন রেজা কেবিন থেকে। ফিরে চললেন ম্যাট্রেস পাতা প্যাসেজ দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে, উপরের ডেক-এর লাউঞ্জের ভেতর দিয়ে।

শুধু তাঁর পায়ের ধপ ধপ শব্দ।

কানে বেসুরো লাগচে রেজার। অদ্ভুত লাগচে। অসহ্য মনে হচ্চে।

বেরুবার সিঁড়ির কাছে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ালেন রেজা।

চেয়ে দেখলেন জনহীন প্রাণহীন সাগর-নগরের দিকে।

নীরব, নিঃস্তব্ধ, প্রেতপুরী।

জলসার শেষে যেন নাট-মন্দির।

গুডবাই বাতরি।

সেল্যুট জানালেন রেজা।

তারপর লোহার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন—সাগর-নগরের শেষ নাগরিক।

ফাঁপা জাহাজের লোহার সিঁড়িতে তাঁর জুতোর শব্দ হতে লাগলো: ঠন-ঠন-ঠন।